মহাভারতের মহারণ্যে

প্রতিভা বসু

মহাভারতের মহারণ্যে

প্রতিভা বসু

প্রথম পর্ব

১

মহর্ষি শৌনকের আশ্রমে পুরাণ-কথক সৌতি যেদিন এসে উপস্থিত হলেন, তাঁর মুখ থেকেই ঋষিরা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকৃত মহাভারত কথা শ্রবণ করলেন। এই গ্রন্থ ব্যাসদেবেরই 'মনঃসাগর-সম্ভূত-অমৃত-নির্বিশেষ-গ্রন্থ', যে গ্রন্থ ইতিহাস পুরাণের অনুসরণ ও ভূত ভবিষ্যৎ বতর্মান কালত্রয়ের সম্যক নিরুপণ, এবং জরা মৃত্যু ভয় ব্যাধি ভাব অভাব শুধু নয়, ইতিহাস ভূগোল দশর্ন পুরাণ, এমনকি যুদ্ধকৌশল ভূতত্ত্ব নৃতত্ত্ব ইত্যাদি সকল বিষয়ের বিবরণে সমৃদ্ধ।

তবে দ্বৈপায়ন কিন্তু মূলত একটি বিশেষ রাজত্বের বিশেষ বংশ নিয়েই উপাখ্যানটি রচনা করেছেন। সেই বংশের নাম ভরতবংশ। যে ভরতবংশের ইতিহাস তিনি আমাদের গোচরীভূত করেছেন, তার স্থাপয়িত্রী শকুন্তলা। শকুন্তলা আশ্রমনিবাসিনী ছিলেন। পুণ্যতোয়া মালিনী নদী বেষ্টিত, বহু বৃক্ষ সমাকীর্ণ আশ্রমটি ব্যতীত কিছুই তিনি দেখেননি। তিনি কণ্বমুনির পালিতা অতি সরলা এক কন্যা। রাজা দুষ্মন্ত শিকারে এসে অতি রমণীয় একটি বনে উপস্থিত হলেন। অনেক পশু বধ করে একাই ঘুরতে ঘুরতে সেখানে এসে পড়েছিলেন। এই রমণীয় বনের মধ্যেই তিনি অতি মনোরম আশ্রমটি দেখতে পেলেন। আশ্রমটি দেখতে পেয়ে তিনি সেখানে প্রবিষ্ট হলেন এবং কুটিরটির নিকটে এসে উচ্চস্বরে ডেকে বললেন, 'এখানে কে আছেন?'

লক্ষ্মীর মতো এক সুন্দরী কন্যা বেরিয়ে এসে রাজা দুষ্মন্তকে স্বাগত জানিয়ে অভ্যর্থনা করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী প্রয়োজন বলুন, আমার পিতা কণ্বমুনি ফল আহরণ করতে গেছেন, একটু অপেক্ষা করলেই তিনি এসে যাবেন।' রাজা দুষ্মন্ত বললেন, 'আপনি কণ্বমুনির দুহিতা? কিন্তু তিনি তো ঊর্ধ্বরেতা তপস্বী।' শকুন্তলা তখন তাঁকে তাঁর জন্মবৃত্তান্ত বললেন। তারপর বললেন, 'শরীরদাতা, প্রাণদাতা, অন্নদাতাকে শাস্ত্রমতে পিতা বলা হয়। মহারাজ! আমাকে কণ্বমুনির দুহিতা বলেই জানবেন।' শকুন্তলা যখন কুটির থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন কোনো কথাবার্তা বলার পূর্বেই তাঁকে দেখে তৎক্ষণাৎ দুষ্মন্তের কামস্পৃহা প্রজ্বলিত হুতাশনের মতো লেলিহান হয়ে উঠেছিলো। তিনি বললেন, 'তোমার লাবণ্যসলিলে আমি আকণ্ঠ মগ্ন। তোমার শরীরের উপর তোমার কর্তৃত্ব, তাই তুমি আত্মসমর্পণ না করলে তোমাকে পেতে পারছি না, তুমি প্রার্থনা পূরণ করো।' তখন শকুন্তলার মতো একটি সরল মধুর অপাপবিদ্ধ আশ্রমকন্যার পক্ষে যা নিতান্তই অস্বাভাবিক, দেহ সমর্পণ করার পূর্বে তিনি কিন্তু সেই রকমই একটি প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন দুষ্মন্তকে দিয়ে। ঠিক সত্যবতীর মতো বললেন, 'আপনার ঔরসে আমার গর্ভে যে পুত্র জন্মাবে, আপনি বিদ্যমানে সে যুবরাজ হবে এবং অবিদ্যমানে রাজা হবে।'

দুষ্মন্ত বললেন, ‘নিশ্চয়, নিশ্চয়।’ তারপরই গন্ধর্ব মতে বিবাহ করে শকুন্তলার সমর্পিত দেহ নিয়ে সঙ্গমক্রীড়া সম্পন্ন করে চলে গেলেন। বলে গেলেন, ‘আমি তোমাকে যোগ্য সমাদরে নিয়ে যাবার জন্য চতুরঙ্গিণী সেনা পাঠাবো, রানীর সম্মানে তুমি রাজভবনে প্রবিষ্ট হবে।’ ব্যাস, সেই যে গেলেন আর কোনো খবর নেই।

ইতিমধ্যে যথাসময়ে শকুন্তলার মহাপরাক্রান্ত, মহাবল, অলৌকিক গুণসম্পন্ন এক পুত্রের জন্ম হলো। এর পরের ঘটনায় আসবার পূর্বে একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করতে বলি। মহাভারতের সমস্ত বিখ্যাত কন্যার জন্মই রূপকথার আচ্ছাদনে আবৃত। ইন্দ্রের নির্দেশে বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ করে তাঁর সঙ্গে সঙ্গমজাত কন্যাকে জন্মানো মাত্রই তার মাতা অপ্সরা মেনকা মালিনী নদীর তীরে হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ নির্জন বনে নিক্ষেপ করে চলে গেলেন। কণ্বমুনি নদীতে স্নান করতে গিয়ে দেখলেন পক্ষীরা একটি সদ্যোজাত শিশুকে জন্তু জানোয়ারের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ঘিরে বসে আছে। মুনি দয়াপরবশ হয়ে কন্যাটিকে এনে স্বীয় আশ্রমে স্বীয় কন্যার মতো পালন করতে লাগলেন। সত্যবতীর জন্মবৃত্তান্ত আরো অদ্ভুত। তিনি জন্মান মাছের পেটে। গল্পটা এই, রাজা উপরিচর বসুর মৃগয়ায় গিয়ে বসন্তের শোভা নিরীক্ষণ করতে করতে স্ত্রীর জন্য কামনার উদ্রেক হয়। এবং সেই কারণে তাঁর শুক্র স্খলিত হয়। সেই শুক্র গ্রহণ করে এক মৎসীরূপী অপ্সরা গর্ভবতী হয়। কন্যা জাত হবার পর সেই অপ্সরা শাপমুক্ত হয়ে আকাশপথে চলে গেলে মৎসীর গর্ভজাত কন্যাকে পালন করেন এক ধীবর। সেই থেকে ধীবরকন্যা রূপেই সত্যবতীর পরিচয়। পঞ্চপাণ্ডববধূ দ্রৌপদী যজ্ঞবেদী থেকে উত্থিতা। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এই সব কন্যাদের জন্মবৃত্তান্ত কেন রহস্যাবৃত করেছিলেন, তখনকার সমাজে এই সব কন্যাদের প্রকৃত জন্মবৃত্তান্ত বলায় বাধা ছিলো বলেই কি তিনি অলৌকিকের আশ্রয় নিয়েছিলেন, সে কৌতূহল থেকেই যায়।

শকুন্তলার পুত্রের ছয় বৎসর বয়স হয়ে গেলেও যখন তার পিতা দুষ্মন্ত পত্নীকে সাড়ম্বরে নিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা, কোনো খোঁজই আর নিলেন না, তখন কণ্বমুনি সপুত্র শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু রাজা তাঁর পত্নী ও পুত্রকে গ্রহণ করলেন না। কটু ভর্ৎসনা করে সম্পর্ক অস্বীকার করলেন। তাঁকে বললেন, ‘স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই মিথ্যেকথা বলে। কে তুমি দুষ্ট তাপসী? আমি তোমাকে চিনি না।’

সভাসদস্যদের সম্মুখে স্বামীর এই উক্তিতে শকুন্তলা প্রথমে স্তম্ভিত হলেও, পরে অপমানে লজ্জায় দুঃখে বিদীর্ণ হয়ে রোষকষায়িত রক্তচক্ষুর দ্বারা অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করে বললেন, ‘জেনেশুনেও কেন অসংকোচে প্রাকৃতজনের মতো কথা বলছো জানি না। আমি যা বলেছি তা সত্য কি সত্য নয় সে বিষয়ে তোমার অন্তঃকরণই সাক্ষী।’ দুষ্মন্ত তখন শকুন্তলার মাতাকে অসতী এবং পিতাকে কামুক বলায় শকুন্তলা জ্বলে উঠে বললেন, ‘জন্মের বিচারে আমি

তোমার চাইতে অনেক উৎকৃষ্ট। শূকর যেমন মিষ্টান্ন ত্যাগ করে পুরীষ গ্রহণ করে, ইতরজন তেমনই সত্যকে ত্যাগ করে মিথ্যার আশ্রয় নেয়। তোমার সহায়তা ছাড়াই আমার পুত্র পৃথিবীর সম্রাট হবে।'

এই সময়ে স্বর্গ থেকে দৈববাণী হলো (যা মহাভারতে সর্ব সময়েই হয়ে থাকে এবং লোকেরা সুবিধেমতো গ্রহণ করে বা করে না), 'শকুন্তলাকে অপমান করো না, তাঁর সব কথাই সত্য। তাঁর গর্ভজাত স্বীয় পুত্রকে তুমি প্রতিপালন করো। এবং যেহেতু আমাদের অনুরোধে এই পুত্রকে ভরণ করা হলো, তার নাম হোক ভরত।' এই নাম থেকে ভরতবংশের উৎপত্তি। এই বংশ নিয়েই মহাভারত রচয়িতা সমস্ত আখ্যানটি রচনা করেছেন। দৈববাণী শুনে অমনি দুষ্মন্ত বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো আমি জানি। কিন্তু হঠাৎ তোমাকে গ্রহণ করলে লোকে আমাকে কী বলতো? এইজন্য এতোক্ষণ বিতণ্ডা করছিলাম তোমার সঙ্গে।'

আসলে শকুন্তলার অনবনত তেজ দেখে দুষ্মন্ত ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তদ্ব্যতীত, শকুন্তলা বলেছিলেন, 'আমার পিতা কণ্বমুনি এসব কথা জানতে পারলে তোমার মস্তক বিদীর্ণ হবে।' এ কথাও বুঝতে পেরেছিলেন, এই মেয়ে কলঙ্কের ভয়ে বা লজ্জায় পিছিয়ে যাবার পাত্রী নয়। এ তাঁকে সহজে ছেড়ে দেবে না। কিন্তু শকুন্তলা যদি আশ্রমকন্যা না হতেন তবে কক্ষনো রাজাকে এ ভাবে শঙ্কিত করতে সাহস পেতেন না। যে বিবাহ দুষ্মন্ত কামবশত সকলের অজ্ঞাতে করে এসে মুখ মুছে বসেছিলেন, সেই বিবাহ কিছুতেই মেনে নিতেন না। কিন্তু শকুন্তলা আশ্রমের স্বাধীনতায় বর্ধিত বলেই আহত হলে আঘাত ফিরিয়ে দেবার মনের জোর তাঁর ছিলো। তাই রাজসভায় দাঁড়িয়ে সভাসদদের সামনে একাধারে স্বামী এবং ওরকম এক পরাক্রান্ত রাজাকে এভাবে স্পষ্ট বাক্যে মিথ্যাবাদী দুরাচারী পাপিষ্ঠ থেকে শুরু করে তাঁর মিথ্যাচারকে শূকরের বিষ্ঠাভক্ষণের সঙ্গে পর্যন্ত তুলনা করে তিরস্কার করতে পেরেছিলেন।

২

শকুন্তলার আরো কয়েক প্রজন্ম পরে পুনরায় যে রমণী সেই বংশে বিবাহিত হয়ে এসে খ্যাতির আসনে উপবিষ্ট হলেন তিনি সত্যবতী। শকুন্তলার পুত্র ভরত থেকে যে বংশ ভরতবংশ নামে খ্যাত তার একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী সত্যবতীর মানসতাও শকুন্তলার সমগোত্রীয়, জন্মরহস্যও। সাহস এবং ব্যক্তিত্বের কোনো অভাব ছিলো না সত্যবতীর। যা চেয়েছিলেন তা সম্পন্ন করেই সংসার ত্যাগ করেছিলেন। দ্বৈপায়ন ওই একটি চরিত্রের উপর যথাসম্ভব কম আলো ফেললেও তিনি জানতেন ইনিই এই আখ্যায়িকার আসল নায়িকা, আর তিনি নিজে তার প্রধান পুরোহিত। নামত ভরতবংশের কাহিনী হলেও, আসল আখ্যানের কেন্দ্রবিন্দুতে সত্যবতী-দ্বৈপায়নই রয়েছেন।

রাজা শান্তনু সত্যবতীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁর পাণিপ্রার্থী হয়েছিলেন। এবং তা তিনি হতেই পারেন। তবে অবশ্যই তিনি তাঁকে ধীবরপল্লীতে দেখেননি। ধীবরপল্লী কখনো রাজা-মহারাজাদের ভ্রমণস্থল হতে পারে না। এখানে রচয়িতা পুনরায় একটি রূপকথার আবরণ ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন, একদা পরাশর মুনি নৌকা পার হবার সময়ে সত্যবতীর দেহের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি ধীবরকন্যার দেহ থেকে সঙ্গমের পূর্বে মৎস্যগন্ধ দূর করে নিয়েছিলেন। সত্যবতীর দেহ তখন সুগন্ধে পরিপ্লুত হয়। এবং সেই সুগন্ধ চিরস্থায়ী হয়। সুগন্ধ এমন যে বহুদূর থেকেও বাতাসে ছড়িয়ে পড়তো।

একদিন শিকার করতে বেরিয়ে মহারাজা শান্তনু যমুনাতীরে এসে বাতাসে ভেসে আসা এক অতি সুগন্ধে আকৃষ্ট হয়ে সহসা সত্যবতীকে দেখতে পান এবং সেই সুগন্ধে যতো আকৃষ্ট হয়েছিলেন, ততোধিক আকৃষ্ট হন সত্যবতীকে দেখে। শান্তনুর মতো একজন সৎচরিত্র রাজা, যিনি তাঁর প্রথমা পত্নী গঙ্গাকে হারিয়ে সর্বস্ব ত্যাগ করে ছত্রিশ বছর বনে বনে ঘুরে বেরিয়েছেন, যিনি পরম প্রাজ্ঞ, পরম ধার্মিক, পরম ধীমান বলে বর্ণিত, যিনি দেবর্ষি ও রাজর্ষিগণের সম্মানভাজন, যাঁর ধার্মিকতা দেখে অন্যান্য নৃপতিরা তাঁকে সম্রাটপদে অভিষিক্ত করেছিলেন, সমগ্র পৃথিবীর যিনি অধিপতি হবার যোগ্য সেই বিশুদ্ধ কুলীন কুরুপতির পক্ষে মুহূর্তে সত্যবতীর প্রতি এতোটা আকৃষ্ট হওয়া যেমন আশ্চর্য, তার চেয়ে বেশি আশ্চর্য ঘটনা সেই কন্যার পাণিপ্রার্থী হয়ে সেই ধীবরের কুটিরপ্রাঙ্গণে গিয়ে দাঁড়ানো। ধীবর মানেই নিষাদ। সুতরাং অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য। নীচজাতি বা অন্ত্যজদের প্রতি উচ্চজাতির কী ধরনের মনোভাব ছিলো তা শাস্ত্রে, মহাপুরাণে, মহাকাব্যে, কোথাও অপ্রকট নয়। সেই জন্যই বিস্মিত হতে হয়, কেবলমাত্র সুগন্ধই তাঁকে এই আঙিনায় এসে দাঁড় করিয়ে দিলো?

যে করেই হোক, সত্যবতী তাঁকে যে যথেষ্ট সম্মোহিত করতে পেরেছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। একজন ধীবরের পাটনী কন্যার জন্য স্বয়ং সম্রাট এসে দাঁড়িয়েছিলেন এর চেয়ে বড়ো সৌভাগ্য সেই পরিবার আর কী ভাবতে পারে! কিন্তু তাঁরা তা পারলেন, এবং সত্যবতীর পিতা তৎক্ষণাৎ একটি শর্ত রক্ষার দাবী রাখলেন। সেই শর্ত রক্ষায় রাজি না হতে পারায় শান্তনুকে প্রত্যাখ্যানও করলেন।

পিতাকে বিষণ্ণ দেখে এবং তার কারণ জেনে পুত্র দেবব্রত, পিতার প্রিয়চিকীর্ষু পুত্র দেবব্রত, সব শর্ত পালনে সম্মত হয়ে সত্যবতীকে নিয়ে এলেন পিতার কাছে। সত্যবতীর দূরদর্শিতা প্রথম থেকেই সীমাহীন। সেজন্যই, কেবলমাত্র তাঁর গর্ভজাত পুত্রই যে সিংহাসনে বসবে সেই শর্তেই থেমে না থেকে, দেবব্রতর সন্তানও যাতে সিংহাসনের দাবিদার না হতে পারে তেমন প্রতিজ্ঞাই করিয়ে নিলেন দেবব্রতকে দিয়ে। দেবব্রত সেই শর্ত মেনে নিয়ে ঘোষণা করলেন, তিনি কখনো বিবাহ করবেন না।

সেই থেকেই তাঁর 'ভীষ্ম' আখ্যা লাভ। কিন্তু এর মানে কি এই নয় যে শান্তনুর মৃত্যুর পরে সত্যবতী স্বীয় বংশ ভিন্ন অন্য কোনো রক্তের চিহ্ন রাখবেন না?

তাই হলো। আঁটঘাট বেঁধেই তিনি এসেছিলেন এই প্রাসাদের সর্বময়ী কর্ত্রী হয়ে। রূপেগুণে ঈর্ষাযোগ্য মহাভারতের শ্রেষ্ঠ আর্য যুবকটিকে সেই কারণেই তাঁর স্বার্থসিদ্ধির বলি হতে হলো। মহাভারতের অজস্র ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে এটা এমন একটি ঘটনা যার গুরুত্ব দ্বৈপায়ন তেমনভাবে না দিলেও, তার ফলাফল সুদূরপ্রসারী, এবং তাৎপর্য গভীর।

আমরা দেখতে পেলাম, যে সত্যবতী দেবব্রতর জীবনকে সমস্ত দিক থেকে পঙ্গু করে সমগ্র সুখের সুবর্ণ ফটকটি বন্ধ করে দিলেন, পরবর্তীকালে দেবব্রত সেই সত্যবতীরই একান্ত অনুগত একজন আজ্ঞাপালনের বাহকমাত্র। এসব অকল্পনীয় ঘটনা পড়তে পড়তে মনে হয় ভাগ্য আর পুরষকারের মধ্যে ভাগ্যই প্রধান। ভাগ্যচক্রের ঘূর্ণায়মান চক্রটিকেই বড়ো আসন দিতে হয়। বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে আমরা প্রত্যক্ষ করলাম, এই কাহিনীর নায়িকা সত্যবতীর ইচ্ছা নামের তরণীটিকে যিনি অবিরাম অনুকূল বায়ুপ্রবাহে বাহিত হবার সুযোগ দিয়েছেন তাঁর নাম 'ভীষ্ম' আখ্যাধারী দেবব্রত। তিনি তাঁর ত্যাগ ও ঔদার্যের বিনিময়ে এই নিষাদ রমণীটিকে কুরুকুলের মহারানীর সিংহাসনে বসিয়ে পিতাকে সন্তুষ্ট করেই ক্ষান্ত হননি, তাঁর সুখের জন্য নিজেকেও উৎসর্গ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, সত্যবতী দেবব্রতকে অগ্রবর্তী করেই সমগ্র কার্য, যা যা তিনি সম্পন্ন করতে সংকল্প করেছিলেন, সবই নির্বিবাদে সমাধা করতে সক্ষম হয়েছেন।

মহারাজা শান্তনুর সঙ্গে সত্যবতীর বিবাহের পরে অবশ্য অনতিদীর্ঘকালের মধ্যেই দেখা গেলো দেবব্রত যেন মুছে গেছেন সব কিছু থেকে। সেটা তাঁর স্বীয় সুখের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন

দেখেই নিজেকে নিজে সরিয়ে নিয়েছিলেন, অথবা দ্বৈপায়ন আর তাঁকে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই বোধেই পরিত্যাগ করেছিলেন, জানি না। কিন্তু শান্তনুর ইহলীলা সংবরণের অচিরকালের মধ্যেই দেখা গেলো আবার তিনি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ। এবং তার কারণও সত্যবতীই।

শান্তনুর ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে যে দুটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলো তার একজন তখনো বালক, অন্যজন অযোগ্য। এই অবস্থাতেই ছেলেদের রেখে শান্তনু লোকান্তরিত হন। সত্যবতী তাঁর বড়ো পুত্রটিকে রাজপদে বসান। চিত্রাঙ্গদ অতিশয় বলবান ছিলেন, অত্যন্ত দাম্ভিকও ছিলেন। সকলকেই নগণ্য জ্ঞান করতেন। একদিন গন্ধর্বরাজ বললেন, 'সবাইকেই নিকৃষ্ট ভাবো, আমার নাম আর তোমার নাম এক। তুমিও চিত্রাঙ্গদ, আমিও চিত্রাঙ্গদ। আমার সঙ্গে যুদ্ধ করো, দেখি কে জয়ী হয়।' আস্ফালন করে গন্ধর্বরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়েই তাঁর মৃত্যু ঘটে। তাঁর অহংকারই তাঁকে নিহত করলো। নিজের পুত্রকে চিনতে সত্যবতীর দেরি হয়নি, এবং সেই কারণেই তিনি বুঝেছিলেন, এই পুত্রকে যদি কোনো দক্ষ শাসক পরিচালনা না করেন তবে রাজত্ব লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। স্বভাবতই, দেবব্রত ব্যতীত সুচারুরূপে এই রাজ্য শাসন আর কারো দ্বারা সম্ভব নয়। অতএব সত্যবতী বাধ্য হয়েই পিছন থেকে রাজ্য চালনার গুরুভার তাঁর হস্তে ন্যস্ত করলেন। চিত্রাঙ্গদের মৃত্যুর পর অপ্রাপ্তবয়স্ক বিচিত্রবীর্যকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে পুনর্বার সেই পুতুল নিয়েই সত্যবতীর অনুজ্ঞাক্রমে রাজ্য পরিচালনা করতে লাগলেন ভীষ্ম।

সত্যবতী স্বীয় স্বার্থের প্রয়োজনে দেবব্রতকে ডেকে আনলেও দেবব্রতর বাধ্য হবার কোনো দায় ছিলো না। রাজত্ব যেন কোনোক্রমেই গঙ্গাপুত্র দেবব্রতর, অথবা তাঁর বংশধরদের হস্তগত না হয়, সেজন্য সত্যবতী দেবব্রতকে দিয়ে যা যা প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন, তারপরে দেবব্রত কেন নতমস্তকে সত্যবতীর নির্দেশ শিরোধার্য করে নিলেন তার কোনো কারণ দেখতে পাই না। তবে কি যে মোহিনী মায়ায় মহারাজা শান্তনু আবদ্ধ হয়েছিলেন, সেই মোহিনী মায়ায় সত্যবতী তাঁর পুত্র দেবব্রতকেও বন্দী করেছিলেন? সত্যবতী তাঁকে যে-ভাবে ব্যবহার করেছেন, এবং ওইরকম একটি কনককান্তি দ্বিতীয়রহিত বীর যুবক যে-রকম মন্ত্রমুগ্ধের মতো ব্যবহৃত হয়েছেন, দু'য়ের চেহারা একে অন্যের পরিপূরক। জানতে ইচ্ছে হয় সত্যবতী বিষয়ে দেবব্রতর অন্তরে কী চেতনা কাজ করতো। কেন তিনি তাঁর জীবন যৌবন ক্ষমতা এই হস্তিনাপুরের অভ্যন্তরে নিঃশেষ করলেন? তদ্ব্যতীত, পিতার মৃত্যু পর্যন্তই বা কেন এমন নিঃশব্দে আত্মগোপন করে রইলেন?

কুরুকুলের ভাগ্যদোষে শেষ পর্যন্ত সত্যবতীর সব আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রধান সহায় হলেন দেবব্রত। সত্যবতী যদি যন্ত্রী হন, দেবব্রত তাহলে যন্ত্র। আর এই যন্ত্রের যন্ত্রী হয়ে সত্যবতী অতঃপর যে সুর বাজাতে সক্ষম হয়েছেন সেই সুরেই রচিত হয়েছে এ কাহিনী। এই পুস্তক। যে

পুস্তকের নাম মহাভারত। যে পুস্তককে বলা হয় পঞ্চম বেদ। তপোবনে সনাতন বেদশাস্ত্রের সারোদ্ধার করে এ পবিত্র গ্রন্থের জন্ম। যে গ্রন্থের যুদ্ধকে বলা হয় ধর্মযুদ্ধ। এবং যার তুল্য মিথ্যা আর কিছুই হতে পারে না।

পতির মৃত্যুতে সত্যবতী যে খুব কাতর হয়ে পড়েছিলেন এমন মনে হয় না। মহাভারতের নিয়ম অনুযায়ী আরম্ভ করলে শেষ হতে চায় না এই রকম কোনো বিলাপপূর্ণ শোকের চিত্র সত্যবতীর আচরণে দেখানো হয়নি। এমন কি দুই পুত্রকে হারিয়ে তাঁর মাতৃহৃদয়ও যে খুব ভেঙে পড়েছিলো এমন আলেখ্যও রচয়িতা আমাদের প্রত্যক্ষ করাননি। তিনি যে কারণে ভেঙে পড়লেন তা হচ্ছে তাঁর বংশরক্ষা। দুটি পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠটি তো বিবাহের পূর্বেই মারা যায়। কনিষ্ঠটি দুই মহিষীর ভর্তা হয়েও কারো গর্ভেই কোনো বীজ বপন করতে পারলো না।

বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর পরে তাঁর পত্নীদের গর্ভে যখন পুত্রোৎপাদনের প্রশ্ন তুললেন সত্যবতী, তখন তিনি ভীষ্মকেই প্রথম অনুরোধ করেছিলেন। সেটা লোক দেখানো। তিনি খুব ভালোভাবেই জানতেন, যে প্রতিজ্ঞা করে দেবব্রত ভীষ্ম হয়েছেন সে প্রতিজ্ঞা তিনি কখনোই লঙ্ঘন করবেন না। বিবাহিত জীবনের প্রথম দিকে ভীষ্মকে তিনি একটু সন্দেহের চোখেই দেখতেন। কিন্তু সে ভয় তাঁর অচিরেই মুছে যায়। এই মানুষকে চিনতে খেটে খাওয়া নিষাদকন্যা সত্যবতীর বেশি দেরি হয়নি। বিশ্বাস না করলে পুত্রদের হয়ে সাম্রাজ্য পরিচালনার ভার তিনি কখনোই তাঁর উপরে ন্যস্ত করতেন না। ভীষ্ম বললেন, ‘আপনি আমাকে অপত্যোৎপাদন বিষয়ে যে প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলেন তা নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে। আর দারপরিগ্রহ বিষয়েও পূর্বে যা সংকল্প করানো হয়েছিলো তা-ও নিশ্চয়ই ভুলে যাননি।’

ভীষ্ম পুনরায় বলেছিলেন, ‘পরশুরাম যখন একুশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন, তখন ক্ষত্রিয় রমণীরা ব্রাহ্মণ সহযোগেই পুত্রবতী হয়ে পুনরায় ক্ষত্রিয়কুল বৃদ্ধি করেছিলেন, সে ভাবেও আপনি বংশরক্ষা করতে পারেন।’ ভীষ্মের মনে হয়েছিলো বংশরক্ষার সেটাই একমাত্র শুদ্ধ উপায়। তাই সেই পরামর্শই তিনি তাঁকে দিয়েছিলেন। দেখা গেলো সে উপায়টা সত্যবতী গ্রহণ করলেন। অনতিবিলম্বেই তিনি তাঁর কুমারী জীবনের পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে আহ্বান করলেন। বোঝা গেলো ছেলের সঙ্গে তিনি সংশ্রব বহির্ভূত ছিলেন না।

পুত্রও এসে গেলেন তৎক্ষণাৎ, এবং মাতৃআজ্ঞা পালনে রত হতে বিলম্ব করলেন না। সদ্য স্বামী বিয়োগে শোকার্ত বধূ দুটি দ্বৈপায়নের বিকট মূর্তি দেখে ও বীভৎস গন্ধে একজন ভয়ে দুচোখ বুজে এবং অন্যজন ভয়ে পাণ্ডুর হয়ে মৃতের মতো পড়ে থেকে শ্বশ্রূমাতার নির্দেশ পালনে বাধ্য হলেন। স্বীয় পুত্রের দ্বারাই সত্যবতী স্বীয় পুত্রের বধূ দুটির গর্ভোৎপাদন করালেন। এতোদিন কেন তিনি ইতস্তত করছিলেন সে কারণটা বোধগম্য হলো। এই উৎপাদন রুচিসম্মত নয়, শাস্ত্রসম্মত নয়, ধর্মসংগতও নয়। তদ্ব্যতীত, স্বামীর ইচ্ছেতে তার স্ত্রীর গর্ভে অন্যের ঔরসজাত

সন্তানেরা ক্ষেত্রজ পুত্র হিশেবে তখনকার সমাজে স্থান পেলেও শাশুড়ির ইচ্ছেতে পুত্রবধূদের গর্ভে পুত্রোৎপাদনের নজির মহাভারতে অন্য কোথাও নেই। এবং কার দ্বারা উৎপাদন? যে তাদের কেউ নয়। যাঁর মাতা তাদের শ্বশ্রূমাতা হবার বহুপূর্বেই এই সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। দ্বৈপায়ন নিজে কালো, তার মাতা কালো, তার পিতা কালো, সুতরাং এই তিনজনের একজনও যে আর্য নন, সে বিষয়ে কোনো তর্ক নেই। উপরন্তু দ্বৈপায়ন তাঁর মাতার বৈধ-সন্তান নন।

যে মেয়ে দুটি সত্যবতীর পুত্রের নিকট আত্মদান করতে বাধ্য হয়েছিলো, সে মেয়ে দুটিও শান্তনুর রক্তসম্পর্কিত কেউ নয়। সত্যবতী শান্তনুর বংশের জন্য বিচলিত ছিলেন না। ছিলেন স্বীয় বংশ বিস্তারের জন্য। অতএব ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডুও এ বংশের কেউ নয়। সত্যবতীর অনুরোধে ভীষ্ম তাঁর ব্রহ্মচর্য বিসর্জন দিতে অস্বীকার করলেও দ্বৈপায়ন নিজের ব্রহ্মচর্য বিসর্জন দিতে দ্বিধা করেননি। অসহায় এবং শোকার্ত বধূ দুটির উপরে তিনি বা তাঁর মাতা কেউ সুবিচার করেছেন বলে মনে হয় না। আমরা ধর্মত জানি অনিচ্ছুক রমণীতে সংগত হওয়ার নাম বলাৎকার। সত্যবতী তাঁর কানীন পুত্রকে দিয়ে বিচিত্রবীর্যের দুই পত্নীর উপর সেটাই করিয়েছেন। দুই বধূর গর্ভে দুটি পুত্রই প্রতিবন্ধী কেন হলো? তার কারণ হিসাবেও বধূদেরই দোষী সাব্যস্ত করা হলো। বলা হলো, একজন ভয়ে পাণ্ডুর হয়ে গিয়েছিলো তাই পাণ্ডু পাণ্ডুর হয়ে জন্ম নিয়েছেন। অন্য বধূ চোখ বুজে ছিলো বলে ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হয়ে জন্ম গ্রহণ করেছেন।

এই বধূ দুটির বেদনা নিয়ে কোনো হা হুতাশ নেই কোথাও। অন্য পুত্র বিদুর দ্বৈপায়নেরই পুত্র, কিন্তু মাতা রাজবাটীর একটি দাসী। রাজবাটীর দাসীটির নিকট দ্বৈপায়ন দ্বৈপায়ন বলে নন, সত্যবতীর পুত্র বলেই মহার্ঘ। অপরপক্ষে, দাসী হয়ে রানীর পুত্রকে শয্যায় পাওয়া, রানীর পুত্রবধূদেরও যিনি শয্যাসঙ্গী হয়েছেন তাঁকে পাওয়া, কম সম্মানের কথা নয়। চেহারা যেমনি হোক সেই সম্মান সে সাগ্রহে গ্রহণ করেছিলো। একটি সুস্থ সন্তানের জন্ম হলো সেই মিলনের ফলে, যার পিতামহী স্বয়ং সত্যবতী।

বলাই বাহুল্য, শান্তনুর পুত্র বিচিত্রবীর্যের বধূদ্বয়ের গর্ভে দুটি প্রতিবন্ধী পুত্রকে জন্ম দিয়ে দ্বৈপায়ন নিজেকে পিতা বলে ভাবেননি। কেননা তারা বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রজ। সেই পুত্রদের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক থাকা নিয়ম নয়। সে দুটি প্রতিবন্ধী পুত্রের পিতার নাম দ্বৈপায়ন নয়, বিচিত্রবীর্য। তাই তাঁর স্নেহও রাজকন্যাদের দুই পুত্রের চেয়ে দাসীপুত্রের প্রতিই বেশি ছিলো। তদ্ব্যতীত, রাজকন্যা দুটি যে তাঁকে অতিশয় অনিচ্ছা এবং ঘৃণার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলো যে বিষয়েও তিনি অবহিত ছিলেন। আবার ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের অপেক্ষা পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ নামধারী পুত্রদের প্রতিই তিনি বেশি আসক্ত ছিলেন। তার মধ্যে যেটি বড়, যার নাম যুধিষ্ঠির, সে ছেলে যে বিদুরের ঔরসে কুন্তীর গর্ভজাত অবৈধ পুত্র সেটা অন্যদের কাছে গোপন থাকলেও তিনি নিজে তা জানতেন বলেই মনে হয়।

দেখা যাচ্ছে, অসিতাঙ্গ ও অবৈধ সন্তানদের প্রতি দ্বৈপায়নের একটা বিশেষ আকর্ষণ, তাদের যে কোনো প্রকারে হোক জিতিয়ে দিতে তিনি আগ্রহী। তাঁর সংকলনে তিনিই সমাজের নিয়ামক। তাঁর বাক্যই চরম বাক্য। তাঁর বিধানই বিধান। নিজেকে তিনি নিজেই স্রষ্টা হিশেবে দেখিয়েছেন। অনেক সময়ে গ্রীক নাটকের বিবেকের মতো হঠাৎ হঠাৎ উপস্থিত হয়ে তিনি সত্য উদ্ঘাটন করেন। কিন্তু তাঁর বিধানে কর্ণ অপাঙক্তেয়। কর্ণকে তাঁর জন্মকলঙ্কের লজ্জা থেকে তিনি মুক্ত করেন না। পুত্রবধূ কুন্তীকে এ ব্যাপারে অভয়দান করেন না। শুধু যে কর্ণের প্রতিই তিনি নির্মম তাই নয়, ভীষ্মের প্রতিও খুব প্রণয়শীল মনে হয় না। ভীষ্মকে শেষ পর্যন্ত আমরা যে একজন বৃদ্ধ রাজকর্মচারী ব্যতীত আর বিশেষ কিছুই মনে করি না, সেই ছবিও সচেতনভাবে তাঁরই অঙ্কন। তিনিই এই ছবিটি কাহিনীর বিভিন্ন পর্বে বার বার দেখিয়ে এতেই আমাদের এমন অভ্যস্ত করেছেন যে পিতার প্রিয়চিকীর্ষু হয়ে নিজের জীবন যৌবন উৎসর্গ করবার মাহাত্ম্য তাঁকে মহাত্মায় পরিণত হতে দিলো না। সেই উৎসর্গিত অসাধারণ একটি ব্যক্তিত্ব শেষ পর্যন্ত আমাদের কাছে প্রায় স্মরণাতীত একটি সাধারণ মানুষে পরিণত হলো।

সত্যবতীর দূরদর্শিতার আয়নায় প্রথম থেকে শেষ ছবিটির পর্যন্ত ছায়া প্রতিফলিত হয়েছিলো। তাঁর এই অবৈধ পুত্র রাজা হবেন না সেটা সত্য। কিন্তু তাঁর পুত্র পৌত্রাদি তো হতে পারে? সেটাই বা কম কী? তাই সেই ব্যবস্থাই পাকা করে ফেললেন রাজপুত্রদের অকালমৃত্যুর পর। পর্বত বন সমাকীর্ণ, সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হয়ে ধর্মানুসারে প্রজাপালনে যিনি সক্ষম, যশ সত্য দম দান্ত তপস্যা ব্রহ্মচর্য দান ধ্যানে যিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তাঁকেই হতে হলো কতগুলো অযোগ্য মানুষের হুকুম তামিলের দাস। শান্তনুর ঔরসে সত্যবতীর যে দুটি পুত্র ছিলো, একজন চিত্রাঙ্গদ, আর একজন বিচিত্রবীর্য, দুটি পুত্রই যথাক্রমে আস্ফালনে ও কামুকতায় সমান দক্ষ। সারা যৌবন ভীষ্মই বকলমে রাজ্য শাসনের দায়িত্ব বহন করলেন, কিন্তু নামে এঁরাই রাজা। ঝুঁকি তাঁর, উপভোগ ওঁদের। যতোদিন জ্যেষ্ঠ চিত্রাঙ্গদ জীবিত ছিলেন, তিনিই ছিলেন রাজা। তাঁর মৃত্যুর পরে সত্যবতী ভীষ্মের সাহায্যেই কনিষ্ঠ পুত্র বিচিত্রবীর্যকে সিংহাসনে বসালেন। ঠিক আগের মতোই ভীষ্ম তাঁর প্রাজ্ঞতা দিয়ে, বিচক্ষণতা দিয়ে, নির্বিঘ্নে রাজ্যচালনার চাকাটি তৈলাক্ত রাখতে লাগলেন।

বিচিত্রবীর্যের জন্য মহিষী দুটিকেও ভীষ্মই সংগ্রহ করে এনেছিলেন। যখন বিচিত্রবীর্য অবিবাহিত ছিলেন এবং যুবক হয়ে উঠছিলেন, এই সময়ে সংবাদ এলো কাশীরাজ তাঁর কন্যাদের স্বয়ংবর সভার আয়োজন করেছেন। তৎক্ষণাৎ সত্যবতীর অনুমোদন নিয়ে সেই কন্যাদের জয় করে আনতে চলে গেলেন ভীষ্ম। তাঁর কি একবারও মনে হলো না, যিনি পাণিপ্রার্থী, এসব ক্ষেত্রে তাঁরই যাওয়া উচিত? স্বয়ংবর সভায় কন্যা তার নির্বাচিত পাত্রকেই মাল্যদান করে, সেজন্য পাণিপ্রার্থীরাই যান। পরিবর্তে ভীষ্ম গিয়ে হাজির হলেন সেখানে। এই বয়স্ক পাণিপ্রার্থীটিকে

দেখে অন্যান্য রাজন্যবর্গ পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে কিঞ্চিৎ ঠাট্টা-তামাসাও করলেন। এই বয়সে বিয়ে করার শখ নিয়ে টিটকিরিও দিচ্ছিলেন।

প্রশ্নটা এই, ভীষ্মের মতো একজন প্রাজ্ঞ, বয়স্ক ব্যক্তি, শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় যোদ্ধা, যিনি বলেন, 'আমি ত্রৈলোক্য পরিত্যাগ করতে পারি, ইন্দ্রত্ব পরিত্যাগ করতে পারি, এবং তদপেক্ষাও যদি কোনো অভীষ্টতম বস্তু থাকে তা-ও পরিত্যাগ করতে পারি, কিন্তু কদাচ সত্য পরিত্যাগ করতে পারি না। যদি পৃথিবী গন্ধ পরিত্যাগ করে, যদি সূর্য প্রভা পরিত্যাগ করে, জল যদি মধুর রস পরিত্যাগ করে, জ্যোতি যদি রূপ পরিত্যাগ করে, বায়ু যদি সর্পিলগুণ পরিত্যাগ করে, তথাপি আমি সত্য পরিত্যাগ করতে পারি না।' সেই তিনিই যখন বর না হয়েও কন্যাদের রথে আরোহণ করিয়ে বলেন, 'কেউ কন্যাদের বিচিত্র অলংকারে আচ্ছাদিত করে ধনদান পূর্বক গুণবান পাত্রে সমর্পণ করেন। কেউ কেউ দুটি গোরু দিয়ে পাত্রসাৎ করেন, কেউ বলপূর্বক বিবাহ করেন। কেউ কেউ প্রিয় সম্ভাষণে রমণীর মনোরঞ্জন পূর্বক তার পাণিপীড়ন করেন। পণ্ডিতেরা অষ্টবিধ বিবাহবিধি নির্দেশ করেছেন। স্বয়ংবর বিবাহবিধি উত্তম বিবাহের মধ্যে গণ্য। রাজারা স্বয়ংবর বিবাহকেই অধিক প্রশংসা করেন। ধর্মবাদীরা তার চেয়ে বেশী প্রশংসা করেন পরাক্রম প্রদর্শনপূর্বক অপহৃত কন্যার পাণিগ্রাহীকে। সুতরাং আমি এদের বলপূর্বক হরণ করলাম। আমি যুদ্ধার্থে প্রস্তুত। ইচ্ছেমতো তোমরা যুদ্ধ বা অন্য যে উপায়ে হোক এদের উদ্ধার সাধনে যত্নবান হতে পারো।' এই ব্যবহার কি তাঁর উপযুক্ত?

ভীষ্ম নিজে পাণিগ্রাহী নন, তথাপি এইরূপে এই উক্তি তাঁর চরিত্রের পক্ষে অনৃতভাষণের তুল্যই অসংগত। এই উক্তি শ্রবণে, এই কর্ম দর্শনে, অন্যান্য নৃপতিরা ক্রোধে কম্পান্বিত কলেবর হয়ে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করে সত্বর অলংকার উন্মোচন করে রাজসভায় একটা ভীষণ কলরোল শুরু করলেন। অতঃপর বহুসংখ্যক নৃপতিবর্গ ঘোরতর সংগ্রামে লিপ্ত হলেন। চতুর্দিক থেকে বিরোধীরা ভীষ্মকে ঘিরে ধরে ভীষ্মের উপর অনবরত বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন। কিন্তু ভীষ্ম রণনৈপুণ্যে সকলকে পরাস্ত করে কন্যাদের নিয়ে প্রস্থান করলেন। পথে শাল্ব সম্মুখীন হয়ে, ঈর্ষা এবং ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে, 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলে পুনরায় ভীষ্মকে সংগ্রামে উদ্দীপ্ত করলেন, এবং পরাস্ত ভূপতিবর্গ সাধুবাদ জানিয়ে শাল্বকে খুব উৎসাহ দিতে লাগলেন। পুনরায় প্রজ্বলিত ভীষ্ম তাঁর দিকে ধাবিত হয়ে তাঁকেও পরাভূত করলেন। কাশীপতির এই তিনটি কন্যাই সম্ভবত ভীষ্মের এই যুদ্ধ-নৈপুণ্য দর্শনে মোহিত হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, বয়স যাই হোক, এরকম বীর পাণিগ্রাহী অবশ্যই বরণীয়। কিন্তু যখন দেখলেন পাণিগ্রহীতা তিনি নিজে নন, তখন তিন ভগ্নীর মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠা, তিনি বললেন, 'আমি মনে মনে শাল্বকেই বরণ করেছি।' একথা শুনে তাঁকে তাঁর স্বেচ্ছানুরূপ কার্য করবার জন্য মুক্তি দিলেন দেবব্রত। তারপর বিমাতার সঙ্গে পরামর্শ করে অন্য দুটি কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকাকে বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে বিবাহ দিলেন।

বিচিত্রবীর্য রাজ্যপালনে অক্ষম হয়েও রাজা, স্বয়ংবরসভায় না গিয়েও বিজয়ী। অন্যের শৌর্যে বিজিত কন্যাদের সঙ্গে বিবাহিত হয়ে মহানন্দে সাত বৎসর নিরন্তর বিহার করে যৌবনকালেই যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে নিয়তিক্রমে তাঁকে শমনসদনে যেতে হলো। তারপরে কিছুকাল পর্যন্ত কোনো রাজা উপবিষ্ট ছিলেন না সিংহাসনে। সেই শূন্য সিংহাসন শূন্য রেখেই ভীষ্ম রাজ্য চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

শূন্য সিংহাসন পূর্ণ হতে বড়ো কম সময় লাগলো না। শিশুরা জন্ম নিলো, বড়ো হলো, তবে তো হস্তিনাপুরের রাজা হলো? কিন্তু সেখানেও বাধা। বড়ো পুত্রটি অন্ধ, ছোটো পুত্রটি পাণ্ডুর। সুতরাং আর একটি সুস্থ শিশু না জন্মালে চলে না। অতএব পুনরায় ব্যাসদেবের আবির্ভাব এবং সুস্ত শিশুর জন্ম দেবার আমন্ত্রণ এবং বিদুরের জন্ম। রাজকন্যাদের চালাকির ফলে বিদুর জন্ম নিলো রাজবাটীরই একটি সুন্দরী দাসীর গর্ভে। সে অবশ্য সুস্থ সন্তান এবং তার পিতা বিচিত্রবীর্য নন, একান্তভাবেই স্বয়ং ব্যাসদেব। কাকের বাসায় কোকিলের ডিম পাড়ার মতো হলেও দ্বৈপায়ন বিদুরের পিতৃত্বকে অস্বীকার করলেন না। বিচিত্রবীর্যের পুত্ররা তাঁর দ্বারা জন্মগ্রহণ করলেও তারা ক্ষেত্রজ। বিচিত্রবীর্যই তাদের পিতা। প্রকৃতপক্ষে যে স্নেহ মমতা সন্তানের প্রতি প্রাকৃতিক ভাবেই পিতার বক্ষে জন্ম নেয়, সেটা এই ক্ষেত্রজদের প্রতি দ্বৈপায়নের ছিলো না। ক্ষেত্রজরাও নিজেদের বিচিত্রবীর্যের সন্তান হিশেবেই অজ্ঞান বয়স থেকে জানায় কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে পিতা ভাবার কোনো কারণ ঘটেনি। কিন্তু রাজকার্য তো থেমে থাকে না। থাকেওনি।

হস্তিনাপুরের অধিবাসীরা ভীষ্মকে যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত। সুতরাং তাদের নিকট ভীষ্মের কোনো কার্যই প্রতিবাদযোগ্য নয়। ভীষ্ম যা করেন তাই যে তাদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য এ নিয়ে তারা বিন্দুমাত্র সংশয়ী নন। এদিকে সত্যবতীও জানেন তিনি যা করবেন তা-ই মেনে নেবেন ভীষ্ম। তিনি সশব্দেই বলুন, নিঃশব্দেই বলুন, সত্যবতীর কোনো ইচ্ছেকেই ভীষ্ম প্রতিরোধ করতে অক্ষম। নচেৎ কুমারী কালের সন্তানটিকে রাজপুরীতে আহ্বান করে নিয়ে আসার সাহস তিনি পেতেন না। প্রত্যয় হয়, এই ধীবরকন্যাটিকে রাজবাটীতে আনয়ন করে পিতার হস্তে সমর্পণ করার পরে তিনিও সমর্পিত হয়ে গিয়েছিলেন। মহারাজা শান্তনুর একমাত্র কুলতিলক দেবব্রতকে আমরা যতোদিন দেবব্রতরূপে প্রত্যক্ষ করেছি, সমস্ত দিক বিবেচনা করলে তাঁর তুল্য এমন সর্বগুণসম্পন্ন মহৎ চরিত্র মহাভারতে আর নেই। যে মুহূর্তে তিনি ভীষ্ম হলেন সেই মুহূর্ত থেকেই তাঁর দুর্বার ব্যক্তিত্ব স্তিমিত হলো। কেন হলো? সত্যবতীই কি তা সমূলে উৎপাটিত করে সেই অনন্য ব্যক্তিটিকে একেবারে নিজের কুক্ষিগত করে ফেললেন? নচেৎ, অমন বিচিত্র বিশাল মহাদেশে তো একটাই সিংহাসন পাতা ছিলো না দেবব্রতর জন্য? যাঁকে সমরোদ্যত নিরীক্ষণ করলে শত্রুপক্ষ 'সিংহভীত গো-পালের ন্যায় ভয়ে

উদ্বেগে কম্পমান' হয়, যিনি ক্রুদ্ধ হলে যে কুলোদ্ভবই হোক না কেন অচিরকালের মধ্যেই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়, যাঁর শৌর্যবীর্য পরশুরাম অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, নীতি ও মেধায় যিনি অপ্রমেয়, কী করে তিনি অমন নিশ্চেষ্টভাবে বছরের পর বছর নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে রইলেন? কখনো কোনো যুদ্ধ জয়ে যাননি, শিকারে যাননি, ভ্রমণে যাননি, কিছুই করেননি। না হয় পূর্ববৎ মাতামহ জহ্নুমুনির আশ্রমেই প্রত্যাবৃত হতেন। জীবনের উৎকৃষ্ট সময়টা তো তিনি সেখানেই কাটিয়েছিলেন। পিতার কাছে যতোদিন কাটিয়েছেন, মাতার কাছে তার বহুগুণ বেশি সময় কাটিয়েছেন। আশ্রম জীবন তো তাঁর কাছে অচিন্তনীয় নয়। অন্তত অন্যের বশবর্তী হয়ে থাকা অপেক্ষা অবশ্যই সম্মানজনক। সত্যবতীর বংশধরদের জন্য সিংহাসন অটুট রাখার দায়িত্ব তো তাঁর নয়। মনে হয় সত্যবতী কখন কী করাবেন, কী বলবেন, সেই অপেক্ষাতেই তিনি যেন সদাসচকিত। বলা যায় সত্যবতীর অঙ্গুলি হেলনেই তিনি উঠতেন বসতেন। তাঁর নিজের কি কোনো আশা আকাঙ্ক্ষা বাঞ্ছা বাসনা কিছুই আলাদাভাবে ছিলো না? যে রমণী তাঁকে জাগতিক সর্বসুখে বঞ্চিত করেছেন, তাঁর জন্য এমন আত্মবিসর্জন কী করে সম্ভব? কুরুকুলের এই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিটিই যাঁর আয়ত্তে তাঁর তবে কাকে ভয়? কাকে লজ্জা? তাঁর ইচ্ছেই চরম ইচ্ছে। সেজন্যই নির্দ্বিধায় সত্যবতী নিজের কলঙ্কটিকে আহ্বান করে নিয়ে এলেন এই রাজপুরীতে। তিলতম লজ্জাও তাঁকে বিড়ম্বিত করলো না। যদি তা না আনতেন তা হলে কি বিদুরের মতো একটি ধূর্ত, অবৈধ, পরগাছার প্রবেশ ঘটতো এই সংসারে?

সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এটাই, সত্যবতীর প্রতি মুগ্ধতাবশত ভীষ্মের আনুগত্য যতটা সীমাহীন, ততোটাই কার্যকারণের অনধীন। কেবলমাত্র এই কারণেই তিনি যে স্বীয় সর্বনাশ ডেকে এনে সমগ্র কুরুকুলকেই নিশ্চিহ্ন করেছেন তা-ই নয়, সমগ্র দেশটাকেই প্রায় মনুষ্যহীন করে ভাসিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য পুস্তকটি অনেক স্থলেই অসঙ্গতি দোষে দুষ্ট। নিষাদ বালক একলব্যকে নিষাদ বলেই দ্রোণ শিষ্য হিশেবে গ্রহণ করতে পারলেন না, অথচ রাজ্যের যিনি প্রভু তিনি বিবাহ করলেন একজন ধীবরকন্যাকে। ধীবররা যেখানে সকলেই নিষাদ। সঙ্গে সঙ্গে এই তথ্যটাও জানতে কৌতূহল হয়, দ্বৈপায়নের পিতা পরাশরমুনি যখন সত্যবতীর পাণিপ্রার্থী হয়েছিলেন, সত্যবতী তাঁকে কী কারণে প্রত্যাখ্যান করলেন? পরাশর অযোগ্য নন। তাঁকে গ্রহণ করলে অবৈধ পুত্রকে আর অবৈধ কলঙ্কে কলঙ্কিত থাকতে হতো না। সত্যবতীর চরিত্রেও কোনো কালো দাগ থাকতো না।

বিশেষভাবে লক্ষ করলে আরো একটা বিষয় বিস্ময়ের উদ্রেক করে। মহাভারতে যে সব ঘটনার সমাবেশে সে সব ব্যক্তিকে পাপিষ্ঠ বা মহাত্মা আখ্যা দেওয়া হয়েছে, এবং সহস্র বৎসর যাবৎ প্রচারের দ্বারা আমাদের মনে যে বিশ্বাসটিকে হৃদয়ের নিগূঢ় নিবাসে প্রোথিত করা হয়েছে, এবং যে যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধ বলা হয়েছে, তা বড়ই বিভ্রান্তিকর। চার দশকেরও অধিককাল ধরে নিবিষ্টচিত্তে কালীপ্রসন্ন সিংহের সম্পূর্ণ মহাভারত পাঠ করে সাহিত্য হিশাবে তা যতোই মনোমুগ্ধকর বলে মনে করেছি, ততোটাই উদ্ভ্রান্ত বোধ করেছি ধর্মাধর্মের অবিচার দেখে। যুদ্ধ যে ভাবে আগত হলো, তখন যে সব ঘটনা ঘটেছে, সেই সব ঘটনা যদি স্তরে স্তরে সাজিয়ে ক্রমান্বয়ে বর্ণনা সমেত পাঠকদের নিকট তুলে ধরি, বিচক্ষণ এবং সংস্কারহীন বিবেচনার দ্বারা বিশ্লেষণ করলে তাঁরা আমার বিচারকে অগ্রাহ্য করবেন এমন মনে হয় না।

মনোযোগ সহকারে মহাভারতের সমগ্র ঘটনাপ্রবাহে অবগাহন করলে তীরভূমির উচ্ছ্বসিত ফেনা পার হয়ে মধ্যসমুদ্রে পৌঁছানোমাত্র দেখা যায়, বংশের স্থাপয়িত্রী ভরতমাতা শকুন্তলার পরেই এই বংশে যে রমণী প্রধান চরিত্র হিশাবে সগৌরবে সম্মুখে এসে দণ্ডায়মান হলেন সেই সত্যবতীই এই কাহিনীর নায়িকা। মহাযুদ্ধের সূচনা তিনিই করে গেছেন। পৌত্র বিদুর গোয়েন্দার কাজ করে তা অব্যাহত রেখেছেন, দ্বৈপায়ন পুরোহিত হয়ে তার প্রতিবিধান করেছেন, আর সত্যবতী তাঁর অসামান্য চাতুর্যে ঘুড়ির সুতোটি তাঁদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে লাটাইটা রেখেছেন স্বীয় হস্তে। প্রথম থেকে ধরলে এক নম্বর ঘটনাই বিদুরের জন্ম। তারপরেই পাণ্ডু ও তাঁর কনিষ্ঠা পত্নী মাদ্রীর মৃত্যু।

ততোদিনে সত্যবতী বয়স্ক হয়েছেন, ভীষ্মের চালনায় ধৃতরাষ্ট্র মর্যাদার সঙ্গে রাজত্ব করছেন। পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রই জ্যেষ্ঠ। তিনি অন্ধ, সেজন্য প্রথমে পাণ্ডুই রাজ্যের ভার গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কিয়ৎকালের মধ্যেই নিজেকে নিস্ফল জ্ঞানে মনের দুঃখে রাজ্যের ভার ধৃতরাষ্ট্রের হস্তে সমর্পণ করে, তাঁর দুই পত্নী কুন্তী ও মাদ্রীকে নিয়ে হিমালয়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে বিহার করতে চলে যান। বিদুর মাঝে মাঝে সেখানে যেতেন। খোঁজ খবর রাখতেন, পাণ্ডুও জানাতেন। বিদুর অবশ্য পাণ্ডুর জন্য যেতেন না। যেতেন কুন্তীর জন্য। কুন্তীর সঙ্গে তাঁর একটা গোপন সম্পর্ক ছিলো। বিদুরের লোভ ছিলো অপরিমিত এবং স্পর্ধা ছিলো সমুদ্রসদৃশ। সবাই জানেন, সত্যবতীর কুমারীকালের কলঙ্ক, বিকটগন্ধ বিকটাকৃতি দ্বৈপায়নের সঙ্গে দ্বিতীয়বার শয্যাগ্রহণের অনিবার্য অনিচ্ছাতেই অম্বা ও অম্বালিকা নিজেরা উপস্থিত না হয়ে একজন সুন্দরী দাসীকে রানী সাজিয়ে ছল করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন দ্বৈপায়নের সঙ্গে সংগত হতে।

দ্বৈপায়ন সেটা বুঝতে পেরেছিলেন। বুঝতে পেরেও তিনি দাসীর সঙ্গে সংগত হওয়া থেকে নিবৃত্ত হননি। ক্রুদ্ধ হয়ে স্থানও ত্যাগ করেননি, অপমানিত হয়ে অভিশাপও দেননি। সেই সংগমের ফলই এই বিদুর। বিদুরকেও যে ভীষ্ম পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে একইভাবে মানুষ করে তুলেছিলেন, সেটাও নিশ্চয়ই সত্যবতীর অনুজ্ঞাক্রমে। কেননা, সত্যবতী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ভীষ্ম স্বতন্ত্রভাবে কিছুই করেন না, বা করতে পারেন না। সেটা হয়তো নিয়মও নয়। ভীষ্ম তাঁর বিমাতার নির্দেশেই চলেন। নচেৎ বিদুর কী অধিকারে রাজপুত্রদের সঙ্গে একইভাবে বড়ো হয়ে উঠলেন?

অতঃপর, বলা যায় বেশ একটু দেরিতেই, পাণ্ডু রাজ্যত্যাগ করে যাবার অনেক পরে, যৌবনের প্রান্তে এসে ধৃতরাষ্ট্রের একটি সবল সুস্থ পুত্র জন্মগ্রহণ করে বংশ রক্ষার বাতিটি প্রজ্বলিত করলো। আমরা জানি না, এই পুত্র কার গর্ভজাত। রাজবাটির মহিলামহলের কোন অংশের কোন আঁতুড় ঘরে জন্ম নিলো। শুধু এটা জানি, মাতা যিনিই হোন, পিতা প্রকৃতই ধৃতরাষ্ট্র। অথার্ৎ এই পুত্র ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠপুত্র এবং ধৃতরাষ্ট্রের পরে মহারাজা শান্তনুর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার প্রথম অধিকারী।

ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র জন্মেছে জেনেই সহসা বিদুর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। বরং উল্টোটাই আমরা ভেবেছিলাম। সন্তানের পিতা এবং পিতৃব্য দুজনেই যেখানে প্রতিবন্ধী সেই ক্ষেত্রে এই রকম একটি সর্বাঙ্গসুন্দর বলিষ্ঠ শিশুর জন্ম নিশ্চয়ই অতিশয় সুখপ্রদ ঘটনা। গর্ভ যারই হোক বীজ তো ধৃতরাষ্ট্রেরই! ধৃতরাষ্ট্র সত্যবতীর পুত্রের পুত্র, আর এই শিশু হলো দ্বৈপায়নের পুত্রের পুত্র। অবশ্যই সত্যবতীর রক্ত তার দেহে বহমান। সত্যবতীর কী প্রতিক্রিয়া হলো তা অবিদিত রইলো। রচয়িতা আমাদের অন্যত্র নিয়ে এলেন। মহিলামহলের দৃশ্য আমরা দেখতে পেলাম না।

যে কোনো ঘটনাবলীই, কেউ লিখেই প্রকাশ করুন বা বলেই প্রকাশ করুন, নিজস্ব ইচ্ছে বা মতামতটাকেই রচয়িতা বিশেষভাবে ব্যক্ত করেন। এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটলো না। এঁরা, অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু, দ্বৈপায়নের রক্তে জন্মালেও তাঁর কেউ না। দুজনেই বিচিত্রবীর্যের পুত্র। হলোই বা ক্ষেত্রজ, কিন্তু যে পুত্রটি জন্মালো সে বিচিত্রবীর্যরই পৌত্র। দ্বৈপায়নের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। যে একটিমাত্র পুত্র তাঁর, তার নাম বিদুর। বিদুরকে তিনি ভালোবাসেন, বিদুরের কল্যাণ চান। দাসীর গর্ভজাত অবৈধ পুত্র বলে সে যে শান্তনুর সিংহাসনের অধিকারী হতে পারলো না, সেটা হয়তো পুত্রের মতো তাঁর হৃদয়কেও ব্যথিত এবং রুষ্ট করেছিলো। সে জন্যই হয়তো মহাভারত নামের গ্রন্থটি পূর্বাপরই অতিশয় পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। এজন্যই ভরতবংশের পুত্র পাত্র মিত্র সুহৃদ সকলকেই দোষী সাব্যস্ত করে তথাকথিত পাণ্ডবগণকে তুলে ধরে জিতিয়ে দেবার চেষ্টায় অক্লান্ত।

ধৃতরাষ্ট্রকে বিদুর বললেন, ‘এই পুত্র জন্মিয়েই অতি কর্কশস্বরে কেঁদে উঠেছে। চারদিকে সব

অমঙ্গলের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। মহারাজ! যদি রাজ্যের মঙ্গল চান এই মুহূর্তে ঐ পাপাত্মা দুর্যোধনকে হত্যা করুন।' সদ্যোজাত শিশুর নাম তখনি 'পাপাত্মা দুর্যোধন' হয়ে গেলো! এই কীর্তি বিদুরের, যিনি সদ্যোজাত শিশুর বিরুদ্ধে ক্রমাগত ধৃতরাষ্ট্রকে উত্তেজিত করতে লাগলেন, এবং পুনঃপুন বলতে লাগলেন, 'ঐ দুরত্মাকে এই মুহূর্তে নিধন করুন।' বিদুর কখন কোথায় শিশুর এই কর্কশ ক্রন্দন শুনতে পেলেন জানি না। সেকালের নিয়ম অনুসারে সন্তান জন্মানোর জন্যে রক্ষিত পৃথক ঘর পুরুষ মহলের অনেক দূরে থাকতো। সেটা একটা আলাদা জগৎ।

শিশুর ক্রন্দন কর্কশ অথবা কোমল এই নালিশ কিন্তু পরিবারের আর কারো কাছে শোনা গেলো না, কেবলমাত্র বিদুরই শিশুকে তৎক্ষণাৎ নিহত করবার জন্য অতিরিক্ত অস্থির বোধ করতে লাগলেন। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ, কিন্তু বধির নন। তিনি শুনেছেন বলে মনে হলো না। না হোক, বিদুর তো শুনেছেন, সেটাই সত্য। যাঁরা শুনেছেন এমন দু'চারজন লোকও তিনি বাইরে থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে এলেন। কিন্তু খুব বেশি পেলেন না। সত্যবতীর নিকট থেকেও খবরটা আনতে পারলেন না। অথচ এমন মনে হতে লাগলো বিদুর কোনো দৈববাণী শুনেছেন যে এই শিশুকে ধ্বংস না করলে এই মুহূর্তে সারা জগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে। ধৃতরাষ্ট্র সম্ভবত তখনো ততোটা সম্মোহিত হননি যে বিদুরের এই নির্দেশ স্বেচ্ছায় মান্য করবেন। অথবা, হাজার হোক শিশুটি তার প্রথম পুত্র, এবং অতি কামনার ধন, সুতরাং এই একটি স্থানে তিনি তাঁর পিতৃত্বকে কলঙ্কিত করতে পারলেন না। এবং বিদুরের এমন নৃশংস হয়ে ওঠার কারণটা ঠিক কী আমরাও বুঝে উঠতে পারলাম না। বোঝা গেল তার অনেক পরে।

সেই সময়ে কুন্তীও গর্ভবতী ছিলেন। সেই পুত্রের নামই যুধিষ্ঠির। যুধিষ্ঠিরের জন্ম তখনো হয়নি বলেই বিদুর দুর্যোধনকে হত্যা করবার জন্য এত অস্থির ছিলেন। মহাভারতে এ কথা স্পষ্ট করে বলা না হলেও একের পর এক ঘটনা আমাদের বিশ্বাস করতে বাধ্য করে যে এই পুত্র বিদুরের ঔরসেই কুন্তীর গর্ভজাত পুত্র। সেই পুত্র যদি এখনো না জন্মে থাকে, তাহলে জ্যেষ্ঠ হিশেবে তার সিংহাসন প্রাপ্তির আশা দুরাশা মাত্র। তদ্ব্যতীত, সেই পুত্র কেবলমাত্র জ্যেষ্ঠ হলেই তো হবে না, তাকে পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ হিশাবে প্রমাণ করার দায়ও আছে। যে কারণে দ্বৈপায়নের পুত্র হয়েও তিনি রাজা হতে পারেননি, সেই একই কারণ তো তাঁর পুত্রের উপরও বর্ষিত হবে। ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডু যেহেতু বিচিত্রবীর্যের পত্নীদের গর্ভজাত, সেজন্য তাঁর প্রতিবন্ধী হয়েও রাজা হলেন, আর তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ পুত্র হয়েও কোনো দাবিদাওয়ার অধিকারী হলেন না। অথচ অজ্ঞান বয়স থেকে তাঁকে রাজপুত্রদের সঙ্গে একইভাবে ভীষ্ম মানুষ করে তুলেছেন। সবাই এক পিতার সন্তান হলেও বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রজ নন বলেই দাসীপুত্রের পরিচয় তাঁর মিটলো না। ঈর্ষার দংশন তাঁকে দগ্ধ করলো। দ্বৈপায়নের উৎপাদিত বিষবৃক্ষের অঙ্কুরটি তখন বৃক্ষ হয়ে উঠতে

আর বেশি দেরি করলো না।

ধৃতরাষ্ট্র শত পুত্রের পিতা হলেন, কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয়টিই ছিলো কুরুকুলের প্রধান চরিত্র। এখানেও একটা লক্ষ করবার বিষয় আছে। প্রথম পুত্রটির নাম হলো দুর্যোধন, দ্বিতীয়টির দুঃশাসন। কেউ কারো সন্তানের নাম কি দুর্যোধন বা দুঃশাসন রাখতে পারে? বিশেষত যারা আকাঙ্ক্ষার সন্তান এবং যুবরাজ? পরবর্তী জীবনে হয়তো কেউ দুর্জন হতে পারে, কিন্তু জন্মানো মাত্রই তো সেটা প্রকট হওয়া সম্ভব নয়। সম্ভব অসম্ভবের প্রশ্নই থাকে না এ ব্যাপারে। যা থাকে তার নাম ইচ্ছে। সেজন্য নামকরণে সর্বদাই 'দু'র পরিবর্তে 'সু' থাকে। এবার দুর্যোধনকে যদি আমরা সূর্যধন ভাবি, আর দুঃশাসনকে সুশাসন, সেটাই স্বাভাবিক মনে হয় না? 'সু'টাকে 'দু' বলে প্রচার বিদুরের দ্বারাই সাধিত হয়েছে। তবে 'সু' ই হোক বা 'দু' ই হোক, বিদুরকে হতাশ করে দুর্যোধন শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি পেতে লাগলেন, দেশেরও কোনো ক্ষতি হলো না। তাঁর শ্যামল দেহে চন্দ্রবংশীয় রক্ত না থাকলেও পিতামহী অম্বিকার কারণে কিছুটা অন্তত ক্ষত্রিয় রক্ত প্রবহমান ছিলো। তদুপরি, আবাল্য গঙ্গাপুত্র দেবব্রতর শিক্ষায় থেকে রাজোচিত নিয়ম কানুনের সঙ্গে তাঁর সম্যক পরিচয় ঘটেছিলো। বিদ্যায় বুদ্ধিতে অস্ত্রচালনায় যথার্থই পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। সাহস স্বাস্থ্য বিচার বিবেচনা ব্যবহার সমস্ত দিক থেকে তিনি ভবিষ্যৎ রাজার প্রতীক হিশেবে অতি উপযুক্ত ছিলেন। তাঁকে সেই হিশেবেই গণ্য করে সমগ্র দেশবাসী অতি উল্লসিত হয়েছিলো। সর্বসম্মতিক্রমে দুর্যোধনের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবার প্রস্তুতিপর্ব যখন সমাপ্তির পথে, এই সময়েই হঠাৎ কুন্তী এতোকাল বাদে পাঁচটি জটাবল্কলধারী পুত্র সমভিব্যাহারে হস্তিনাপুরে এসে উপস্থিত হলেন। জানা গেলো, জটাবল্কলধারী ওই কিশোররা পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্র! তিনটি কুন্তীর গর্ভজাত, দুটি মাদ্রীর গর্ভজাত। জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের বয়স ষোলো, মধ্যম ভীমের বয়স পনেরো, কনিষ্ঠ অর্জুন চোদ্দো। এই তিনজন তাঁর, মানে কুন্তীর, অন্য দুজন, নকুল সহদেবের বয়স তেরো, ওরা মাদ্রীর যমজ পুত্র।

পাণ্ডুর সঙ্গে কুন্তীর কুলপ্রথা অনুযায়ী বিবাহ হয়নি। কুরুবংশের নিয়ম অনুসারে মাল্যদানের পরে কন্যাকে স্বগৃহে নিয়ে এসে অনুষ্ঠান করতে হয়। কুন্তী নিজেই স্বয়ংবর সভায় পাণ্ডুর গলায় মাল্যদান করেছিলেন। পরে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম প্রথামতো মদ্রকন্যা মাদ্রীকে নিয়ে এসে পাণ্ডুকে দ্বিতীয়বার বিবাহ দেন। সন্তান জন্ম দেবার ক্ষমতা ছিলো না পাণ্ডুর। সেই দুঃখে কবে তিনি চলে গেছেন ধৃতরাষ্ট্রের হস্তে সমস্ত সম্পত্তি সমর্পণ করে তার ঠিক নেই। এতো কাল বাদে পাঁচটি কিশোরকে দেখে এবং পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ শুনে যেমন নগরবাসীরা বিস্মিত হলো, তেমনি পরিবারের আর সকলেও কম বিস্মিত হলো না। প্রথমে ভাবলো, এরা কারা? তারপর পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্র শুনে ভাবলো এতো বড় বড় সব ছেলে, কিন্তু এদের কথা এতো দিনের মধ্যেও তারা ঘুণাক্ষরেও জানলো না কেন? জানতে হলো তাঁর মৃত্যুর পরে? নগরবাসীরা বলতে লাগলো,

'পাণ্ডু তো অনেকদিন পূর্বেই মারা গেছেন, তাঁর কোনো পুত্র আছে বলে তো শুনিনি। তবে এরা কী করে কুরুবংশের হবে? সাক্ষী কে? পাণ্ডুও মৃত, মাদ্রীও মৃত।'

পাণ্ডু কবে মারা গেলেন তারও কোনো নির্দিষ্ট সময় জানা যায় না। হিমালয় শৃঙ্গ থেকে কয়েকজন মুনি কুন্তীদের পৌঁছে দিতে এসেছিলেন, তাঁরা কোনো আতিথেয়তা গ্রহণ না করেই সংক্ষেপে দু'চারটা কথা বলে চলে গেলেন। তাঁরা পাণ্ডু ও মাদ্রীর সতেরো দিনের মৃতদেহ বহন করে এনেছিলেন। সেখানে তাঁরা জলও স্পর্শ করলেন না।

কুন্তী বললেন, জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ধর্মের পুত্র, মধ্যম ভীম পবনপুত্র, কনিষ্ঠ অর্জুন ইন্দ্রপুত্র আর নকুল সহদেব অশ্বিনীকুমারের যমজ সন্তান। স্বামী ব্যতীত আরো তিনটি প্রার্থিত পুরুষের অঙ্কশায়িনী হয়ে কুন্তী এই তিনটির জন্ম দিয়েছেন এবং সূর্যের অঙ্কশায়িনী হয়ে কুমারী অবস্থায় জন্ম দিয়েছিলেন কর্ণকে। এই রহস্যজনক পাঁচটি জটাবল্কলধারী কিশোরকে নিয়ে কুন্তী যখন হস্তিনাপুরে এসে পৌঁছলেন, এবং নানাজনে নানা কথা বলতে শুরু করলো, কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেলো সেই সমালোচনার উপর যবনিকা নেমে এসেছে। সব চিন্তার অবসান ঘটিয়ে, সব নিন্দা অগ্রাহ্য করে, ঐ পাঁচটি বালককে রাজবাটী থেকেই পাণ্ডুর ক্ষেত্রজপুত্র ঘোষণা করে, রাজবাড়ির শিক্ষাদীক্ষা বিষয়ে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা যে গুরুর কাছে যে পাঠ নিচ্ছে এই পাঁচটি বালককেও যেন সেই শিক্ষাদীক্ষার পাঠ সেই গুরুর কাছেই দেওয়া হয়, এ হুকুমটি জারি করা হলো। এর পরে এই পঞ্চভ্রাতা কুরুবংশেরই বংশধর হিশেবে গণ্য হয়ে রাজবাড়ির শিক্ষাদীক্ষা সহবতের অন্তর্গত হলো। হস্তিনাপুরবাসীরা জানলো পাণ্ডুর এই ক্ষেত্রজ পুত্ররা তাদেরই পুত্র মিত্র শিষ্য সুহৃদ ও ভ্রাতা স্বরূপ। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রও জানলেন তাদের যেন তিনি পুত্রজ্ঞানেই গ্রহণ করেন।

এখন কথা হচ্ছে এতো অল্প সময়ের মধ্যে এই সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত এমন সহজে নেওয়া কার দ্বারা সম্ভব হলো? কাজটা যিনিই করুন, যিনিই বলুন, সেটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্নটা হচ্ছে সকলের মুখ বন্ধ করার মুখ্য ব্যক্তিটি কে? রচয়িতা সে নামটি ঘোষণা করেননি। না করলেও এটা বুঝতে কারো অসুবিধা হয় না, যাঁর ইচ্ছেতে দ্বিধাহীনভাবে দ্বৈপায়ন এসে এই প্রাসাদে প্রবেশ করেছিলেন, তাঁর হুকুমই তামিল করলেন ভীষ্ম। সত্যবতী তখন রানীপদবাচ্য না থাকলেও, সমস্ত আদেশ নির্দেশ তিনিই দিয়ে থাকেন। কর্মচারীরা সেটা পালন করে। তার মধ্যে প্রধান ব্যক্তি ভীষ্ম। দ্বৈপায়ন সত্যবতীর নাম উল্লেখ না করলেও, হুকুমটা ঐ বড় তরফ থেকেই যে এসেছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। যুধিষ্ঠির যে বিদুরের পুত্র সে খবরটা নিশ্চয়ই তিনি জেনেছিলেন। তিনি প্রচ্ছন্নই রইলেন, সকলে এটা ভীষ্মের আদেশ বলেই মেনে নিলো। ভীষ্ম যা বলেন সেটাই সকলে নির্দ্বিধায় মেনে নিতে অভ্যস্ত। এ কথাও তাঁরা জানেন, সত্যবতীর অমত থাকলে, এবং তিনি গ্রহণযোগ্য মনে না করলে, ভীষ্মও সেটা বলবেন না। সুতরাং সেই

বাক্যকেই ধ্রুব বাক্য হিশেবে গ্রহণ করে মুহূর্তে নিঃশব্দ হয়ে গেলো সন্দেহের ফিশফিশানি।

কিন্তু সকলের মন থেকেই যে সেটা মুছে গেলো সেটা ঠিক নয়। বিশেষভাবে কুন্তী যখন বললেন, দুর্যোধনের বয়স পনেরো, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের বয়স ষোলো। সুতরাং এই কুলে পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ হিশেবে যুধিষ্ঠিরই জ্যেষ্ঠ। তখন কিন্তু অনেকেই এই আকস্মিক ঘটনাকে সন্দেহের ঊর্দ্ধে ঠাঁই দিতে পারলেন না। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ, বিদুরের বুদ্ধিকেই সর্বাধিক বলে গণ্য করেন, সুতরাং এ ব্যাপারে বিদুরের মতামতই তাঁর মতামত। তদুপরি সত্যবতী এবং ভীষ্ম যা মেনে নিয়েছেন তার উপরে আর কারো কোনো মতামতের প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু স্বাধীনচিত্ত দুর্যোধন, মাতৃস্নেহ বঞ্চিত দুর্যোধন, ভীষ্মের আদর্শে গঠিত যুবরাজ দুর্যোধন, অবশ্যই এই স্বীকৃতিকে সুনজরে দেখলেন না। এই পাঁচটি পুত্রের ব্যবহারে তাদের মধ্যে কুরুকুলোচিত এক বিন্দু সংস্কৃতি আছে বলে মনে হয়নি তাঁর। কুন্তীকে তিনি এই প্রথম দেখলেন। বিদুরের ব্যাপারটাই সব চাইতে বেশি আশ্চর্য করলো তাঁকে। তিনি কুন্তীকে নিয়ে যেমন ব্যস্ত, পুত্রদের নিয়ে ততোধিক। দুর্যোধনকে বিদুর কোনোদিনই সহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু এই ছেলেদের বেলায় তিনি সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। দুর্যোধন ভেবে পেলেন না, এতো স্নেহ এই মনুষ্যটির হৃদয়ে এতোদিন কোথায় লুক্কায়িত ছিলো! একজন মানুষের কী করে এরকম দুই চেহারা হতে পারে! তিনি কুন্তীকে যে ভাবে সদাসুখী রাখতে ব্যস্ত, সেই ব্যস্ততা যাঁকে নিয়ত দেখেন সেই ভ্রাতৃবধূ গান্ধারীর প্রতি কখনো দেখা যায়নি, এমনকি এতো ঘনিষ্ঠতা নিজ স্ত্রীর সঙ্গেও দেখা যায় না।

কুন্তী বলেছেন, যুধিষ্ঠিরের বয়স ষোলো। তার প্রমাণ কী? তদ্ব্যতীত, এই ছেলেদের পাণ্ডুর মৃত্যুর পরে কেন কুরুকুলের পুত্র মিত্র ভ্রাতা বলে প্রকাশ করা হলো? এতোগুলো বছর কাটলো, তখন কেন জানা গেলো না পাণ্ডু একজন দুজন নয়, পাঁচ পাঁচটি ক্ষেত্রজ পুত্রের পিতা হয়েছেন! তবে কি পাণ্ডুর মৃত্যু না হলে ক্ষেত্রজ বলা সম্ভব ছিলো না?

এতোগুলো সম্ভাব্য অসম্ভাব্য চিন্তাকে বিন্দুবৎ গ্রাহ্য না করে, এবং পরিবারের নিয়মকে উপেক্ষা করে, কিছুই না জেনে, না শুনে সত্যবতীর এই আপাত তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত বিস্ময়কর। এর মধ্য দিয়ে তাঁর চরিত্রের কঠিন কর্ত্রীত্ব আবারও উদ্ঘাটিত। সত্যবতী এখন যে শুধু রানী নন তা-ই নয়, রাজমাতাও নন। বলা যায়, সাধারণ নিয়ম অনুসারে কেউ নন। স্বামীর মৃত্যুর পরে তখনকার মহিলাদের বানপ্রস্থ নেওয়াই ধর্ম ছিলো। তা তিনি নেননি। এই না-নেওয়ার মধ্যেও তাঁর লক্ষ্যপূরণের ইঙ্গিত আছে। আসলে কিছুই তিনি পরোয়া করেন না। তাঁর মনের পর্দা এই সব ক্ষুদ্র নিন্দাপ্রশংসার অনেক উপরে বাঁধা। তাঁর ইচ্ছে তাঁর, তাঁর ধর্ম তাঁর, তাঁর সিদ্ধান্তও তাঁরই। স্বকীয়তায় তিনি অনন্যা। কোনো কোনো মানুষ এই ধরনের ব্যক্তিত্ব নিয়ে জন্মায়। তাছাড়া, সত্যবতী তথাকথিত বড়ো বংশের কন্যা নন, সেটাই তাঁর আশীর্বাদ। লজ্জা, সংকোচ,

কুণ্ঠার বিলাস এই সুন্দরী, কৃষ্ণকায়া, খেটে-খাওয়া নিষাদকন্যার থাকাটাই অস্বাভাবিক।

যদি বলি দুর্যোধন স্বভাবতই কিছুটা সংযত এবং সহিষ্ণু চরিত্রের মানুষ তাহলে শতকরা একশোজনই হয়তো অট্টহাস্য করে উঠবেন। কেননা, কেবলমাত্র শুনে শুনে, প্রচারের মহিমায়, তার উল্টো কথাটাই সকলে বিশ্বাস করে এসেছেন সহস্র সহস্র বছর যাবৎ। জন্মমুহূর্ত থেকেই বিদুর বলে আসছেন, কেন দুর্যোধনকে মেরে ফেলা হলো না। পাণ্ডবরা এসে পৌঁছনোমাত্রই বলতে শুরু করছেন, দুর্যোধন রাজ্যলোভী, পাপাত্মা অসূয়াবিষে আক্রান্ত, দুর্মুখ। অর্থাৎ যাকে আমরা সর্বরকমেই একটা ঘৃণ্য চরিত্র বলে ভাবি, সেইসব বিশেষণেই তাকে দ্বৈপায়ন বিদুরের মুখ দিয়ে বিভূষিত করেছেন। যতোদিন দুর্যোধন অবোধ বালক ছিলেন, এসব উক্তির অর্থ তাঁর বোধগম্য হয়নি। বড়ো হবার পরে যখন বুঝতে পেরেছেন, কী করে সহ্য করেছেন সেটা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। বিদুর দাসীপুত্র, তিনি রাজপুত্র। বিদুরের স্পর্ধার এবং ঈর্ষার কোনো তুলনা ছিলো না। যখন এসব বিশেষণ দুর্যোধনের বুদ্ধির অন্তর্গত হয়েছে, প্রকৃত ক্ষত্রিয় হলে এসব দুর্নামের মূল্য দিতে বিদুরের জিহ্বা তিনি তন্মুহূর্তেই তরবারির আঘাতে চিরদিনের মতো স্তব্ধ করে দিতেন। এসব অকারণ মিথ্যা আখ্যা সহ্য করবার মতো সংযম কোনো মানুষেরই থাকে না, থাকা সম্ভব নয়। জন্মানোমাত্রই কেন মেরে ফেলা হলো না, এমন একটি তীব্র বাক্য যে কোনো মানুষকে বিকৃত করে দিতে পারে। দুর্যোধনের পিতা ধৃতরাষ্ট্রই বা কেন প্রতিবাদ করেননি কে জানে! ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ, কিন্তু বধির নন, তথাপি স্বীয় পুত্র বিষয়ে এসব আখ্যা তাঁকে স্পর্শ করেনি কেন? তাহলে বিদুর কখনোই সাহস পেতেন না এই অন্যায় প্রচার চালাতে। ধৃতরাষ্ট্র প্রায় নির্বোধের মতো বিদুরের বুদ্ধি অনুসারে চলতেন, বলতেন। হয়তো পিতার উপর অভিমানবশতই বিদুরকে উচিত শিক্ষা দেবার চাইতে উপেক্ষাই সঙ্গত মনে করেছেন দুর্যোধন।

এই প্রসঙ্গে আরো একটা প্রশ্ন উত্থাপন না করে পারছি না। সেটা হলো ধৃতরাষ্ট্রই তো জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, অন্ধ বিধেয় মাত্রই কিয়ৎকালের জন্য পাণ্ডু রাজা হয়েছিলেন। বহু বৎসর তিনি আর প্রত্যাবৃত হননি। রাজা থাকাকালীনও তাঁর মৃত্যু হয়নি। তবে কী কারণে তাঁর জ্যেষ্ঠ ক্ষেত্রজ নামধারী যুধিষ্ঠির রাজা হবেন? রাজত্বভার ধৃতরাষ্ট্রের উপর, তাঁর পুত্রদেরই জনপদবাসী রাজপুত্র হিশেবে গণ্য করেন। তদুপরি, সেই পুত্রেরা তাঁর ঔরসতাজ পুত্র, ক্ষেত্রজ নয়।

পরিবারে মহারাজা শান্তনুও জ্যেষ্ঠ ছিলেন না। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও রাজত্বের ভার শান্তনুর হস্তেই সমর্পণ করে গৃহত্যাগ করেন। তাঁদের তিন ভ্রাতার মধ্যে শান্তনু মধ্যম ভ্রাতা। কনিষ্ঠভ্রাতা বহ্লীক তাঁর পুত্র পৌত্রাদি নিয়ে রাজপরিবারেই বাস করছিলেন। দেবব্রত গঙ্গার অষ্টম গর্ভের সন্তান। নিশ্চয়ই পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্র নন। কিন্তু সেখানে কনিষ্ঠ ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সিংহাসনের দাবিদার হিশেবে দেখানো হয়নি। কিন্তু এখানে কেন সেই প্রশ্ন উঠলো?

শান্তনু এবং তাঁর পুত্র দেবব্রত বিষয়েও একটা গল্প তৈরি করেছেন রচয়িতা। শান্তনু যখন গঙ্গার

প্রণয়ে মোহাচ্ছন্ন হয়ে তাঁর পাণিপ্রার্থী হলেন, গঙ্গাও একটা শর্ত করেছিলেন বিবাহের পূর্বে। তিনি বলেছিলেন, 'আমি যা করবো, তা শুভই হোক, অশুভই হোক, তুমি কখনো জিজ্ঞাসা করতে পারবে না। জিজ্ঞাসা করলেই আমি তোমাকে পরিত্যাগ করে চলে যাবো'। শান্তনু তাতেই রাজি হয়েছিলেন। বিবাহের পরে গঙ্গা যখন পুত্রবতী হলেন, জন্মানো মাত্রই সে ছেলেকে তিনি নিজের হাতে গঙ্গায় নিক্ষেপ করে এলেন। দ্বিতীয় পুত্রের বেলায়ও অনুরূপ কার্যই করলেন। তৃতীয় পুত্রের বেলায়ও ঠিক তাই হলো। এক এক করে যখন সাতটি পুত্রকে একই ভাবে তিনি জলাঞ্জলি দিলেন, অষ্টমবারে আর শান্তনু নিজেকে সম্বরণ করতে পারলেন না। বললেন, 'তুমি কি মানবী না আর কিছু? এভাবে এতোগুলো ছেলেকে জলে ডুবিয়ে মারলে মা হয়ে?'

বলা মাত্রই গঙ্গা শান্তনুকে পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। বলে গেলেন, 'তোমার অষ্টম সন্তানটিকে আমি জলে ফেলবো না, কথা দিলাম।'

আসল উপাখ্যানটি এই। একদা বসুগণ পত্নীসহ বশিষ্ঠের তপোবনে বিহার করতে এসেছিলেন। বশিষ্ঠের কামধেনু নন্দিনীকে দেখে কোনো বসুর পত্নী তাকে নিয়ে যান। বশিষ্ঠ আশ্রমে ফিরে এসে দেখেন নন্দিনী নেই। তখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দেন, 'যারা আমার ধেনুকে নিয়েছে তারা মর্ত্যে মনুষ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করবেন।' বসুরা তখন ব্যাকুল হয়ে অনেক অনুনয় বিনয় করাতে বশিষ্ঠ প্রসন্ন হন, এবং বলেন, 'ঠিক আছে, তোমরা এক বৎসর পরে শাপমুক্ত হবে, কিন্তু পত্নীর জেদে যে বসু নন্দিনীকে নিয়ে যায়, সে বসু নিজের কর্মফলে দীর্ঘকাল মনুষ্যলোকে বাস করবে।'

গঙ্গা বললেন, 'মহারাজ অভিশপ্ত বসুগণের অনুরোধেই তোমাকে বিবাহ করেছি এবং তাদের প্রসব করে জলে নিক্ষেপ করেছি। তবে এই অষ্টম পুত্রটি বেঁচে থাকবে এবং মনুষ্যলোকের অধিবাসী হবে। মৃত্যুর পরে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হবে।' এই দেবব্রতই সেই অষ্টম বসু।

এই গল্প এখানে অবান্তর, তথাপি তখনকার লোকেদের বিশ্বাস যে অতিমাত্রায় সরল ছিলো সেটাই জানানো। অবশ্য এখনো বহু মানুষ অশিক্ষার অন্ধকার হেতু সেই সব বিশ্বাস থেকে যে মুক্তি পেয়েছে তা নয়। তাবিজ কবচ তো আছেই। আর আছে মানুষকে ভগবান বানিয়ে সেই পায়েই নিজেকে উৎসর্গ করা। মহারাজা শান্তনুর পত্নী গঙ্গাকে যে গোপনে তাঁর সাতটি পুত্রকে জলে নিক্ষেপ করতে হয়েছে, বাস্তবানুগ ব্যাখ্যা করলে তার প্রকৃত অর্থ এটাই দাঁড়ায় যে সম্ভবত দেহের কোনো দোষে গঙ্গার সন্তানরা মৃত অবস্থাতেই জন্মাতো। সেটা গোপন করতেই এই গল্পের উৎপত্তি। তখনকার দিনে পুত্রের জন্য যে হাহাকার ছিল (এখনও কম নয়) তাতে কোনো মহিলার সব সন্তানই যদি নষ্ট হয়ে যেতো, তাকে অবশ্যই মানবী না বলে পিশাচী বা ডাকিনী যোগিনী বলে হত্যা করা হতো, কিংবা তাড়িয়ে দেওয়া হতো। নিম্নবর্গের মধ্যে এবং

আদিবাসীদের মধ্যে এখনো তার চলন ফুরিয়ে যায়নি।

৪

বিদুর ইতিমধ্যেই ভীষ্মের হাত থেকে ধৃতরাষ্ট্রকে অনেকখানি সরিয়ে আনতে পেরেছেন। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তিন ভ্রাতাই একসঙ্গে একই শিক্ষায় একই সহবতে বড় হয়ে উঠেছেন, ধৃতরাষ্ট্র সকলের চাইতে বড়ো, ভালোবাসাই স্বাভাবিক। তা ব্যতীত, ব্যাসদেবের রচনায় বিদুরকে ধর্মাত্মা এবং পরম বুদ্ধিমান বলে জানানো হয়েছে। বিদুর যে প্রকৃতই ধর্ম সে বিষয়ে দ্বৈপায়ন একটা গল্পও পাঠকদের উপহার দিলেন। মাণ্ডব্য নামে এক মৌন তপস্বী ছিলেন। একদিন কয়েকজন চোর চুরি করে রাজরক্ষীদের ভয়ে পালিয়ে যেতে যেতে মাণ্ডব্যের আশ্রমে ঢুকে সব ধন-দৌলত সেখানেই লুকিয়ে রাখলেন। রক্ষীরা খুঁজে খুঁজে সেই আশ্রমে এলেন। সেখানে সমস্ত অপহৃত ধন দেখে মাণ্ডব্যকে রক্ষীরা নানা প্রশ্ন করলেন, কিন্তু তিনি মৌনব্রত অবলম্বন করার জন্য কোনো জবাব দিলেন না। তখন চোরেদের সঙ্গে রক্ষীরা মাণ্ডব্যকে ধরে নিয়ে গিয়ে শূলে চড়ালেন। মাণ্ডব্যর কিন্তু তাতে মৃত্যু হল না। শেষে রাজা তার পরিচয় পেয়ে শূল থেকে নামালেন। কিন্তু শূলের অগ্রভাগ ভেঙে দেহে রয়ে গেল। একদিন তিনি ধর্মরাজের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোন কর্মের ফলে আমাকে এই দণ্ড দিয়েছেন?' ধর্ম বললেন, 'আপনি বাল্যকালে একটি পতঙ্গের পুচ্ছদেশে তৃণ প্রবিষ্ট করেছিলেন, তারই এই ফল।' মাণ্ডব্য বললেন, 'আপনি লঘু পাপে আমাকে এই গুরু দণ্ড দিয়েছেন। আমার শাপে আপনি শূদ্র হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন।'

সেই শাপের ফলেই ধর্ম বিদুররূপে দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন। সুতরাং সেই ধর্মের প্রতি ভক্তি থাকা, বিশ্বাস থাকা, কিছু আশ্চর্য নয়। বিদুর যদি সচেষ্ট হন ভীষ্মর হাত থেকে ধৃতরাষ্ট্রকে সরিয়ে আনা কিছু কঠিন কাজ নয়। বস্তুত, ধৃতরাষ্ট্রও যে খুব অনিচ্ছুক ছিলেন তা নয়, তিনি রাজা, অথচ রাজ্য চালাচ্ছেন ভীষ্ম, এই অবস্থাটা তাঁর মনে হয়তো একটা কণ্ঠকের মতো বিঁধেও থাকতো। প্রজারা ভীষ্মের অধীন, ভীষ্মের প্রতিই তাদের অবিচলিত শ্রদ্ধা। এটা তাঁর রাজার সিংহাসনে বসে ভালো লাগার কথা নয়। ক্রমে ক্রমে হয়তো একটা হীনমন্যতায় ভুগতে শুরু করেছিলেন। ধূর্ত বিদুর সেই সুযোগটা গ্রহণ করে ক্ষণকাল অপেক্ষমাণ না থেকে তৎক্ষণাৎ সেই ক্ষেত্রে বারিসিঞ্চন করতে আরম্ভ করলেন। ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মের সঙ্গে কোনো পরামর্শ অপেক্ষা বিদুরের বুদ্ধিকেই বেশি প্রাধান্য দিতেন। বিদুরও অনবরত কুপরামর্শ দিয়ে দিয়ে দৃষ্টিহীন মানুষটিকে একেবারে দুর্বল করে ফেললেন। স্বীয় স্বার্থের জন্য তাঁর যেভাবে চলা প্রয়োজন, যেভাবে বলা প্রয়োজন, চুম্বকের মতো ধৃতরাষ্ট্রকে সেভাবেই চালাতেন। তাহলে ছবিটা ঠিক এই দাঁড়ালো যে কুরুকুলের প্রধান শত্রু সত্যবতী, অর্থাৎ কলকাঠিটা তিনিই

নেড়েছেন, আর সেই শত্রুতাকে অব্যাহত রাখার প্রধান সহায় তাঁর অবৈধ পুত্রের অবৈধ পুত্র বিদুর। আর ভীষ্মের কেন সত্যবতীর প্রতি এই অন্ধ আনুগত্য সেটা অবশ্য গভীর অন্ধকারেই প্রলেপিত হয়ে থাকলো।

কুরুরাজ্যের একটি সুস্থ বংশধর বিষয়ে হত্যার ন্যায় একটি ভয়ঙ্কর শব্দ কী দুঃসাহসে বিদুর উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন তার কারণটাও ক্রমশ বোধগম্য হলো। যে কোনো অবৈধ সন্তান, কি আর্য কি অনার্য, সব সমাজেই অপাঙক্তেয়। তাদের অধিকার সীমিত। তিনি যে সিংহাসনের অধিকার পাননি, সেই জ্বালা মেটাবার একটাই মাত্র উপায় ছিলো বিদুরের। যুধিষ্ঠিরকে দুর্যোধন অপেক্ষা বয়সে বড় দেখানো এবং যুধিষ্ঠির যে পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্র সেটা সকলকে জানানো। আর অন্য চারটি পুত্র কার দ্বারা জন্মগ্রহণ করেছে তা না জানলেও, এরাই যে যুধিষ্ঠিরকে সর্বপ্রকারে রক্ষা করবে সেটা ঠিক জানেন। সুতরাং, নিজে রাজ্য না পেলেও তাঁর পুত্র তো পাবে! আর পাবে এই চারটি ভ্রাতার সাহায্যেই। তিনি তখন রাজার পিতা হয়ে সেই সম্মান ভোগ করবেন, আর কুরুরা হবে তাঁর তাঁবেদার। কিন্তু সেটা নিশ্চয়ই পাণ্ডু আর মাদ্রীর মৃত্যু ব্যতীত সম্ভব নয়।

যদি তাই হয়, তবে এমন হওয়া কি অসম্ভব যে এই পুত্রদের বিষয়ে পাণ্ডু কিছুই জানতেন না, অর্থাৎ তিনি ক্ষেত্রজ পুত্র গ্রহণ করেননি? সেজন্যই তাদের অস্তিত্ব প্রকাশিতব্য ছিলো না? দুর্যোধনের জন্মের পরে যে জ্বালা যন্ত্রণা প্রতিহিংসা বিদুরকে প্রায় উন্মত্তের মতো তাকে হত্যা করবার জন্য দিশাহারা করে তুলেছিলো, সেই অনুভূতি পুনরায় তাঁর মনকে গ্রাস করলো। কুন্তী কুমারী জীবনে যেমন কর্ণের জন্মদাত্রী হয়েছিলেন, যুধিষ্ঠিরের জন্মদাত্রীও ঠিক একইভাবে হয়েছিলেন। যুধিষ্ঠিরের পরে যে কুন্তী আরো দুটি সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন তাদের কোনো পিতৃপরিচয় অনুমান করা শক্ত, তবে এটা অনুমান করা যায় পাণ্ডু তাঁর প্রথমা পত্নী অপেক্ষা মাদ্রীর সঙ্গেই বেশি সময় কাটাতেন। কুন্তীরও স্বামীকে সাহচর্য দেবার মতো সময় থাকতো না। ধৃতরাষ্ট্রের তখন বিদুরের চক্ষুই তাঁর চক্ষু, বিদুরের শ্রবণই তাঁর শ্রবণ, বিদুরের বুদ্ধিই তাঁর বুদ্ধি, বিদুরের বাক্যই তাঁর বাক্য। দুর্যোধন বিষয়ে তাঁর পিতৃস্নেহ প্রকৃতিগত ভাবে থাকলেও, তিনিও জানেন তাঁর ছেলে অত্যন্ত দুরন্ত। দুর্যোধনের মাতা কে তা যেমন আমরা জানি না, মনে হয় দুর্যোধনও জানেন না। অতএব মাতৃস্নেহ, পিতৃস্নেহ, দুই-ই তাঁর নিকট প্রায় শূন্য। পাঁচটি পুত্রের জন্য কুন্তীর মাতৃস্নেহ দেখতে দেখতে এমন হতে পারে, এই অভাববোধ তাঁকে কষ্ট দিতো। তবে ভ্রাতারা তাঁকে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে, সেখানেই তাঁর অনেক অভাব পূরণ হয়ে যায়। ধৃতরাষ্ট্র পিতা সেটা ঠিক, কিন্তু কার গর্ভে জন্মেছিলেন সেটা ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না। একশোজন ভ্রাতা, কোন ভ্রাতা কোন মায়ের গর্ভজাত সন্তান সেটা মুছে দেওয়া হয়েছে শিশুকাল থেকেই। বীজ যার বৃক্ষও তাঁর, এই নীতিই পালিত হয়েছে সেখানে। পুত্রের প্রয়োজন, পুত্র পেলেই হলো। কোন ক্ষেত্রের বৃক্ষ সেটা বড়ো কথা নয়, কার ক্ষেত্রের বীজ সেটাই আসল।

মাতারা প্রয়োজন ফুরোলেই অনাবশ্যক হিশেবে পরিত্যক্ত। সত্য ঘটনাটা আর উদ্ঘাটিত হয় না। সেটা উহ্য।

জানাবার প্রয়োজন না থাকলেই সেটা উহ্য। রাজা-মহারাজারা ইচ্ছেসুখ নারীসংগম করতে পারতেন। সমাজ সেটাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। অবশ্য সেই স্বীকৃতি নরজাতীয় সব মানুষের বেলাতেই অটুট, এখনো অটুট। তবে রাজাদের বেলায় সামান্য পার্থক্য এই যে পতি যার গর্ভেই সন্তান উৎপাদন করুন না কেন, মাতা হবেন তাঁর বিবাহিতা পত্নী। অথার্ৎ পতি পরমগুরুর এই সব দুষ্কৃতিকেও হতভাগ্য রমণীটিকে মান্য করতে হবে। সেই হিশেবেই গান্ধারী তাদের মাতা। অনুমিত হয় গান্ধারী যখন পেটে টিউমার নিয়ে দু বছর অসুস্থ ছিলেন, ধৃতরাষ্ট্র তখনই বিভিন্ন রমণীসঙ্গ করে এতোগুলো মানবসন্তানকে পৃথিবীতে এনেছিলেন। আমরা গান্ধারীকেই ধৃতরাষ্ট্রের একমাত্র মহিষী বলে জানি, কিন্তু মহাভারতের অনেক স্থলে উল্লেখ আছে ধৃতরাষ্ট্রের 'পত্নীগণের'। তবে সেইসব পত্নীগণকে আমরা প্রত্যক্ষ করি না। দুর্যোধনও করেন না। পৈতৃক অধিকারে গান্ধারীকেই মাতা হিশেবে গ্রহণ করলেও, পুত্রদের প্রতি কুন্তীর যে স্নেহ, যে মাতৃভাব, গান্ধারীর নিকট সেটা তিনি পাননি।

অবশ্য ধৃতরাষ্ট্রকে নিয়ে মস্তিষ্ক ঘর্মাক্ত করে লাভ নেই। মহারাজা শান্তনুর প্রাসাদ এখন অনার্য এবং অবৈধ শোণিতেই বিধৌত। এই কঠিন কার্যটি মাতা সত্যবতীই অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন। সত্যবতীর দুর্দান্ত সাহস ও অনমিত ইচ্ছার শক্তি লৌহ-সদৃশ। তথাপি, বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রজ পুত্ররা দ্বৈপায়নের ঔরসে জন্মালেও কুরুবংশের সন্তান বলেই খ্যাত হবে। সে পরিচয়টা নির্মূল করার জন্যই তথাকথিত পাণ্ডবগণের একবিন্দু অনিষ্টের সম্ভাবনাতেও বিদুর এবং তদীয় পিতা দ্বৈপায়ন অস্থির হয়ে ওঠেন। অনেক তথ্য সযত্নে এড়িয়েও যান। অবশ্য সেই ফাঁকটুকু সব সময়েই তিনি অতি সুন্দর একটি রূপকথা দিয়ে ভরে দেন। কোনো অভাববোধ থাকে না। সেই সময়ে সেই সব উপাখ্যানকে অবিশ্বাস করতেও ইচ্ছে করে না। উপাখ্যানগুলো যেন অলঙ্কার। পড়তে পড়তে মনে হয় একটা স্বপ্নের জগতে এসে উপস্থিত হয়েছি।

যেমন গান্ধারীর গর্ভধারণ। যা আমাদের জানানো হয়েছে তা হলো দুই বৎসর তিনি গর্ভধারণ করেছিলেন। তারপর দেখা গেলো গর্ভে কোনো সন্তান নেই। একটি শক্ত মাংসপিণ্ড বেরিয়ে এসেছে তার পরিবর্তে। ব্যাসদেবের আদেশেই গর্ভচ্যুত মাংসপিণ্ডকে তিনি ঘৃতপূর্ণ শতসংখ্যক কুম্ভ প্রস্তুত করে কোনো গুপ্তস্থানে রেখে তাতে জলসেচন করতে লাগলেন। কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই সেইসব মাংপেশী শত খণ্ডে বিভক্ত হয়ে গেলো। তারপর সেইসব খণ্ড অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ হলে গান্ধারী সেই সকল খণ্ড পূর্বপ্রস্তুত কুম্ভগুলোর মধ্যে সুদৃঢ়রূপে স্থাপন করে অতি সাবধানে রক্ষা করতে লাগলেন। অবশেষে আরো দুই বৎসর গত হলে সেইসব কুম্ভ উদ্ঘাটন করে প্রথমে দুর্যোধন জন্মালেন। পরে আরো নিরানব্বইটি পুত্র জন্মালো। তার মানে এইসব মানব

সন্তানদের পৃথিবীতে পদার্পণ করতে মোট চার বৎসর লাগলো।

এ গল্পটি অবশ্যই কল্পনাজগতের বিশেষ একটি অবদান সন্দেহ নেই। এমন একটা ঘটনা কখনো কি প্রকৃতি ঘটাতে পারে? সমস্ত ব্যাপারটার মূল ভাষ্যটিই হলো যুধিষ্ঠিরকে যে কোনো প্রকারে জ্যেষ্ঠ দেখানো। শুধু তাই নয়, তার জন্য যদি ষড়যন্ত্র করে পাণ্ডু এবং মাদ্রীকে হত্যা করতে হয়, সেটা গোপন করতেও দ্বৈপায়নের চিন্তার প্রয়োজন হয় না। সততারও প্রয়োজন হয় না। যদিও আমরা পাঠকরা জানি তিনি একজন মহৎ, নিষ্কাম, নিরপেক্ষ, ব্রহ্মচারী, যে ব্রহ্মচর্যের মস্তকে পদাঘাত করে যে কোনো নারীর শয্যায় শায়িত হতে তিনি এক মুহূর্ত চিন্তা করেন না। পাণ্ডু বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রজ, কিন্তু বিদুর কোনোভাবেই কুরুবংশের সঙ্গে যুক্ত নন। একজন দাসীর পুত্র ব্যতীত তাঁর অন্য কোনো পরিচয় নেই। কিন্তু যুধিষ্ঠির বিদুরের পুত্র। এই যুধিষ্ঠিরকে শান্তনুর সিংহাসনে বসাতে হলে পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ হিশাবে পরিচিতি করাবার প্রয়োজন আছে। যে কারণে বিদুর রাজত্ব পাননি, যুধিষ্ঠির পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ না হলে সেই একই কারণে রাজত্বের অধিকারী হতে পারবেন না। সেজন্যই পাণ্ডুর ইহলীলা সম্বরণ করার প্রয়োজন ছিলো। তা যদি তিনি স্বাভাবিক উপায়ে না করেন সে ব্যবস্থাও বিদুর করবেন। কিন্তু সাক্ষী-প্রমাণ লুপ্ত করবার জন্য মাদ্রীকেও পৃথিবী থেকে মুছে না দিলে চলবে কেন? পতিবিয়োগে কুন্তী কাঁদেননি। কাঁদলেন, যখন সর্বসমক্ষে মৃতদেহ দুটি ভস্মে পরিণত হলো। এবং তিনি নির্দোষ বলে পরিগণিত হলেন। রচয়িতা আমাদের জানিয়ে দিলেন কুন্তীর ক্রন্দনে বনের পশুপাখিও ব্যথিত হয়ে পড়েছিলো। অথচ, অকস্মাৎ দু-দুজন মানুষ যখন মৃত্যুমুখে পতিত হলেন, স্বতঃই যখন মানুষের বক্ষ থেকে পাঁজরভাঙা ক্রন্দন উত্থিত হয়, তখন তিনি নিঃশব্দ। কেন? এই জিজ্ঞাসারও কি কোনো জবাব আমরা পেয়েছি?

ভীষ্মের অনুজ্ঞাক্রমে কুন্তীর পঞ্চপুত্র যখন পাণ্ডুপুত্র হিশাবেই গৃহীত হয়ে ভীষ্মেরই যত্নে রাজবাটীর ভোগ-উপভোগের দ্বারা পরম সুখে দুর্যোধনাদি ভ্রাতাদের সঙ্গে একই ভাবে বর্ধিত হতে লাগলেন, তখন কখনো শোনা যায়নি দুর্যোধন ঐ পাঁচটি আগন্তুকের সঙ্গে কোনো কলহে বৃত হয়েছেন। দোষ বার করার অনেক চেষ্টা করেও এই মিথ্যা উক্তিটি লিপিবদ্ধ করতে পারেননি রচয়িতা। কিন্তু ভীমের অসহ্য অকথ্য নিষ্ঠুর ব্যবহারে এবং তার অন্য চারটি ভ্রাতার সেই অমানবিক নিষ্ঠুরতার পৃষ্ঠপোষকতা দেখে দুর্যোধনাদিরা প্রকৃতই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। মহাভারতের একটি অংশের উল্লেখ করছি। ‘ধার্তরাষ্ট্ররা যখন আহ্লাদিত হয়ে খেলতো ভীম সততই ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি করে রক্ত বার করে দিতো, সজোরে মাটিতে ফেলে দিয়ে চুল ধরে টেনে এমন বেগে আকর্ষণ করতো যে তারা কেউ ক্ষতজানু ক্ষতমস্তক ক্ষতস্কন্ধ হয়ে আর্তস্বরে চিৎকার করতো। জলে সাঁতার কাটবার সময়ে জলে ডুবিয়ে প্রায় মৃতকল্প করে ছাড়তো। বৃক্ষে আরোহণ করলে গাছ নাড়িয়ে তাদের মাটিতে ফেলে দিতো।’

এই অদ্ভুত হিংস্র ব্যবহার একমাত্র কুরুভ্রাতাদের উপরেই করতো কিন্তু স্বীয় ভ্রাতাদের প্রতি নয়। যুধিষ্ঠির, অর্জন, নকুল, সহদেবের সঙ্গেও যদি ভীম এই একই খেলা খেলতো, তাহলে মনে হতো অতিকায় বলবান জীবের ন্যায় চেহারা ও চরিত্রের দরুণ এই খেলাই তার স্বাভাবিক। কিন্তু যখন কেবলমাত্র দুর্যোধনদের প্রতিই এরকম একটা শত্রুসুলভ অত্যাচার চালাতো, তখন মনে হতো এই পার্বত্য পুত্রকটিই এই রাজপ্রাসাদের আজন্ম অধিকারী, ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ-সহ গদি জবরদখল করে বসে আছেন। অতএব এভাবেই হোক, যেভাবেই হোক, তাদের উচ্ছিন্ন করাই একমাত্র উদ্দেশ্য। কে জানে কুন্তী এবং বিদুর তাদের কী বুঝিয়ে কী বলে নিয়ে এসেছেন এখানে। এদের প্রতিহিংসাপরায়ণ জিঘাংসা কখনো কখনো এমন ভয়াল মূর্তিতে প্রকাশিত হতো যেটা এই পুরীর, এই বংশের যে কোনো পুত্রের পক্ষেই একটা বিভীষিকা। এরা এখানকার কারো সঙ্গেই মেলামেশা করতো না, ভ্রাতা বলে জানতো কিনা তা-ও বোঝা যেতো না। তবে মানতো না, সেটা সত্য। পরন্তু, বিদুরের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সর্বদাই সম্ভবত ভাবতো, এই শত্রুনিধন কার্যের জন্যই তারা তাদের গিরিগুহা প্রস্রবণের স্বাধীন স্বচ্ছন্দ বিহার থেকে এখানে আগত হয়ে বন্দী হয়েছে। অন্তত জান্তব চরিত্র নিয়ে পর্বত-প্রমাণ মনুষ্যাকৃতি ভীম যে সেটাই ভাবতো তাতে কোনো সংশয় নেই। ভীমের চরিত্রও তার আকৃতির তুল্যই ভয়ংকর। সে ক্ষমা করতে জানে না, শত্রুকে ভোলে না, পরিহাসছলেও হাসে না; বক্রভাবে তাকায়, অস্পষ্টভাবে কথা বলে। সে উদ্ধত এবং বহুভোজী, তার চোখের রং পিঙ্গল, এবং মুখমণ্ডল

শ্মশ্রুবিহীন। আসলে পাহাড়ে-পর্বতে জলে-জঙ্গলে শৈশব-কৈশোর কাটিয়ে স্বভাবতই এই বালকেরা কিছুটা হিংস্র চরিত্র নিয়ে বেড়ে উঠেছে। তদ্ব্যতীত, পিতার মৃত্যুতে তারা বিন্দুমাত্র বিচলিত নয়। পিতার জন্য তারা কাঁদেনি, একবারও তাদের মুখ থেকে পিতার নাম উচ্চারিত হয়নি। পাণ্ডু যদি এদের পিতা হতেন, যদি জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই পাণ্ডুকে পিতা বলে জানতো এরা, তা হলে তাদের পিতৃশোক নিয়ে রচয়িতা একটা দুটো লাইন লিখেই কর্তব্য সম্পন্ন করতেন না। নকুল সহদেব যদি মাদ্রীর পুত্র হতো, তবে তাদের মাতৃশোকও মাত্রই সতেরো দিনে অবসিত হতো না। কুন্তী-বিদুর ব্যতীত বস্তুতই তারা পাণ্ডু-মাদ্রী নামের কোনো মানুষকে কখনো দেখেছে বলে মনে হয় না। কুন্তী-বিদুর নামে চেনা মানুষ দুটি তাদের খুব ভালো করে বুঝিয়ে এনেছেন, এবং অনবরত বোঝাচ্ছেন, এই সিংহাসনের অধিকারী তারা, সুতরাং দখল নিতে হলে ধার্তরাষ্ট্রদের সঙ্গে লড়াই ব্যতীত অন্য কোনো রাস্তা নেই। সে জন্যই ভীমের অত্যাচারের কোনো সীমা ছিলো না, এবং অন্য চারটি ভাইয়েরও এই অত্যাচার উপভোগের আনন্দ ছিলো অসীম। আক্রোশের বীজ বিদুর রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট করিয়েই এদের নিয়ে এসেছেন এখানে।

ভীমের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে দুর্যোধন শেষে এই প্রাত্যহিক যন্ত্রণার হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য ভীমের মিষ্টান্নে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে লতাপাতা দিয়ে হাত পা বেঁধে জলের ধারে ফেলে রেখে এলো। হিংসার পরিবর্তে এই তাদের প্রথম প্রতিহিংসা। নচেৎ তারা এই অপরিচিত আগন্তুকদের সঙ্গে অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়েই ক্রীড়া করতো। ভীমের নিষ্ঠুর ব্যবহার যখন অসহ্য হয়ে উঠলো তখন তাকে রোধ করার কৌশল বার না করলে তারা থাকতোই বা কী করে? অন্য চারজন, যুধিষ্ঠির, অর্জুন, নকুল, সহদেব, এরাও তো ভীমের এই অত্যাচার দেখে যথেষ্ট আমোদিত হচ্ছেন। সর্বজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির তো অন্তত তার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে এই ব্যবহার থেকে বিরত করতে পারতো? মহাভারতে ভীমের দেহ এবং শক্তি বিষয়ে যে বর্ণনা আছে তার সঙ্গে একমাত্র একটা হাতির তুলনা হতে পারে। অবশ্য হাতিও বোধহয় তার কাছে বালকমাত্র। ভীম ইচ্ছে করলে একটা বিরাট বৃক্ষকেও উপড়ে তুলে ফেলতে পারে। সে যখন হাঁটে তখন তার জঙ্ঘাপবনে সারা জঙ্গল কম্পিত হতে থাকে। এর সঙ্গে শক্তিতে পাল্লা দিতে যে কোনো মনুষ্যসন্তানই অক্ষম। তদ্ব্যতীত, ধার্তরাষ্ট্ররা রাজপুত্র, জন্মাবধি সুখে-সম্পদে লালিত পালিত। নিয়মবন্ধনে যুদ্ধ হলে তারা বীরত্ব দেখাতে সক্ষম, কিন্তু এই সব অশিক্ষিত পটুতা তাদের নেই। পরবর্তী জীবনে এর প্রমাণ দুর্যোধন দিয়েছেন। গদাযুদ্ধে ভীম সর্বদাই দুর্যোধনের নিকট পরাজিত হতো। বস্তুত, প্রাকৃতজনের মতো অভব্য মারামারিতে কী করে জয়ী হবে একজন সুখে-লালিত গৃহরক্ষিত শিক্ষিত সন্তান? এরা কেউ শিশু নয়, বালকও নয়, বলা যায় কৈশোরও প্রায় উত্তীর্ণ। রীতিমতো যৌবনের চৌকাঠে পা দিতে চলেছে। এই ধরনের খেলার বয়স তাদের ফুরিয়ে গেছে। দুর্যোধন দুঃশাসন ইত্যাদি ভ্রাতারা এদের শত্রুপক্ষ ব্যতীত আর অন্য কী

ভাবতে পারে? তারা নিজেরাই তো পাঁচটি ভ্রাতা নিজেদের পৃথক করে রেখেছে দুর্যোধনদের থেকে। এই যে আক্রমণটা ভীম করে আর অন্য চারটি ভ্রাতা উপভোগ করে, সেখানেই তো একটা মোটা দাগ পড়ে গেলো দুই পক্ষের মাঝখানে। সেই দাগটাকে আরো মোটা করলেন বিদুর। তিনি বলে বেড়ালেন দুর্যোধনের মতো ক্রূর পাপাচারী ও ঐশ্বর্যলুব্ধ পাপাত্মা ভীমসেনের অপরিমিত পরাক্রম দর্শনে অতিশয় উদ্বিগ্ন হয়েছে। বৃকোদরের শৌর্য দেখে ভেবেছে ভীমকে বধ করতে পারলেই অর্জুন আর যুধিষ্ঠিরকে আয়ত্তে আনা সম্ভব হবে। প্রকৃতই অল্প বয়সের অপরিণত বুদ্ধিতে আপদ বিদায়ের এটাই তিনি মোক্ষম অস্ত্র বলে মনে করেছিলেন। এর মধ্যে রাজ্যপ্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির কোনো কূট কৌশল ছিলো কি ছিলো না এসব বিবেচনা বিদুরের নিকট নিরর্থক। যে ছিদ্র তিনি অজস্রবার অন্বেষণ করে করে হতাশ হয়েছেন, পেয়ে গেলেন সেটা। বিদ্যুৎ বেগে বেরিয়ে পড়লেন প্রচার কর্মে। রটনা করে বেড়ালেন, দুরাত্মা দুর্যোধন (বেচারা দুর্যোধন যে কী করে এই দুরাত্মা আখ্যাটি পেলেন, তার কিন্তু কোনো কারণ এখনো পাওয়া যায়নি) যুধিষ্ঠিরকে রাজত্বের অধিকার দেবার ভয়ে ভীমকে বিষ ভক্ষণ করিয়েছে।

ছেলেদের দেখার ভার সম্ভবত তখন বিদুরের হস্তে অর্পিত। ভীষ্মকে তিনি কেবলমাত্র ধৃতরাষ্ট্রের জীবন থেকেই উচ্ছিন্ন করেননি, ছেলেদের থেকেও করেছেন। নিরপেক্ষ এই ব্যক্তিটির নিকট এই পঞ্চপুত্রকে বেশিদিন ছেড়ে রাখা তাঁর নিরাপদ মনে হয়নি। দুর্যোধনদের অকীর্তির সংবাদ ধৃতরাষ্ট্র এবং ভীষ্ম দুজনেরই শ্রুতিগোচর করা হলো। তাঁরা বিশ্বাস করলেন। দুঃখিত হলেন। বিদুর সকলের নিকটই ধর্মের ধ্বজা। বিদুরের সেই ছদ্মবেশ সকলের কাছেই অভ্রান্ত। কিন্তু এই প্রশ্নটা কেউ তোলেননি, দুর্যোধনের প্রতিপক্ষ তো ভীম নয়, যুধিষ্ঠির। যুধিষ্ঠিরকে মারবার চেষ্টা না করে, ভীমকে করা হলো কেন?

দ্বৈপায়ন পুনরায় একটি চমৎকার গল্প উপহার দিলেন পাঠকদের। বিষ খেয়েও ভীম না মরে যখন লম্বা একটি নিদ্রা সেরে, জৃম্ভণ তুলে, হস্তপদদ্বয়ের বন্ধন ছিন্ন করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন বিদুরের পিতা রচনা করলেন আর এক রূপকথা। ভীম বিষ খেয়ে জলমগ্ন হয়ে একেবারে নাগলোকে পৌঁছে গিয়েছিলেন। সেখানে বিষধর সর্পকুল তাকে ভীষণভাবে দংশন করায় সেই সাপের বিষেই ভীমের শরীরের বিষক্রিয়া তিরোহিত হয়। আর নাগরাজ বাসুকি ভীমকে কুন্তিভোজের দৌহিত্র বলে চিনতে পেরেই প্রীতিপ্রসন্ন চিত্তে আদর সমাদর করে প্রভূত ধন-রত্ন তো দিলেনই, আবার অমৃতও খাইয়ে দিলেন। তখন ভীম জলের তলা থেকে উঠে বাড়ি ফিরে এলো।

কী আশ্চর্য! ভীমেরা সব এতো পুণ্যবান যে তারা জলেও ডোবে না, বিষেও মরে না। মাত্রই পনেরো-ষোলো বছর বয়সের একটি কিশোরের এই বালকোচিত প্রতিহিংসা নিয়ে বিদুর এমন ষড়যন্ত্র পাকাতে বসলেন কুন্তীর সঙ্গে যেন একটা খুন হয়েছে। এবং সত্যি সত্যি দুটি প্রকৃত

খুনী স্ত্রী-পুরুষ যুধিষ্ঠিরকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে কী বললেন, কী চক্রান্ত করলেন, আখেরে দেখা গেলো যুধিষ্ঠিরের চলাফেরা, কথা বলা, সব কিছুই বিদুরের নির্দেশে চলছে। ঝগড়া হলো ভীমের সঙ্গে, সাবধান করলেন যুধিষ্ঠিরকে। যা ঘটাতে চান, যা রটাতে চান, সমগ্র নগরের ঘরে ঘরে তা জানিয়ে দিলেন। রাজপুরীর সদস্যদেরও জানাতে বাকি রাখলেন না।

বিদুরের পিতা রচনার দ্বারা জানিয়েছেন বিদুর হচ্ছেন স্বয়ং ধর্ম। সামান্য অপকর্মের ফলে মর্ত্যভূমিতে জন্ম নিয়েছেন। আর দুর্যোধন ধর্মহীন অসূয়াপ্রমত্ত এক অতিপাপাত্মা মানব। উল্টোদিকে, বিদুর আর দ্বৈপায়নের দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে মহাত্মা প্রতিপন্ন করার চেষ্টাও নিয়ত চলতে লাগলো, কারণ দুর্যোধনই যুধিষ্ঠিরের প্রধান প্রতিযোগী, তার শিক্ষ-দীক্ষা ভীষ্মের প্রতিফলনে সমৃদ্ধ। দুর্যোধনকে বিদুর অবিশ্রান্ত অবিরাম শাপশাপান্ত করছেন, প্রচার চালাতে চালাতে রাজ্যবাসীদের মনে বিষ ধরিয়ে দিচ্ছেন, যার ফলে সহস্র সহস্র বছর পেরিয়ে আজও মানুষের মন থেকে সেই ভ্রান্ত বিশ্বাস উৎপাটিত নয়। ভাগ্যের করুণা যে কখন কার ওপর বর্ষিত হয় বোঝা দায়। কপটতার মুখোশ পরে জনগণকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানাতে সব পলিটিশিয়ানই পটু। বিদুর এক শীর্ষস্থানীয় রাজনীতিক, ক্ষমতালোভী চতুর মহামন্ত্রী।

একটা সময়ে বিদুরের মনে হলো ভীষ্মই হবেন তাঁর স্বার্থসিদ্ধির প্রধান অন্তরায়। অবশ্য এই চিন্তা বিদুরের নতুন নয়। স্বীয় পুত্র যুধিষ্ঠির এবং অন্য চারটি তরুণকে নিয়ে (অর্থাৎ যে চারটি তরুণ সর্বকর্মে যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করবে) যখনই কুন্তী রাজবাটীতে প্রবিষ্ট হলেন, সেই থেকেই শুরু। কেবলমাত্র ভীষ্মই নন, নিজের পিতামহী সত্যবতীর অবস্থানও তখন তাঁর খুব ভালো লাগছিলো না। কেবলই মনে হচ্ছিলো, যে কার্যের জন্য বিদুর এখন অতিমাত্রায় উৎসুক, সে অভিপ্রায়ে সত্যবতীও হয়তো অন্তরায় হবেন। তার কারণ, জন্মসূত্রে সত্যবতী তাঁর অবৈধ পুত্র দ্বৈপায়নকে এনে এই বংশের সমস্ত রক্ত ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিয়েছেন, তাঁকে মানুষ করেছেন বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রজদের সঙ্গে, রাজা শান্তনুর একমাত্র পুত্র দেবব্রত ব্যতীত একটি আর্য সন্তানকেও তিনি তাঁর সংকল্পের সংসারে ঢুকতে দেননি, তথাপি বিদুর যে দাসীপুত্র সেটা তিনি বিস্মৃত হবেন না। কূট বুদ্ধির স্বচ্ছ দর্পণে বিদুর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন রাজত্বের কুঞ্চিকাগুচ্ছ এখন থেকে সত্যবতীর হস্তগত না থাকলেই তাঁর অসাধ্য সাধনের সাধ একদিন পূর্ণ হতে পারে। নচেৎ, কুরুকুলের সিংহাসন বিদুরকুলের হস্তগত হওয়ার পথে বাধা আসা সম্ভব।

কিন্তু সত্যবতীকে বনগমনে পাঠাবেন এবং ভীষ্মকে মাত্রই একজন বৃদ্ধ রাজকর্মচারীতে পরিণত করবেন, তেমন ক্ষমতা বিদুরের নেই। যাঁর আছে তাঁর নাম দ্বৈপায়ন। এতদ্ব্যতীত, ঘুড়ির সুতো এখন আকাশে উড্ডীন, এবার লাটাইটা হাতে পাওয়া প্রয়োজন। যতোদিন সত্যবতী স্বেচ্ছায় বনগমনে না যাবেন, সেই লাটাই তিনি হস্তান্তরিত করবেন এমন আশা দুরাশা মাত্র।

সেটা যাঁর হস্তে দিতে পারেন, অথবা দিতে হয়তো উৎসুকই, তিনি তাঁর অবৈধ পুত্র দ্বৈপায়ন। অতএব সংবাদটি অচিরেই দ্বৈপায়নের শ্রবণে গিয়ে পৌঁছলো, এবং দ্বৈপায়নও অচিরেই এসে পৌঁছলেন। মাতাকে বললেন, 'সময় অতিশয় দারুণ হয়ে উঠেছে, কুরুদের দুর্নীতিপ্রযুক্ত রাজশ্রী তাদের পরিত্যাগ করবেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এরা সবংশে কৃতান্তসদনে গমন করবে। এসব দেখার পরিবর্তে বনে গমন করে যোগানুষ্ঠানে যত্ন করুন।'

প্রকৃত পক্ষে সত্যবতীর সংসারে থাকার আর কোনোই যুক্তি ছিলো না। যা তিনি করতে চাইছিলেন, সে কার্য সম্পন্ন করেছেন। এই প্রাসাদের পুত্র পৌত্র সবই এখন তৈরি হয়েছে তাঁর অবৈধ পুত্রের দ্বারা। তাঁর সাফল্যের যান এখন স্টেশন ছাড়িয়ে, হুইসিল বাজিয়ে, অতি দ্রুত চলমান। তথাপি তিনি যে পুত্র এসে বলবার পূর্বেই সংসার পরিত্যাগ করেননি, তার কী কারণ থাকতে পারে? স্বামী হারিয়েছেন, পুত্রদ্বয় হারিয়েছেন, পৌত্রকেও হারাতে হলো। সংসার তবে তাঁকে কার টানে ধরে রেখেছিলো? কে সে? এতগুলো মৃত্যুশোক সহ্য করেও সত্যবতী যে সংসার ছাড়তে পারেননি, তার কারণ কি তবে দেবব্রত? যাঁর সান্নিধ্য তাঁকে সেই অপরিমিত শোকেও সান্ত্বনা জুগিয়েছে, তাঁর প্রতি যাঁর আনুগত্যের কোনো সীমা ছিলো না? যখন তাঁর গর্ভজাত অবৈধ পুত্র তাঁকে বনগমনে যেতে বাধ্য করলেন, তখন কি তাঁর সপত্নীপুত্রের জীবন থেকে এবং রাজ্যের নিশ্চল প্রতিষ্ঠা থেকে উচ্ছিন্ন হতে বেদনায় বক্ষ বিদীর্ণ হয়েছিলো? পতির মৃত্যুর পরেও, সারাজীবন ধরে যাঁর আনুকূল্যে এতো সুখ, এতো মর্যাদা, এতো সমৃদ্ধি, স্বাধীনতা, স্বেচ্ছাচারিতা, সেই শতপুত্র অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, মহারাজা শান্তনুর কুলপ্রদীপ, নিখিলশাস্ত্রবিশারদ সত্যব্রত দেবব্রত, সেই জিতেন্দ্রিয় গাঙ্গেয়পুত্র বিরহিত জীবনকে শান্তভাবে মেনে নিতে তাঁর মন কি বিদ্রোহ করেছিলো? অনন্যকর্মা হয়ে যে সপত্নীপুত্র তাঁর পুত্রদের পৌত্রদের সকলকে সমভাবে প্রতিপালন করেছেন, দারপরিগ্রহে পরাঙ্মুখ পিতৃহিতৈষী হয়ে আমৃত্যু ব্রহ্মচর্য বরণ করে সত্যবতীর দাসানুদাস হয়ে আছেন, যাঁর দাক্ষিণ্যে দ্বৈপায়ন এই আর্যপুরীতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছেন, স্বীয় পুত্রের একটি ইঙ্গিতেই ঘর ছেড়ে বনগমনে যেতে যেতে, দীর্ঘশ্বাস মোচন করে, কাষায়বস্ত্রে অশ্রু মার্জনা করে, একবার কি তিনি ফিরে তাকিয়েছিলেন তাঁর দিকেই? এতদ্ব্যতীত, অম্বিকার পৌত্রের দৌরাত্ম্যের কথা তিনি তো এর পূর্বে কিছু শোনেননি? ভীষ্মও তো কিছুই বলেননি। তবে দ্বৈপায়ন কার কাছে শুনে অতি দ্রুত এসে অতি দ্রুতই চলে গেলেন? সেই সঙ্গে সত্যবতীকেও পুত্রবধূদ্বয় সহ যেতে হলো বনগমনে।

এখন সত্যবতীর যেমন বয়স হয়েছে, ভীষ্মের তেমনি বয়স বেড়েছে। তাঁর আর্যসুলভ স্বর্ণাভ কেশদাম এখন শ্বেত শুভ্র। মধুর মতো পিঙ্গলবর্ণ তাঁর ত্বক অনেক ঋতুর স্বাক্ষরে রেখাঙ্কিত। এতোদিনে তিনি বিশ্রাম নিলেন তাঁর রাজকার্য থেকে। এতোদিনে তিনি প্রকৃতই পরিণত হলেন

মাত্র একজন রাজকর্মচারীতে। বিদুর যা চেয়েছিলেন তাই সর্বতোভাবে পূর্ণ হলো। এবং খুব অল্পদিনের মধ্যেই সংবাদ পাওয়া গেলো সত্যবতী ইহলীলা সংবরণ করেছেন। বৃদ্ধ রাজকর্মচারী পিতামহ ভীষ্ম হয়তো ভাবলেন, কাল কী ভয়ানক বস্তু! পণ্ডিতেরা বলেন, সূর্যের আগুনে দিবারাত্রির ইন্ধনে মাস ও ঋতুর হাতা দিয়ে নেড়ে নেড়ে কাল মহামোহময় কটাহে প্রাণীবৃন্দকে রন্ধন করছে। প্রত্যহ প্রাণীগণের মৃত্যু হচ্ছে তবু মানুষ চিরকাল বাঁচতে চায়। এর চেয়ে আশ্চর্য আর কী আছে? কিন্তু তিনি এখনো বেঁচে আছেন। এখনো তিনি কালের কবলে পতিত হননি। অথচ বক্ষস্থলে শুধুই শূন্যতার হাহাকার।

আসলে পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পরিচয় দিয়ে সাক্ষী-প্রমাণহীন পরিস্থিতিতে পাঁচটি বড়ো বড়ো পাহাড়ি পুত্রকে নিয়ে কুন্তী যেদিন পুনরায় কুরুরাজ্যে প্রত্যাবৃত হলেন, সেদিন থেকেই সেখানে শনির প্রবেশ ঘটলো। কুরুকুলে আশ্রিত পালিত বিদুর নামের গোয়েন্দাটি, বিশেষভাবে দুর্যোধনের সঙ্গে এমন পর্যাপ্ত প্রতিকূল ব্যবহারে লিপ্ত হলেন যার কোনো সীমা রইলো না। বৈরানল তখনই প্রজ্বলিত হলো। দুর্যোধনের অত্যাচারে নয়, বিদুরের কুচক্রে।

প্রত্যয় হয়, কুমারীকাল থেকেই কুন্তীর নৈতিক চরিত্র খুব শুদ্ধ ছিলো না। প্রাক-বিবাহ কালে তিনি যখন সূর্যের সঙ্গে সংগত হয়ে কর্ণের জন্ম দেন (এই সূর্য নিশ্চয়ই আকাশের সূর্য নয়, কুন্তীরই কোনো ভালোবাসার আর্য যুবক) তখন কুন্তী গোপনে নিভৃত কক্ষে তথাকথিত সূর্যকে অবশ্যই একদিন সময় ও সুযোগ মতো আহ্বান করে এনেছিলেন। নির্জন কক্ষে সূর্য তাঁকে আত্মদান করতে বলেন। কুন্তী ভয় পান। কুমারী অবস্থায় যদি সন্তানসম্ভবা হন তখন পিতামাতা ও সমাজকে কী কৈফিয়ৎ দেবেন? সূর্য নিবৃত্ত হন না। তাঁর চরিত্র বিষয়েও কটাক্ষ করেন। অতঃপর কুন্তী তাঁর সঙ্গে সংগত হন এবং গর্ভধারণ করেন। গর্ভাবস্থায় সর্বদাই খুব সংবৃতভাবে থাকতেন, কেউ বুঝতে পারতো না। কেবল তার এক ধাত্রীর সম্যক জ্ঞান ছিলো। যথা সময়ে তিনি অত্যন্ত রূপবান একটি পুত্র লাভ করেন। কুন্তী সেই ধাত্রীর সঙ্গে মন্ত্রণা করে, মোম দিয়ে ঢাকা অতি বিস্তীর্ণ ও আচ্ছাদন সম্পন্ন একটি পেটিকার মধ্যে রক্ষিত করে সেই পুত্রকে অশ্বনদীতে নিক্ষেপ করেন। বিভিন্ন চেহারার অন্য পুত্রদেরও কুলের ঠিকানা অজ্ঞাত বলেই স্বর্গের দেবতাদের পিতা হিশেবে মর্ত্যে নামিয়ে আনতে হয়েছিলো। ধারণা হয়, যে দুটি সন্তানকে তিনি মাদ্রীর সন্তান বলে পরিচয় দিচ্ছেন, সে দুটিও তাঁর। সেদিক থেকে তাঁকে স্বৈরিণী আখ্যা দিলেও মিথ্যে বলা হয় না। প্রকৃত পক্ষে, তিনি অনেক পুরুষের সঙ্গেই সংগত হয়ে তাঁর সম্ভোগস্পৃহা নিবৃত্ত করেছেন। অবশ্য কথিত আছে কুন্তীর সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে এক মুনি তাকে বর দিয়েছিলেন, কুন্তী ইচ্ছা করলেই যে দেবতাকে স্মরণ করবেন তিনি আসবেন। সম্ভবত কুন্তীর বহুগামিতা ঢাকতেই এ বরদানের গল্পটি তৈরি হয়েছিলো।

বল্কলধারী যে পাঁচটি সন্তান নিয়ে এসে কুন্তী রাজপুরীতে প্রবিষ্ট হলেন এঁরা কার দ্বারা জাত তা-ও আমরা যেমন জানি না, প্রকৃত পক্ষে পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ কিনা তা-ও আমরা জানি না। এ-ও বিশ্বাস করা সম্ভব নয় যে, কোনো পশু পাণ্ডুকে অভিশাপ দিয়েছিলো বলেই স্বীয় পত্নীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে সংগত হতে গেলেই তাঁকে মৃত্যুর কোলে অবসিত হতে হবে। এসব অপ্রাকৃত গল্প নেহাৎই গল্প। সত্যের সঙ্গে এর কোনো সংশ্রব নেই। এটুকুই সত্য যে পাণ্ডু অক্ষম ছিলেন।

যে বালক ক'টি কুরুকুলের ভ্রাতা সেজে এলো, তার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো যুধিষ্ঠির। কুন্তী বললেন, পাণ্ডু তাঁকে বলেছিলেন, ক্ষেত্র বিশেষে কানীন পুত্র, অর্থাৎ পত্নীর কুমারী জীবনেরও যদি কোনো পুত্র বর্তমান থাকে সেই পুত্রও প্রয়োজনে পতির পুত্র হিশেবেই গ্রহণযোগ্য হয়। কুন্তীর ভাষ্য, পাণ্ডু পুত্রাকাঙ্ক্ষী হয়েছিলেন। কুন্তীর তো কুমারী কালের পুত্র কর্ণ বর্তমানই ছিলেন এবং কুন্তী এ-ও জানতেন কর্ণ কার ঘরে কোন পিতামাতার নিকট প্রতিপালিত হচ্ছেন। সে কথা পাণ্ডুর কাছে বললেন না কেন? কেন গোপন করলেন? বিদুরের সঙ্গে সংগত হয়ে যে তিনি আরো একটি অবৈধ সন্তানের জননী হয়েছেন, নিশ্চয়ই সেই সত্য প্রকাশিত হয়ে যাবার ভয়ে। তদ্ব্যতীত, কর্ণকে প্রকাশিত করলে কর্ণই হবেন জ্যেষ্ঠ। বিদুরের রাজার পিতা হবার সাধ তাহলে সমূলেই বিনষ্ট হয়ে যায়। সেটা কি বিদুরের মতো মানুষ নিঃশব্দে মেনে নেবেন? কখনোই না।

অনুমান হয় যুধিষ্ঠির সহ অন্য পুত্ররা এমন কোনো গোপনীয় স্থানে বর্ধিত হচ্ছিলেন যা বিদুর খুব ভালোভাবেই চিনতেন। তারপরে এমন একটা সময় এলো যখন বিদুর দেখলেন এখনই যুধিষ্ঠিরকে প্রকাশ না করলে দুর্যোধনই রাজা হয়ে বসবেন। অথচ পাণ্ডু যতোদিন জীবিত আছেন বিদুর যে পাণ্ডুপত্নীর সঙ্গে গোপন প্রণয়ে আসক্ত হয়ে সন্তান উৎপাদন করেছেন সে কথা প্রকাশ করতে পারেন না। পুত্রদের পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ হিশেবেই তো প্রকাশ করতে হবে। অথচ পাণ্ডু মৃত না হলে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হবে কী করে?

মহারাজা পাণ্ডুর মৃত্যুর কারণ হিশেবে যা বলা হয়েছে সেটা একটা অবিশ্বাস্য রূপকথা মাত্র। বাস্তব সত্য হিশেবে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে এ ইতিহাস, অর্থাৎ এই অতি প্রাচীন ইতিহাস, অনেক স্থলেই রূপকথার সহযোগে সম্পাদিত সেখানে স্বর্গবাসী দেবতারা অনায়াসে মর্ত্যে আগমন করেন, মর্ত্যের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করেন। মনুষ্যের জন্মের জন্য কেবলমাত্র নারীগর্ভই একমাত্র আধার নয়। মানুষ মাছের পেটেও জন্মাতে পারে, কলসীকেও জরায়ু হিশেবে ধরা যেতে পারে, আবার ঝোপেও শুক্র পতন হলে তা থেকে মানুষ জন্মায়। এইসব অপ্রাকৃত ঘটনা বাদ দিয়ে বাস্তবানুগ আসল অংশটা নিয়েই আমাদের ভাবনাচিন্তা, বিশ্লেষণ। সে দিক থেকে বিচার করলে, পাণ্ডু-মাদ্রীর আকস্মিক মৃত্যু অবশ্যই রহস্যময়। তবু ধরা যাক, যেভাবেই হোক, পাণ্ডু অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। কিন্তু মাদ্রী? মাদ্রীর কীভাবে মৃত্যু হলো? মানুষ তো ইচ্ছে করলেই মরে যেতে পারে না? তারও একটা কারণ থাকা প্রয়োজন। তাছাড়া, মহাভারতের সময়ে সহমরণের প্রচলন আদৌ ছিলো না।

কুন্তী বলছেন, পতির মৃত্যুতে মাদ্রী যখন আর্তনাদ করে উঠেছিলেন, সেই আর্তনাদ শুনে কুন্তী রোদন করতে করতে সেখানে গেলেন। কেন? মাদ্রীর আর্তনাদ শুনেই কি তিনি বুঝে ফেললেন যে পাণ্ডুর মৃত্যু হয়েছে? নচেৎ তিনি রোদন করতে করতে যাবেন কেন? কুন্তী নিজে তখন

কোথায় ছিলেন? এই আর্তনাদেরই প্রতীক্ষা করছিলেন কি? ক্ষণকাল পুর্বে যে সুস্থ সবল স্বামী বেড়াতে বেরিয়েছেন, তাঁর মৃত্যু ঘটেছে, একথা অবশ্যই কুন্তীর মনে আসা সম্ভব নয়। মানুষ অনেক কারণেই আর্তনাদ করে উঠতে পারে। পাহাড়ে পর্বতে জঙ্গলে আর্তনাদ করে ওঠার মতো অনেক ভয়াবহ ঘটনার সম্মুখীন হওয়া বিচিত্র নয়। 'কী হলো, কী হলো' বলে অবশ্যই তিনি চেঁচিয়ে উঠে ছুটে যেতে পারেন। মাদ্রীকে নিয়ে পাণ্ডু তো তখন বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, বাসস্থানের অতি নিকটে না থাকাটাই স্বাভাবিক। যখন সেই আর্তনাদ শুনে রোদন করতে করতে কুন্তী ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছোলেন তৎক্ষণাৎ দুজনের আর্তনাদই থেমে গেলো। থামলো কেন? পাণ্ডু তো তাঁরও স্বামী। মাদ্রীর মতো তাঁর কণ্ঠেও তো সেই শোক আরো বেশি তীব্র হয়ে উত্থিত হবার কথা। তবে তিনি যাওয়া মাত্রই সব স্তব্ধ হয়ে গেলো কেন? তিনি তো প্রতিবেশী নন যে সান্ত্বনা দিয়ে চুপ করাবেন মাদ্রীকে। আর নিজেও চুপ করে থাকবেন। যদিও কুন্তী বলছেন, তিনি অনেকক্ষণ বিলাপ করেছেন। সেই বিলাপ এই কারণে, পতির সঙ্গে তিনিও মৃত্যুবরণ করতে চেয়েছিলেন, কেননা তিনি জ্যেষ্ঠা। মাদ্রী বললেন, কামভোগে অতৃপ্তিবশত তিনিই পতির অনুসরণ করবেন। কুন্তীর ব্যাখ্যায় মনে হচ্ছে, মানুষটি যে চলে গেলেন তাঁর জন্য কারো কোনো বেদনা নেই। কুন্তী জ্যেষ্ঠা হিশেবে অনুসরণ করতে চাইলেন, আর মাদ্রী কামভোগে অতৃপ্ত থাকায় অনুসরণ করতে চাইলেন। এই সময়ে চোখের জলে ডুবে না থেকে, দুজনেই কান্নাকাটি করে অধীর হয়ে লোকজন যোগাড় না করে, শান্ত মনে এই তর্ক কি স্বাভাবিক? মৃতদেহটাও তো সরাতে হবে সেখান থেকে? পুত্র ব্যতীত আর কে সেই পাহাড়ি অরণ্যের স্বল্প জননিবাসে গিয়ে ডেকে আনবে লোকজন? কিন্তু কুন্তী বলছেন, সেখানে ছেলেদের তিনি যেতে দেননি। ছেলেদেরও না, অন্য কোনো প্রাণীকেও নয়। সম্ভবত যে একজন প্রাণী প্রকৃতই কোনো গুপ্ত ষড়যন্ত্রের সাক্ষী হয়েছিলেন তিনি মাদ্রী। তাই মাদ্রীকেও মুছে দিতে হলো এই চিত্র থেকে।

কুন্তী বলেছেন তাঁদের তর্কের শেষ সিদ্ধান্তে মাদ্রীই সহমরণে গেলেন। তারপর মাদ্রী ও পাণ্ডুর সতেরো দিনের গলিত শব নিয়ে পঞ্চপুত্রসহ কুন্তী হস্তিনাপুরে এলেন। মাদ্রী যে সহমরণে অন্তত যাননি সেটা দুটি মৃতদেহ এখানে এসে সৎকৃত হওয়াতেই প্রমাণিত হলো। পতির চিতার অনলে জীবিত অবস্থায় ঝাঁপ দেওয়াকে সহমরণ বলে। তবে মাদ্রী কীভাবে মৃত হলেন? হয় তাকে আত্মহত্যা করতে হয়, নতুবা কারো হস্তে নিহত হতে হয়। এই দুটি মানুষের মৃত্যুই এমন অবিশ্বাস্যভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে যে প্রত্যয় হয় এই মৃত্যু কোনো ষড়যন্ত্রের দ্বারাই সংঘটিত। যাদের দ্বারা এই ষড়যন্ত্র সাধিত হয়েছিলো মাদ্রী তাদের চিনতেন। সেজন্য মাদ্রীকে নিহত হতে হলো। কুন্তী যে কুন্তী ব্যতীত কোনো দ্বিতীয় প্রাণীকে সেখানে উপস্থিত হতে দেননি তার কারণ সেটা অত্যন্ত গোপনে এবং নিঃশব্দে সাঙ্গ করার প্রয়োজন ছিলো। যিনি এইমাত্র ছিলেন এইমাত্র নেই, এই হঠাৎ-মৃত্যু এমন একটা অবিশ্বাস্য এবং সাংঘাতিক ঘটনা যে কুন্তীর

পক্ষেও সেটা সহ্য করা সম্ভব ছিলো না। পাণ্ডুর মৃত্যুতে মাদ্রী যে ভাবে আর্তনাদ করে উঠেছিলেন, কুন্তীর কণ্ঠ থেকেও সেই আর্তনাদই বেরিয়ে আসা স্বাভাবিক ছিলো। কিন্তু ছুটে গিয়ে কুন্তী নিজেও আর্তনাদ করলেন না, মাদ্রীর আর্তনাদও স্তব্ধ করে দিলেন। আর যারা পিতৃহীন হলো, তাদেরও কান্নার অবকাশ হলো না। কেননা কুন্তী তাদেরও সেখানে যেতে দেননি। ঐ স্বজন বিরহিত পর্বতশৃঙ্গে যার পাঁচ-পাঁচটি কিশোর পুত্র বর্তমান, তাদের কাছেও কি এই মৃত্যু গোপন রাখা প্রয়োজন ছিলো? কেন ছিলো? তারাও সেই ঘাতকটিকে চিনতো বলে? অথবা তারা আদৌ পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ ছিলো না, অন্যত্র বর্ধিত হচ্ছিলো কুন্তী আর বিদুরের ছায়ায়? যুধিষ্ঠিরের বয়স ষোলো, ভীম পনেরো, অর্জুন চোদ্দো, নকুল সহদেব তেরো। এরা কেউই কি নির্বোধ শিশু ছিলো যে পিতামাতার এই মৃত্যু দেখে ভয় ব্যতীত আর কিছু অনুভূতি হবে না? এই পুত্রদেরই তো এই মহাসংকটে মহাসহায় স্বাভাবিক ছিলো। ক্ষেত্রজ হলে সেখানে ছুটে যাবার অধিকারও আছে তাদের। তবে এই গোপনতা কেন?

এখন দেখা যাচ্ছে সমস্ত ঘটনাটাই 'কেন' কণ্টকিত। যেমন, পতির এই আকস্মিক মৃত্যুতে কেন কুন্তীর কণ্ঠে ক্রন্দনের রোল উত্থিত হলো না? কেন দুজন মানুষের মৃত্যু সে এভাবে চাপা দিয়ে নিঃশব্দ রইলো? কেন এই মৃত্যুকে একান্তভাবেই সাক্ষীহীন রাখলো? কেন সাক্ষীহীন রাখবার জন্য মাদ্রীকেও মুছে দিলো এই পৃথিবী নামের গ্রহ থেকে? এতোগুলো 'কেন'র কোনো জবাব দেননি ব্যাসদেব। 'যার যা ইচ্ছা ভেবে নাও', অথবা 'মেনে নাও' এভাবেই রচিত হয়েছে সমস্ত ঘটনাটা। অতএব কুন্তী ব্যতীত আর যারা সাক্ষী রইলো, তারা পর্বতশৃঙ্গের নিঃশব্দ নির্জন নিবিড় অরণ্য, আর মাথার উপরে অনন্ত নীল মহাকাশ। আরো একটা প্রশ্ন: যেই মাত্র ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র হলো, তক্ষুনি কি পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ নেওয়া আবশ্যক হলো? তার আগেও নয়, পরেও নয়? ক্ষেত্রজ নিলেও সেটা এতোদিন গোপন রাখবার কী প্রয়োজন ছিলো? পাণ্ডু অবশ্যই নির্বাসনে যাননি, বাড়ির সঙ্গে সংশ্রবচ্যুতও ছিলেন না, তথাপি এটা পাণ্ডু-মাদ্রীর মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত গোপন রইলো কেন?

দুর্যোধন বিদুরের কাছে সততই দুরাত্মা, তথাপি কেন দুরাত্মা তার কোনো প্রমাণ তখনো তিনি দিয়ে উঠতে পারেননি। কিন্তু প্রচারে তো কোনো প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন শুধু অনৃতভাষণের। দুর্যোধনকে যে কোনো প্রকারে নিষ্পিষ্ট করার প্রয়োজন ছিলো বিদুরের। এ বিষয়ে তাঁর একাগ্রতারও অভাব ছিলো না।

এই পাঁচটি পার্বত্য পুত্র জানে কুরুবংশীয় বিপক্ষীয় মানুষগুলোকে যে ভাবে হোক, পাপপুণ্যের প্রশ্ন দূরে সরিয়ে, সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করে, সর্বস্ব গ্রাস করাই তাদের একমাত্র কর্তব্য। এই প্রাসাদের এই মানুষগুলোর প্রতি তাদের কোনো আত্মীয়তাবোধও যেমন নেই, ভ্রাতৃত্ববোধ ততোধিক দূরে। এখানকার কারোকেই যেমন তারা চেনে না, তেমনি পছন্দও করে না। কারো সঙ্গে ভালো ব্যবহারেরও প্রশ্ন নেই মনের মধ্যে। এই বিশাল রাজপুরীতে যে দুটি মানুষকে তারা চেনে জানে ভালোবাসে তাদের একজন অবশ্যই তাদের মাতা, অন্যজন বিদুর। বিদুর কেন? সেখানেই একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন থাকে। বিদুর ধার্তরাষ্ট্রদের অত্যাচার করলে তুষ্ট হন। ধার্তরাষ্ট্ররা যদি সেই অত্যাচারের পরিবর্তে, অর্থাৎ হিংসার পরিবর্তে প্রতিহিংসায় প্রবৃত্ত হয়, তা হলেই তিনি হায় হায় করে ওঠেন। সারা নগরেই আলোড়ন তুলে দেন।

দু-বছর পরে সময় আগত হলে ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। পুনরায় বিদুরের প্রচার শুরু হয়ে গেল। পাণ্ডবদের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের কর্তব্যে কোনো অবহেলা ছিলো না। কার্যত তিনি কখনো কোনো অন্যায় করেননি পাণ্ডবদের প্রতি। দুর্যোধনও কখনো কোনো দ্বেষ বা বৈরিতার প্রকাশ করেছেন বা মন্তব্য করেছেন এমন কথা এই মহাগ্রন্থের অন্য কোথাও নেই। শুধু বলা আছে বিদুরের মুখে। অর্থাৎ দুর্যোধন তাঁর কার্যের দ্বারা দুর্নামের কোনো প্রমাণ তখনো দিতে পারেননি। যুধিষ্ঠিরও তাঁর কার্যের দ্বারা অথবা ব্যবহারের দ্বারা আমাদের জানতে দেননি তিনি মহাত্মা বা পাপাত্মা। ধৈর্যশীল অথবা অসহিষ্ণু। স্থির অথবা অস্থির। ঋজু অথবা বক্র। সহৃদয় অথবা হৃদয়হীন। ধর্মপরায়ণ অথবা অধার্মিক। অনৃতভাষী অথবা সত্যবাদী। যে সমস্ত গুণাবলী শুনে আমরা পাঠকরা মুগ্ধ হই, সেগুলোও সমস্তই বিদুরের ভাষ্য এবং রচয়িতার রচনা।

যুধিষ্ঠির সর্বদাই যবনিকার অন্তরালে। তথাপি সকলেই জ্ঞাত হলেন যৌবরাজ্যে অধিষ্ঠিত হতে না হতেই বিবিধ সদগুণের দ্বারা যুধিষ্ঠির অনতিকালের মধ্যেই এমন প্রিয় হয়ে উঠেছেন, এমন পরাক্রমশালী হয়ে উঠেছেন যে পরম প্রাজ্ঞ, পরম ধার্মিক, পরম রাজনীতিবিদ, রাগদ্বেষশূন্য ভীষ্ম চালিত সেই রাজ্যের প্রজারা নাকি বলতে আরম্ভ করেছে, ‘এই রাজাকেই আমরা চাই।’

অথচ পূর্বাপর যুধিষ্ঠির যেমন আড়ালে ছিলেন সে রকম আড়ালেই আছেন, কোনো কর্মের দ্বারাই নিজের গুণাগুণ প্রতিষ্ঠিত করেননি, ভালো বা মন্দের কোনো পরিচয় কেউ প্রত্যক্ষ করেনি। শুধু মুখ থেকে মুখে রটিত হচ্ছে যুধিষ্ঠিরের মহত্ত্ব। এ-ও রটিত হলো যে এসব শুনে ধৃতরাষ্ট্রের মন থেকে সমুদয় সাধুভাব দূরিত হয়েছে এবং তিনি অত্যন্ত কাতর ও একান্ত চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছেন। বিদুর এসব সংবাদও যেমন রটাতে লাগলেন, সেই সঙ্গে একথাও রটালেন যে দুর্যোধন কর্ণ শকুনি মিলে এই পঞ্চপাণ্ডবকে পুড়িয়ে মারার পরামর্শ করছে। তিনি আকারে ইঙ্গিতে তা বুঝতে পেরেছেন, সেজন্য একখানি নৌকা প্রস্তুত করে রেখেছেন তাঁদের অজ্ঞাতবাসে পাঠাবার জন্য। বিদুর যে নিতান্তই একটি জম্বুক সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এ প্রসঙ্গে মহাভারতের সুন্দর একটি গল্প উল্লেখ করি।

এক শৃগাল, কোনো এক বনে ব্যাঘ্র, ইন্দুর, বৃক ও নকুল এই চারজনের সঙ্গে বাস করতো। জম্বুক, অর্থাৎ শৃগাল, অতিশয় ধূর্ত আর স্বার্থপরায়ণ। একদিন বনের মধ্যে যূথপতি এক মৃগকে লক্ষ্য করে বলপূর্বক আক্রমণ করবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু মৃগ অতিশয় বলবান, এজন্য সে নিজের অভীষ্ট সাধনে নিতান্ত অশক্ত হলে শৃগাল বললো, 'হে ব্যাঘ্র, এই মৃগ অতিশয় যুবা ও বেগবান। সুতরাং তুমি বার বার যত্ন করলেও একে আক্রমণ করতে পারবে না। অতএব যে সময়ে ঐ মৃগ শয়নে থাকবে, সেই অবসরে মূষিক গিয়ে ঐ হরিণের পদদ্বয়ে দন্ত দ্বারা খুব কাটুক, তাহলে তুমি অনায়াসে তাকে ধরতে পারবে। তারপরে আমরা সকলে সমবেত হয়ে প্রফুল্লচিত্তে ভক্ষণ করবো।' জম্বুকের পরামর্শ সকলেরই পছন্দ হলো। তারপর তাদের আদেশে মূষিক গিয়ে মৃগের পদদ্বয় ভক্ষণ করলো এবং ব্যাঘ্র তাকে আক্রমণ করে মরে ফেললো। তখন জম্বুক বললো, 'তোমরা যাও, সবাই মিলে স্নান করে এসো, আমি বসে একে রক্ষা করি।' তখন তারা সকলে স্নান করতে চলে গেলো।

মহাবল ব্যাঘ্র সকলের পূর্বে স্নান করে এলো। শৃগালকে চিন্তাক্রান্ত দেখে বললো, 'কী ভাই জম্বুক, এতো চিন্তা কীসের? এসো আমরা এই মৃগমাংস ভক্ষণ করে আনন্দ করি।' তখন জম্বুক বললো, 'হে মহাবাহো, মূষিক কী করেছে, শোনো। তুমি স্নান করতে গেলে সে অহংকার পরতন্ত্র হয়ে আমাকে বললো, আমিই আজ এই মৃগকে বধ করেছি। ব্যাঘ্রের বলবিক্রমে ধিক্। আজ আমারই ভুজবলে তোমাদের তৃপ্তিসাধন হবে। বলবো কী, সে অহংকার পূর্বক এই রকম তর্জন-গর্জন করছিলো, এ কারণে মৃগমাংস ভক্ষণে আমার আর রুচি নেই।' তখন ব্যাঘ্র ক্রোধভরে বললো, 'হে জম্বুক! যদি সত্যই সে এইরূপ বলে থাকে, ভালো, তুমি যথাকালে আমাকে প্ররোচিত করেছো। আমি অদ্য বাহুবলে বনচরদিগকে বিনাশ করবো।'

তারপর মূষিক এলো। তাকে স্বাগত জানিয়ে সে বললো, 'হে মূষিক! তোমার মঙ্গল তো? ব্যাঘ্র যা বলেছে শোনো। তুমি স্নান করতে গেলে সে বললো, মৃগমাংসে আমার অভিরুচি নেই।

এখন এই মাংস আমার বিষ বলে বোধ হচ্ছে। তোমার অমত না থাকলে আমি এক্ষুনি গিয়ে মূষিককে ভক্ষণ করি।'

এই কথা শুনে মূষিক অতিমাত্রায় ব্যস্তসমস্ত হয়ে প্রাণভয়ে সত্বর বিবর মধ্যে ঢুকে গেলো। ইতিমধ্যে বৃক স্নান করে এলো। তাকে দেখেই জম্বুক বললো, 'ভাই, ব্যাঘ্র তোমার উপর অতিশয় রোষাবিষ্ট হয়েছেন, অতএব তোমার অনিষ্ট ঘটবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। তিনি কলত্রসহকারে শীঘ্রই এখানে আসছেন। এখন যা কর্তব্য হয় করো।' তখন বৃক ভীত ও সংকুচিত হয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেলো। এই অবসরে নকুল এসে উপস্থিত। জম্বুক তাকে আগত দেখে বললে, 'ওহে নকুল। আমি নিজ ভুজবলে সকলকে পরাস্ত করেছি; পরাজিত হয়ে তারা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করেছে। এখন আমার সঙ্গে যদি জয়লাভ করতে পারো, তবেই তুমি ইচ্ছেমতো মৃগমাংস ভক্ষণ করতে পারবে।' তখন নকুল বললো 'হে জম্বুক! ওদেরই যদি তুমি পরাজিত করতে পারো, তবে তো তুমিই সর্বাপেক্ষা বলবান। সুতরাং তোমার সঙ্গে সংগ্রামে যাবার আর আমার ইচ্ছা নাই। চললাম।' এই প্রকার মিথ্যা বাক্যে প্রত্যেককে তাড়িয়ে শৃগাল পরম সুখে একলা মৃগমাংস ভক্ষণ করলো।

বিদুর নামে জম্বুকটিও ঠিক একই ভাবে যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যাসনে বসাবার জন্য পথ পরিষ্কার করতে লাগলেন। যতোদিন ধৃতরাষ্ট্র জীবিত আছেন, ততোদিন এই রাজ্যের সকল কিছুর অধিকারী হয়ে সিংহাসন দখল সুদূর পরাহত। তারও পরে আছে দুর্যোধন। সে-ও নিশ্চয়ই বিনা যুদ্ধে সমস্ত অধিকার ছেড়ে দেবে না। এদের ধনবল জনবল সবই মজুত আছে। যুদ্ধবিদ্যায়ও দুর্যোধন পারদর্শী। যাঁরা তাদের অর্থবহ, যেমন ভীষ্ম আর দ্রোণের মতো অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীর, তাঁরাও সঙ্গে থাকবেন। কর্ণ তো আছেনই। সুতরাং রাজার পিতা হবার জন্য তাঁর বসে বসে যতোগুলো দিন গুনতে হবে, ততোদিন তাঁকে তাঁর আয়ু ইহসংসারের সুখ ভোগ করতে দেবে কি? কুরুবংশের প্রতি এই আক্রোশের আগুন কি নিভবে? যে উদ্দেশ্যে তিনি এক জলযান তৈরি করে অনেক আগে থেকেই 'দুর্যোধন পুড়িয়ে মেরেছে' বলে রটিয়ে পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসে পাঠাবার বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন এবং সমস্ত ঘটনাটা দ্বৈপায়নকেও জানিয়ে রেখেছিলেন, বিধাতার বিধানে সেটা নিজে থেকেই ঘটে গেল।

বিদুরের নিকট পাণ্ডবদের জনপ্রিয়তার বর্ণনা শুনে ধৃতরাষ্ট্র যে কিঞ্চিৎ বিচলিত হননি তা নয়। বিদুরই তাঁর পরামর্শদাতা, তাঁর বিশ্বস্ত মন্ত্রী। ধৃতরাষ্ট্রের কর্ণকুহরে বিদুর নিজেই হয়তো এসব রটনা শুনে ভীত বিহ্বল হবার অভিনয় করে তাঁকে অস্থির করেছেন। ধৃতরাষ্ট্র প্রকৃতই চিন্তান্বিত হয়ে মন্ত্রজ্ঞ নীতিনিপুণ মন্ত্রীবর কণিককে আহ্বান করে বললেন, 'পাণ্ডবরা নাকি অতিশয় বর্ধনশীল হয়েছে, তুমি বুদ্ধি দাও আমি কী করবো।' এই কণিকই জম্বুকের গল্পটি তাঁকে তখন বলেছিলেন। আরো যে সব মন্ত্রণা দিয়েছিলেন সে সব পড়তে পড়তে মনে হয় রাজনীতি নামক

পদার্থটির মধ্যে আর যাই থাকুক নীতি নামে কোনো বস্তু নেই। কণিক প্রথমেই তাঁকে রাজার যা যা করণীয় বলে শুরু করলেন সংক্ষেপে তা হলো এই। এক, রাজার নিরবচ্ছিন্ন দণ্ড বা নিয়ত পৌরুষপ্রকাশ করা উচিত নয়। দুই, যাতে প্রতিপক্ষেরা কোষবলাদির কোনো অনুসন্ধান না নিতে পারে সে বিষয়ে সতত সতর্ক থাকা দরকার। তিন, তিনি সাধ্যানুসারে বিপক্ষের রন্ধ্রান্বেষণে তৎপর হবেন। চার, রাজার আত্মচ্ছিদ্র, গোপন পরিচ্ছিদ্রের অনুসরণ করা অবশ্যকর্তব্য। পাঁচ, অপকারী শত্রুকে বধ করাই সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়। ছয়, শত্রু দুর্বল হলেও কোনোক্রমে অবজ্ঞেয় নয়। সাত, পণ্ডিতেরা বলেছেন, যদবধি সময় আগত না হয় তৎকাল পর্যন্ত শত্রুকে স্কন্ধে বহন করবে। অনন্তর, নির্দিষ্টকাল উপস্থিত হলে, যেমন মৃন্ময়-ঘটকে প্রস্তরোপরি নিক্ষেপ করলে চূর্ণ করা যায়, তাদৃশ অপকারী শত্রুকে বিনাশ করবে।

মাত্রই কয়েকটি লাইন আমি এখানে তুলে দিলাম। ধৃতরাষ্ট্রের সততায় সেই সব উপদেশ বিশেষ ফলবতী না হলেও, তিনি খুব নিরাপদে আছেন সে বিশ্বাস বিঘ্নিত হলো। এই নীতি, যার নাম রাজনীতি, সেই নীতি বিষয়ে কণিক আরো বললেন, যেমন, শত্রুকে শপথ, অর্থদান, বিষপ্রয়োগ, বা মায়া প্রকাশ করে বিনাশ করা বিধেয়। পরমর্মবিদারক দারুণ কর্ম সম্পাদন, ও শত শত শত্রু সংহার না করে মনুষ্য কখনোই মহতী শ্রী লাভ করতে পারে না। দণ্ডায়ত্ত শত্রুকে যে রাজা ধনমানাদি প্রদানপূর্বক অনুগ্রহ করেন, তিনি আপনার মৃত্যু সংগ্রহ করে রাখেন। শত্রুপক্ষ সংখ্যায় অল্প হলেও কদাচ উপেক্ষা করবে না। কারণ তারাই আবার কালক্রমে শত্রুভাব বদ্ধমূল করতে পারে।

এই সব উপদেশ ধৃতরাষ্ট্র অনুসরণ করতে না পারলেও পাণ্ডবপক্ষীয়রা যে অবিকল সেই পথেই পা ফেলে ফেলে চলছেন এবং নেতৃত্ব দিচ্ছেন বিদুর, সে বিষয়ে সন্দেহ না রাখাই ধৃতরাষ্ট্রের কর্তব্য ছিলো। কিন্তু সেকথা তিনি বোঝেননি। তবে জনগণকে বিদুর যা বোঝান আর না-ই বোঝান, দৃষ্টিহীন ধৃতরাষ্ট্রকে নিজের অক্ষিদ্বয় দিয়ে যা দেখান আর না-ই দেখান, ভীষ্মচালিত রাষ্ট্রে প্রজাবিদ্রোহ ঘটানো সাঁতার কেটে সমুদ্র অতিক্রম করার মতোই অসাধ্য ব্যাপার। যদি এই মুহূর্তেই এ রাজ্যের দখল নিতে হয় তা হলে অন্য কোনো শক্তিমান রাজার সাহায্য ব্যতীত তা সম্ভব নয়। বিদুর তাঁর সতর্ক বুদ্ধি, দৃষ্টি আর শ্রবণ সজাগ রেখে বসে থাকেন রাজসভায়। কেউ কল্পনাও করতে পারে না তাঁর কুটিল অন্তর কুরুবংশের সৌভাগ্যে কী ভীষণ অগ্নিযন্ত্রণায় দপ্ দপ্ করে জ্বলছে। ভিতরে এবং বাইরে বিদুর সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই মানুষ।

পাণ্ডবদের বিষয়ে দুর্যোধন এই প্রথম মুখ খুললেন, পিতাকে বললেন, 'হে পিতঃ! পৌরগণ নাকি আপনাকে পরিত্যাগ করে যুধিষ্ঠিরকেই রাজা করতে চাইছে? এই অশ্রদ্ধেয় বাক্য শুনে আমার অত্যন্ত মনোবেদনা হচ্ছে। শেষে কি আমরা রাজবংশে থেকে জনগণের মধ্যে হীন ও অবজ্ঞাত হয়ে থাকবো? পরপিণ্ডোপযোগী লোকেরা নরকভোগ করে। অতএব, হে রাজন! যাতে আমরা ঐ নরক থেকে মুক্ত হতে পারি, এরকম কোনো পরামর্শ করুন।'

বর্ধনশীল যুধিষ্ঠিরকে কীভাবে রোধ করা যায়, কী করলে ধৃতরাষ্ট্র জীবিত থাকতেই প্রজাবিদ্রোহ না ঘটে, সে বিষয়ে পিতা-পুত্র আপাতত রক্ষা পাবার মতো একটা সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হলেন।

যেখানে রাজত্ব নিয়ে পিতাপুত্রেই সংঘর্ষ হয়, যেখানে কুন্তী-বিদুর মিলে হয়তো বা পাণ্ডু-মাদ্রীকে হত্যা করতে পারেন, যেখানে কয়েকজন পর্বতনিবাসী যারা সত্যিই পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ কিনা এবং প্রকৃতই যুধিষ্ঠির দুর্যোধন অপেক্ষা এক বৎসরের বড়ো কিনা সেটা প্রমাণিত তথ্য নয়, সেখানে সাবধান হওয়াটাই বা নিন্দনীয় হবে কেন?

দুর্যোধন বললেন, 'কিছুদিনের জন্য পাণ্ডবরা সপরিবারে যদি অন্যত্র কোথাও গিয়ে কাটিয়ে আসেন, তাহলে আমি বিদ্রোহীদের ধন ও সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করে তাদের পরিতুষ্ট করবো। আপনি যদি কোনোভাবে ওদের বারণাবতে পাঠিয়ে দিতে পারেন, তবে সেই সময়ের মধ্যেই আমরা সমুদয় কার্য শেষ করে নিতে পারবো। সেখানে এই সময়টাতে খুব সুন্দর একটা মেলা হয়।'

প্রকৃতই বারণাবতে সেই সময়ে একটা উৎসব হয়। সভায় বসে সকলের মুখে বারণাবতের প্রশংসা শুনে পাণ্ডবরা সেখানে যাবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করলেন। প্রশংসাটা অবশ্য উদ্দেশ্যমূলকভাবেই করা হচ্ছিলো। পাণ্ডবদের আগ্রহ দেখে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, 'বেশ তো, কিছুদিন না হয় সবান্ধবে ও সপরিবারে গমন করে পরম সুখে কাটিয়ে পুনরায় হস্তিনানগরে প্রত্যাগমন করো।' ধৃতরাষ্ট্রের এই কথার মধ্যে এমন কিছু ছিলো না যাকে ভয় দেখিয়ে পাঠানো বা জবরদস্তি বলা যেতে পারে। তদ্ব্যতীত, তিনি তাদের 'আমোদ আহ্লাদ করে কিছুদিনের মধ্যেই ফিরে এসো' এ কথাও বলে দিয়েছিলেন কিন্তু তারা ফিরে আসেননি। ফিরে আসার জন্যও যাননি।

বিদুর তাঁদের অজ্ঞাতবাসে পাঠাবার জন্য সব ব্যবস্থাই পূর্ব থেকে করে রেখে যে সুযোগ

খুঁজছিলেন সেটা পেয়ে গেলেন। পরে এ কথা তো রটনা করতে হবে যে ভাগ দেবার ভয়ে দুর্যোধনই কোথাও জীবনের মতো সরিয়ে দিয়েছেন পাণ্ডবদের। কুরুকুলকলঙ্কী মন্দবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র কী করে এমন একটা অধর্মানুষ্ঠান করতে উদ্যত হলেন? মহাত্মা ভীষ্মই বা কেমন করে এরকম একটা একান্ত অশ্রদ্ধেয় বিষয় অনুমোদন করলেন? যুধিষ্ঠির ব্যতীত অন্য ভ্রাতারা এটাকে একটা আমোদপ্রমোদের ভ্রমণ বলেই মনে করলেন, কিন্তু বিদুরের ষড়যন্ত্রে ও পরামর্শে যুধিষ্ঠির জানতেন কোনটার পরে কোনটা করতে হবে এবং কোন পথে পা ফেলতে হবে। বিদুরও যাবার মুহূর্তে ম্লেচ্ছ ভাষায় সেই ষড়যন্ত্রের বিষয়টি পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিলেন। যুধিষ্ঠিরও বললেন, 'বুঝেছি।'

ইতিমধ্যে বিদুর হস্তিনাপুরবাসীদের নিকট এটা খুব ভালোভাবেই প্রচার করে দিলেন, ধার্তরাষ্ট্ররা ওদের পুড়িয়ে মারবার জন্যই ওখানে পাঠালেন। ধর্মের মুখোশ পরে বিদুর স্বীয় স্বার্থ সম্পাদনার্থে সততই অধর্মের কূপে নিমজ্জিত করে রাখলেন নিজেকে। এবং তাঁর পিতা দ্বৈপায়ন আমৃত্যু তাঁকে প্রশ্রয় দিয়ে গেলেন।

বারণাবতে যাওয়া মানেই নির্বাসনে যাওয়া এ কথাটা মহাভারত কী অর্থে ব্যবহার করেছে তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। অথচ বারণাবত প্রকৃতই একটি অতি সুন্দর নগর। ভ্রমণের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট স্থান। দেশের লোকেদের নিকট বিদুর যদিও বারণাবতে পাঠিয়ে ধার্তরাষ্ট্ররা পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারবে বলে অনেক কুম্ভীরাশ্রু নির্গলিত করেছেন, ভিতরে যে কতো উল্লসিত হয়েছেন তার কোনো সীমা নেই। এটাই চেয়েছিলেন তিনি। যে নৌকাটি প্রস্তুত করে রেখেছিলেন সেটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরি, যন্ত্রযুক্ত এবং বায়ুবেগ সহনক্ষম। সমুদ্রতরঙ্গও এই নৌকাকে সহসা মগ্ন করতে পারে না। কুন্তীসহ পুত্রদের অজ্ঞাতবাসে পাঠাবার জন্য ঋজুপথ, বক্রপথ সমস্ত পথই তিনি সাজিয়ে ফেলেছিলেন। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তিনি তাঁর মনের দর্পণে প্রতিফলিত দেখতে পেয়ে যুধিষ্ঠিরের হস্তে সেই মানচিত্রটিই ধরিয়ে দিলেন যাবার সময়ে।

পাঁচটি পর্বতনিবাসী পুত্র এবং কুন্তীকে নিয়ে বিদুর যা করছেন সেটা হয়তো দুর্যোধনের মতোই তখন অনেকের কাছেই বাড়াবাড়ি মনে হয়েছিলো। ব্যাসদেবের এই ইতিহাসে তাদের কোনো নাম নেই। দ্বৈপায়ন নিজেও এদের কোনো অন্যায় দেখেও দেখেননি, শুনেও শোনেননি, কৌশলে এড়িয়ে গেছেন। তিনি এড়িয়ে গেলেও অনেক মানুষের চিত্ত বিদুরের প্রচারে যে সায় দেয়নি সেটা যুদ্ধের সময়ে খুব ভালোভাবেই বোঝা গিয়েছিলো।

ভীষ্ম তখন অনাদৃত। ভালো মন্দ কোনোদিকেই আর মনোযোগ বা নিবিষ্টতা খরচ করেন না তিনি। ধৃতরাষ্ট্র একান্তভাবেই বিদুরের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন। দুর্যোধন একা কী করতে পারেন? তবে এতোদিনে দুর্যোধন আরো একটি কথা পিতার শ্রবণে প্রবিষ্ট করাতে সক্ষম হলেন যে বিদুর তাঁর পিতার অর্থবহ হয়েও প্রতিকূল ব্যবহার করছেন। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, ঐ পাঁচটি ভ্রাতা

ধার্তরাষ্ট্রদের প্রতি নিষ্ঠুর হলে নিন্দে নেই, কুরুকুলের ভ্রাতা সেজে এসে কুরুকুলের শত্রু হলে নিন্দে নেই, যতোদিন দুর্যোধন না জন্মালেন ততোদিন পর্যন্ত পাণ্ডু কেন ক্ষেত্রজ পুত্র গ্রহণ করেননি তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই, অতোবড়ো সাম্রাজ্যের প্রাক্তন অধিপতি কী ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন তা নিয়ে কোনো তদন্ত নেই, রাজ্যে খবর পাঠিয়ে মৃত পাণ্ডুকে কেন রাজার মতো সমারোহ করে আনা হলো না তা নিয়ে কোনো বিকার নেই, কেন এই পুত্রগণ পিতার মৃত্যুকালে উপস্থিত হয়নি এবং কুরুরাজ্যে এসে একদিনের জন্যও পিতার নাম উচ্চারণ করেনি বা পিতৃশোকে কাতর হয়নি তা নিয়ে কোনো বক্তব্য নেই, কেনই বা তাদের মাতা কুন্তী অতি নিভৃতে অতি নিঃশব্দে সেই মৃত্যু গোপন রাখলেন, মাদ্রীই বা কী ভাবে মৃত হলেন, এবং মাদ্রীর পুত্ররা মাতৃশোকে এক বিন্দুও বিচলিত নয় কেন তা নিয়েও কোনো জিজ্ঞাসা নেই, কেন শববাহকরা সে বাটীতে একবিন্দু জলস্পর্শ পর্যন্ত করলেন না তা নিয়েও কোনো বিতর্ক নেই। যা আছে তা শুধু দাবি। পাণ্ডব নামধারী পাঁচটি পার্বত্য তরুণ যা করবে তার নামই বীরত্ব। একলব্যের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কেটে অর্জুনকে সর্বাপেক্ষা বড়ো তীরন্দাজ হিশেবে গণ্য করার নামও বীরত্ব, কর্ণের নিকট অর্জুন দ্বন্দ্বযুদ্ধে হেরে যাবেন ভয়ে জন্মবৃত্তান্তের দোহাই দিয়ে কর্ণকে ঠেকিয়ে রাখার নামও বীরত্ব। আর যে মানুষটি লোভে কামে অক্ষমতায় সাধারণের অপেক্ষাও সাধারণ, তিনি মহাত্মা। সমস্ত মহাভারতে একমাত্র যিনি একবার হোক, দুবার হোক, স্বীয় স্বার্থে অনৃতভাষণের দোষে দুষ্ট, তিনিই সত্যবাদী যুধিষ্ঠির।

পাণ্ডবরা বারণাবতে গিয়ে দেখলেন প্রকৃতই একটি জনাকীর্ণ মনোরম নগর। সবাই যখন সেখানে পুরঃপ্রবেশ করলেন, তখন সেখানকার অধিবাসীরা তাঁদের যথেষ্ট সমাদরে গ্রহণ করলেন। পুরবাসীদের আদর আপ্যায়ন সম্মান ইত্যাদি সাঙ্গ হলে তাঁরা যখন তাঁদের জন্য রক্ষিত সুরম্য হর্ম্যে প্রবিষ্ট হলেন, দেখা গেলো পুরোচন অত্যুৎকৃষ্ট ভক্ষ্য পেয় আসন ও শয্যা সমুদয় রাজভোগ্য দ্রব্যও প্রস্তুত করেছে। এ সব ধৃতরাষ্ট্রের আদেশেই হয়েছে। সুব্যবস্থার কোনো ক্রটি নেই। পরম আনন্দে, পরম বিলাসিতায়, দশ দিন তাঁরা সেই হর্ম্যেই বাস করলেন। দশ দিন পরে তাঁরা তাঁদের জন্য নির্মিত 'শিব' নামক গৃহে—যেটাকে জতুগৃহ বলা হয়েছে, সেখানে বাস করতে এলেন।

পুত্রগণসহ কুন্তী এবং তাঁদের দেখাশুনো করবার জন্য পুরোচন একসঙ্গে গিয়েই বারণাবতে পৌঁছেছিলেন। পাণ্ডবগণ গিয়েছিলেন বায়ুবেগগামী সদশ্বযুক্ত রথে আর পুরোচন গিয়েছিলেন দ্রুতগামী অশ্বতরযোজিত রথে। ধৃতরাষ্ট্রকে সরিয়ে দুর্যোধনের ন্যায্য অধিকার অস্বীকার করে, যুধিষ্ঠিরকে কুরুরাজ্যের ভূপতির আসনে বসাবার জন্য বিদুরের মন যতোটা একাগ্র ছিলো, তাঁর পিতা দ্বৈপায়নের মনও ততোটাই। সেই মন ছাপিয়ে যতোটুকু উদ্বৃত্ত তথ্য তিনি পরিবেশিত করেছেন তা হতে পারে জনমতের চাপে, অথবা তাঁর নীতিবোধ অন্যরকম ছিলো, অথবা তা

পরবর্তীকালের বিভিন্ন রচয়িতার অবদান। সেই কারণেই, সহস্র সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হবার পরেও, ঐ পারিবারিক এবং সামাজিক ইতিহাস মানুষের মনকে উদ্ভ্রান্ত করে, চিন্তিত করে, উত্তেজিত করে, ক্রুদ্ধ করে এবং ব্যক্তিগত বোধ বুদ্ধি নীতি অনুযায়ী সত্য উদ্ঘাটনে প্ররোচিত করে। বিদুরের প্রতি বাৎসল্যবশতই দ্বৈপায়ন হঠাৎ হঠাৎ এসে পুত্রের অভিপ্রায় পূর্ণ করে যান। উল্লেখ না থাকলেও অনুভবে বাধা হয় না, বিদুরও প্রায়শই পিতার নিকট গিয়ে তাঁর সান্নিধ্যলাভে সমাদৃত হন। বিদুরের পুত্র যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্বৈপায়নের স্নেহ অন্যান্য পিতামহের মতোই প্রবল।

দশ দিন পরে তাঁদের জন্য নির্মিত গৃহে প্রবিষ্ট হয়েই যুধিষ্ঠির ভীমকে বললেন, 'দেখ ভাই, এ গৃহ ঘৃত লাক্ষা ও বসা প্রভৃতি দাহ্য পদার্থ দিয়ে তৈরি। ওরা আমাদের পুড়িয়ে মারতে চায়।' ভ্রাতারা কিছু অনুভব না করলেও যুধিষ্ঠির প্রায় মুখস্থের মতো বলে গেলেন সেই সব পদার্থের নাম। জতুগৃহ নামের বাড়িটি নিয়ে যে ঘটনা ঘটেছে তা প্রায় পৃথিবীর সকল গোয়েন্দা গল্পের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ গল্প বলা যেতে পারে। দাহ্য পদার্থ দিয়ে কে যে ঐ বাড়িটির নির্মাতা তার ঠিকানা কেউ সঠিক জানে না, যদিও বলে দেওয়া নামটা সেই হতভাগ্য দুর্যোধনের। হস্তিনাপুরে থাকাকালীন যুধিষ্ঠিরের মুখনিঃসৃত একটি বাণীও কারো শ্রুতিগোচর হয়নি। যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হবার পরেও তাঁর মুখে কোনো বক্তব্যই কেউ শোনেনি। যা বলবার, বলেছেন বিদুর। কিন্তু হস্তিনাপুর থেকে বেরিয়েই তিনি অন্য মানুষ।

এখানে কয়েকটি বিষয় একটু খতিয়ে দেখা যাক। প্রথম কথা, পাণ্ডবদের জন্য মাত্র দশ দিনে ঐ রকম একটি চতুঃশাল গৃহ নির্মাণ করা যেমন কঠিন, তেমনি কঠিন গৃহে শণ ও সর্জরস প্রভৃতি যাবতীয় বহ্নিযোগ্য দ্রব্য প্রদান করা, মৃত্তিকাতে প্রচুর পরিমাণে ঘৃত তৈল বসা ও লাক্ষাদি মিশিয়ে তা দিয়ে ঐ গৃহের প্রাচীর লেপন করা। তাছাড়া, এসব কাজ কখনো যাদের পুড়িয়ে মারবার হেতু করা তাদের সাক্ষাতে কেউ করে না। আর সাক্ষাতে না করলে যুধিষ্ঠির জানলেন কী করে? গন্ধে এতো কিছু আন্দাজ করা সম্ভব নয়। যা যা দিয়ে দেয়াল প্রলেপিত হয়েছে, তার প্রত্যেকটির নাম জানাও সম্ভব নয়। তদুপরি, এতো কিছু জেনে সে বাড়িতে যাওয়াও সম্ভব নয়। হস্তিনাপুর থেকে বেরিয়ে যদিও তাঁর কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট জোর বেড়েছে, কিন্তু বুদ্ধিটা ততো খোলেনি। এখানে আসবার মুহূর্তে সে সব কথা পিতার ম্লেচ্ছ ভাষার সাহায্যে শুনেই জেনেছেন। এবং এটা একদিনের শ্রাব্য কথা নয়, অনেক দিনেরই শিক্ষা। সেই শিক্ষাটাই বাড়ি থেকে বেরোবার পূর্ব মুহূর্তে ঝালিয়ে দেওয়া হয়েছিলো।

ভীম এদিক ওদিক তাকিয়ে গন্ধ নেবার চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু কিছু বুঝতে পারলেন না। পরে বললেন, 'যদি মনে করেন এখানে অগ্নিভয় আছে, তবে চলুন আমরা পূর্ব বাসস্থানেই ফিরে যাই।' যুধিষ্ঠির রাজি হলেন না। কেন হলেন না? তাঁরা না এলে পুরোচন কি তাঁদের জোর

করে নিয়ে যেতে পারতো? এতো ভয় কেন? তাঁরা রাজা, তাঁদের তা অনিরাপদে থাকার কথা নয়। দেশবাসীরা সবাই তাঁদের রাজসম্মানেই গ্রহণ করেছে, শ্রদ্ধা করেছে, চাইলে তাঁরা সকলেই সসম্মানে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে দিয়ে নিজেদের কৃতার্থ মনে করতো। তদ্ব্যতীত, ধৃতরাষ্ট্র তো তাঁদের সেখানে আজীবন থাকার কথা বলেননি, জোর করেও পাঠাননি। তাঁরা যেতে চাইলে বলেছেন, কয়েকদিন আমোদ আহ্লাদ করে ফিরে এসো। কেন তাঁরা প্রত্যাবৃত্ত হলেন না? যুধিষ্ঠির এক অবিশ্বাস্য যুক্তি দিয়ে বললেন, 'শোনো, আমরা একথা বুঝতে পেরেছি জানলে আমাদের পুরোচন বলপ্রয়োগ করে দগ্ধ করবে।'

যদি পুরোচন তাঁদের বলপ্রয়োগেই দগ্ধ করতে সক্ষম, তবে কষ্ট করে এতো বড়ো বাড়িটা তৈরি করবার কী প্রয়োজন ছিলো? তাঁরা তো এখানে থাকতে আসেননি, এসেছেন বেড়াতে। দাহ্য পদার্থ দিয়ে গৃহ তৈরি না করলেও কি কোনো গৃহ অগ্নিদগ্ধ হয় না? অগ্নি সর্বভুক। সুযুপ্ত অবস্থায় রাজা মহারাজাই হোন, বা ফকির ভিখারিই হোন, তার নিকট সকলেই সমান ভক্ষ্য। ইচ্ছে করলে সেটা তো হস্তিনাপুরেও হতে পারতো। তবু যদি ধরা যায় স্বশাসিত নগরে এমন অপকর্ম করায় ধৃতরাষ্ট্র বা দুর্যোধনের আপত্তি ছিলো, দুর্নামের ভয় ছিলো, তথাপি এ প্রশ্ন থেকেই যায়, যাঁরা মাত্র কয়েকদিনের জন্যই বেড়াতে এসেছেন, তাঁরা নিজেদের রাজত্ব ছেড়ে সম্পূর্ণ একটি বৎসর কেন সেখানে অবস্থান করলেন? আর সেই গৃহে পা দেওয়া মাত্রই কেন বিদুর তৎক্ষণাৎ একটি খনক পাঠিয়ে দিলেন? এবং সেই খনক যেমন তেমন খনক নয়। একজন অতিশয় কৃতবিদ্য প্রযুক্তিবিদ। অতো দূরে বসে বিদুর কী করে তাদের অনুকোটি চৌষট্টি খবর রেখেছেন, যদি না চর-অনুচরের যাতায়াত অব্যাহত থাকে?

যুধিষ্ঠির ভীমকে এ কথাও বললেন, 'দ্যাখো, শত্রু নির্মিত এই জতুগৃহ দগ্ধ হলে পর পিতামহ ভীষ্ম ও অন্যান্য কুরুবংশীয় মহাত্মারা অতিশয় ক্রোধান্বিত হবেন। বলবেন, ''কে এই অধার্মিক কর্ম করালো''?' এই বাক্য ক'টি যুধিষ্ঠির এমন নিশ্চিত ভঙ্গিতে উচ্চারণ করলেন যা থেকে খুব স্পষ্ট ভাবেই বোঝা যায় তিনি জানতেন পুড়ে যাঁরা মরবেন তাঁরা আর যেই হোন, কুন্তীর পঞ্চ পুত্র নন। যাঁরা অগ্নি প্রদানে সেই গৃহ প্রজ্বলিত করবেন, তাঁরাও ধার্তরাষ্ট্রদের কেউ নন। যদি সেই ভয়ই তাঁর থাকতো তবে জেনেশুনে কী করে একথা বললেন, 'জতুগৃহ দগ্ধ হলে পিতামহ ভীষ্ম ও অন্যান্য কুরুবংশীয় মহাত্মারা অতিশয় ক্রোধান্বিত হবেন।' তাঁরা যদি দগ্ধই হন, তবে কে কী বললো আর না বললো কী এসে যায় তাতে? তদ্ব্যতীত, তাঁদের দগ্ধ করবার জন্যই যদি দাহ্য পদার্থ দিয়ে বাড়িটি তৈরি হয়, পুরোচনের জন্য যে বাড়ি সে বাড়ি তো অমন দাহ্য পদার্থ দিয়ে তৈরি করবার কোনো প্রশ্ন ছিলো না। যিনি তাদের পোড়াবেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনিও কি নিজেকে পুড়িয়ে মারবেন? সহমরণ?

পিতামহ কৃষ্ণদ্বৈপায়নের রচনার চাতুর্য, পিতা বিদুরের কাপট্য আর মাতা কুন্তীর হৃদয়হীনতা,

এই তিনটি পাথেয় নিয়েই যুধিষ্ঠির চালিত হচ্ছিলেন কুরুরাজ্য দখলের জন্য। আর এঁদের সকলের দুষ্কর্মের বোঝা বহন করছিলেন হতভাগ্য দুর্যোধন। পুড়ে মরবার জন্যই কি সম্পূর্ণ এক বৎসর ভ্রাতাগণ আর তাদের মাতাকে অপেক্ষা করতে হলো সেখানে? এটা কি সম্ভব? যে করেই হোক নিশ্চয়ই তাঁরা বেরিয়ে পড়তেন সে বাড়ি থেকে। একটা পাতালপথ তৈরি হওয়া তো সহজ ঘটনা নয়, দু-একদিনের ব্যাপারও নয়, দু-একজন মানুষের কর্মও নয়। প্রযুক্তিবিদ্যার উৎকৃষ্ট নির্দশন এই সুড়ঙ্গ পথ তৈরি হতে সময় লাগলো সম্পূর্ণ একটি বৎসর। এই এক বছর কেন পুরোচন নিশ্চেষ্ট অবস্থায় বসে রইলেন? দাহ্য পদার্থে তৈরি তাঁর বাড়ির ওপর এতোদিন ধরে কী কাজকর্ম হচ্ছে সেটা জানবারও কৌতূহল কি তাঁর হলো না? তাছাড়া, যে মানুষ এতোগুলো বিশেষ লোককে পুড়িয়ে মারবার মতো একটা নৃশংস, গূঢ় অভিসন্ধি নিয়ে একটা বিশেষ হর্ম্য তৈরি করেছেন, তিনি নিশ্চয়ই সদাসতর্ক থাকবেন, অশান্ত থাকবেন, এবং অনুক্ষণই উদ্দেশ্য সাধনের সুযোগ খুঁজে বেড়াবেন। উপরন্তু, দশদিনে তৈরি বাড়ির ওপর দিয়ে এতোগুলো ঋতুই বা বয়ে যেতে দেবেন কেন? দাহ্য পদার্থ তো অনন্তকাল ধরে প্রলেপিত থাকতে পারে না? কখনো তা গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে দগ্ধ হবে, কখনো বর্ষার অবিরল বারিপাতে ধৌত হবে। পাণ্ডবরা না হয় পালাবার রাস্তা তৈরি না হলে লুকিয়ে বেরোতে পারছিলেন না। কিন্তু পুরোচনের তো সে ভাবনা নেই, সে অযথা সময় নষ্ট করবে কেন? রাত কি কখনো গভীর হয়নি? পাণ্ডবরা কি ক্লান্ত দেহে নিদ্রাচ্ছন্ন হননি কখনো? আসলে এ বাড়ি আদপেই পুরোচনের তৈরি নয়। অন্তত দাহ্য পদার্থের ব্যবহার তিনি কখনোই করেননি।

যেদিন পাতালপথ সম্পূর্ণ হলো, এবং যুধিষ্ঠির মনে করলেন সময় উপস্থিত হয়েছে, সেদিন চারিদিক নিঃঝুম হলে তিনি বললেন, 'এবার আগুন দাও। প্রথমে পুরোচনের গৃহ ভস্ম করো, তারপর আরো ছয়জনকে এখানে রেখে পুড়িয়ে আমরা অলক্ষিতে পলায়ন করবো।'

ছয়জন সেখানে কারা থাকবেন? দয়ার অবতার মহাত্মা যুধিষ্ঠির আর যুধিষ্ঠিরের দয়ার্দ্রচিত্ত মাতা কুন্তী সে ব্যবস্থাও ঠিক করে রেখেছেন। কুন্তী চালাকি করে সেদিন সন্ধ্যায় কয়েকজন ব্রাহ্মণব্রাহ্মণীকে নিমন্ত্রণ খাওয়ালেন। তারা চলে যাবার পর একজন ক্ষুধার্ত নিষাদ মাতাকে তার পাঁচপুত্রসহ এতো অধিক পরিমাণে পান ভোজন করালেন যে তারা হতজ্ঞান ও মৃতকল্প হয়ে সেখানে পড়ে রইলো। জ্যেষ্ঠের আদেশে ভীম প্রথমেই পুরোচনের গৃহে (এখানেই প্রমাণিত হলো পুরোচনের গৃহ আলাদা ছিলো এবং দাহ্যপদার্থে প্রলেপিত ছিলো) আগুন দিলেন, পরে জতুগৃহের চারিদিকে অগ্নিপ্রদান করে যখন দেখলেন অগ্নি সর্বত্র প্রজ্বলিত হয়েছে, তখন মাতা ও ভ্রাতৃগণসহ সেই পাতাল পথে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

ভেবে দেখুন কতদূর লোভী হলে, পাপিষ্ঠ হলে মানুষ এভাবে একটি নির্দোষ দুঃখী রমণীকে তার পাঁচ পাঁচটি পুত্রসহ পুড়িয়ে মারতে পারে। অন্যের রাজ্য কেড়ে নেবার লোভে যদি যুধিষ্ঠির

এই ভয়ঙ্কর কর্মে প্রবৃত্ত হন, তবে দুর্যোধন তাঁর পিতাকে উচ্ছিন্ন করে, তাঁকে বঞ্চিত করে যারা সেই সিংহাসনের দখল চায়, তাদের প্রতিবন্ধক হলে তাঁর অপরাধটা কোথায়? তিনি নিশ্চয়ই তাঁর পিতাকে রক্ষা করবেন, নিজের স্বার্থ দেখবেন। সেটাই তো তাঁর ধর্ম, তাঁর কর্তব্য। যদিও দুর্যোধন তাঁর সারাজীবনে কখনো ততোটা নীচে নামবার কথা ভাবেননি, যতোটা নীচে পাণ্ডব নামধারী যুবক ক'টিকে বিদুর এবং দ্বৈপায়ন নামাতে পেরেছেন। এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড সমাপ্ত করতে কুন্তীর চোখের পাতাটি নড়লো না। পাঁচটি পুত্রেরও একবিন্দু বিবেক দংশন হলো না।

আর একদিকে হুতাশনের অগ্নিতাপ যখন প্রবল আকার ধারণ করলো, বিদুরের কৃপায় সমস্ত পুরবাসীগণ অতিশয় দুঃখিত হয়ে বলতে লাগলেন, 'দ্যাখো, দুরাত্মা পুরোচন পাণ্ডবদ্বেষী কুরুকলঙ্ক পাপাত্মা দুর্যোধনের আদেশানুসারে, নিরপরাধ সুবিশ্বস্ত সমাতৃক পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করবার জন্য যে গৃহ নির্মাণ করেছিলো, এখন তাতে অগ্নিপ্রদান করে স্বীয় মনস্কামনা সিদ্ধ করলো। ধর্মের কি অনির্বচনীয় মহিমা! দুরাত্মা নিজেও এই প্রদীপ্ত হুতাশনে দগ্ধ হলো। দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রকে ধিক্, কী দুর্বুদ্ধি! ঐ দুরাত্মা পরমাত্মীয় ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে শত্রুর মতো অনায়াসে দগ্ধ করলো।' যে কথা যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের পূর্বে বলেছিলেন ঠিক তাই হলো। কিন্তু এরা এটা জানলো কী করে যে ধৃতরাষ্ট্র এদের পুড়িয়ে মারবার জন্যই এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন? এটা তো এই দেশবাসীদের জানবার বা ভাববার প্রশ্নই নেই। বিদুরের প্রচারমহিমা এখানেও কার্যকরী হলো।

মাতৃসমবেত পাণ্ডবেরা যখন পাতাল পথ দিয়ে দ্রুতবেগে চলতে লাগলেন, মহাভারতের বর্ণনা অনুসারে 'ভীম ব্যতীত সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তখন ভীম মাতাকে স্কন্ধদেশে, নকুল ও সহদেবকে কোলে নিলেন এবং যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের দুই হাত ধরে বায়ুবেগে চলতে লাগলেন। ভীমের বক্ষের আঘাতে বনরাজি ও তরুসকল ভগ্ন, ও পদাঘাতে ধরাতল বিদীর্ণ হতে লাগলো।' শুধু তাই নয় 'গমনকালে তার উরুবেগে বনস্থ বৃক্ষ সকল' শাখা প্রশাখার সঙ্গে থরথর করে কাঁপতে থাকলো। তার 'জঙ্ঘাপবনে পার্শ্বস্থ বৃক্ষ ও লতা সব ভূতলশায়ী' হলো। তা হলেই ভেবে দেখুন, দুর্যোধনের উপর যখন ভীম খেলাচ্ছলে আক্রমণ করতেন, তখন সেই আক্রমণ কী ভয়ঙ্কর হতো! দিনের পর দিন তাঁরা কী কষ্ট সহ্য করেছেন! কিন্তু সেটা নিয়ে কোনো কথা নেই, ব্যথা নেই, শাসন নেই, নিন্দে নেই। অথচ অতিষ্ঠ হয়ে দুর্যোধনরা যখন তাঁকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে, লতা দিয়ে বেঁধে ফেলে এলেন জলের ধারে, তা নিয়ে দুর্যোধনের প্রতি অকথ্য নিন্দায়, বিদুরের অপপ্রচারে, পুরবাসীগণ মুখর হয়ে উঠলো। আসল কারণটা কেউ দেখলো না, ভাবতে লাগলো, সত্যই রাজত্বের ভাগ না দেবার জন্য বিষ খাইয়েছে দুর্যোধন। ভীমকে মেরে সে উদ্দেশ্য সাধিত হওয়া যে নেহাৎ অসম্ভব সেটা দুর্যোধন নিশ্চয়ই বুঝতেন।

পাতালপথ শেষ হলে যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের, এবং মাতাকে নিয়ে অন্য একটা জায়গায় এসে

আকাশের তলায় দাঁড়াবেন। নিকটেই নদী। পথ প্রদর্শক সেখানেই অপেক্ষা করছিলো। সকলকে নিয়ে নদীতীরে এলেন। সেখানে জলযান অপেক্ষাই করছিলো তাঁদের জন্য। আরোহণ করলে চালক বললো, 'মহাত্মা বিদুর আপনাদের তাঁর আলিঙ্গন জানিয়ে বলে দিয়েছেন যে আপনারা অবশ্যই কর্ণ দুর্যোধন ও শকুনিকে সংগ্রামে পরাজিত করবেন। এই তরঙ্গসহা সুগামিনী তরণীতে আপনারা নিঃসন্দেহে সমস্ত দেশ অতিক্রম করতে পারবেন।' এখানে সংগ্রামের কথা উঠলো কেন, যদি না গোপনে গোপনে অন্য কোনো রাজার সঙ্গে ষড়যন্ত্র না করে থাকেন? তা ব্যতীত, তাঁরা যে পুড়ে মরেননি, সে কথাই বা বিদুর জানলেন কী করে সমস্ত ঘটনাটা যদি পূর্বপরিকল্পিত না থাকতো?

নৌকোয় উঠলেন তাঁরা, গঙ্গা পার হয়ে অপরতীরে অবতরণ করলেন। অবতরণ করে এদিক ওদিক তাকালেন না, নির্দিষ্ট ভাবে দক্ষিণ দিকে যেতে লাগলেন। কী ভাবে কোন পথে গমন করলে কী হবে, কুন্তী আর যুধিষ্ঠিরের জানাই ছিলো। বনপথে কিছুদূর যেতেই অপেক্ষমান ব্যাসদেবের সাক্ষাৎ মিললো। তিনি বললেন, 'আমি সব জানি, পরিণামে তোমরা সুখী হবে। ধার্তরাষ্ট্রগণ ও তোমরা আমার পক্ষে উভয়েই সমান, কিন্তু আমি ধৃতরাষ্ট্রের সন্তানগণ অপেক্ষা তোমাদের অধিক ভালোবাসি। অধিক স্নেহ করি।' যে ব্যাসদেবকে আমরা নিষ্কাম নির্মোহ ব্রহ্মচারী ঋষি বলে জানি তিনি নিজ মুখেই এ কথা বলছেন। তারপর বললেন, 'আমি স্নেহবশে তোমাদের হিতসাধনে উদ্যত।' এই বলে তাঁদের নিয়ে একচক্রা নগরীতে এলেন, এসে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'মাতৃ-ভ্রাতৃ সমভিব্যাহারে একমাস এখানে পরম সুখে অবস্থান করো। মাস পূর্ণ হলে আমি আবার আসবো।'

এটাই হলো যুদ্ধ করে ধৃতরাষ্ট্রকে সিংহাসনচ্যুত করবার এবং যুধিষ্ঠিরকে সেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করবার প্রধান পদক্ষেপ। এখন যে যার মনে ভাবতে থাকুন, এই জতুগৃহ নামে গোয়েন্দা গল্পটির আসল ষড়যন্ত্রীটি কে? পূর্বাপর পরিকল্পনাই বা কার? অত দাহ্য পদার্থ দিয়ে বাড়িটি বানিয়ে, পাণ্ডবদের পুড়িয়ে না মেরে, কেনই বা সম্পূর্ণ একটি বৎসর পুরোচন রাতের পর রাত কেবল ঘুমিয়েই কাটালো? আর যিনি মহাত্মা, যিনি দয়ার অবতার, তিনি রাজ্যের লোভে কী সুন্দর আগুন জ্বালিয়ে মাতাসহ পাঁচটি পুত্রকে দগ্ধ করে, সেবক পুরোচনকে পুড়িয়ে, দিব্যি গিয়ে পিতামহ দ্বৈপায়নের সঙ্গে মিলিত হলেন। আর দুর্যোধন কিছু না জেনে না বুঝে ওদের পঞ্চভ্রাতা ও মাতার সব পাপের বোঝা বহন করে পাপাত্মা হলেন। স্বীয় পিতা পর্যন্ত জানলেন এই কীর্তি তাঁর পুত্রের। পিতামহ ভীষ্ম দুঃখে পরিপূর্ণ হলেন। লজ্জায় কাউকে মুখ দেখাতে পারলেন না। নগরবাসীরা ছি ছি করতে লাগলো। ধৃতরাষ্ট্রকেই দোষী সাব্যস্ত করা হলো, যেহেতু তিনি অতিশয় পুত্রবৎসল, নচেৎ ঐ দুরাত্মা পুত্রের কথা শুনে এই ভয়ঙ্কর কলঙ্কিত ও নিষ্ঠুর কার্যে কী করে সম্মতি জানালেন?

আর এই রটনার যিনি নায়ক, যিনি প্রত্যেকের মনে কুরুদের এই সব অধার্মিক অধম অসাধু কর্মের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সফল হলেন, তাঁর বিরুদ্ধে দুর্যোধন সব জেনে-বুঝেও কোনো প্রতিবাদ করতে পারলেন না। বিদুরের কূটনৈতিক চাল এবং অনৃতভাষণের ক্ষমতার কাছে তাঁকে পরাজিত হতেই হলো, কেননা এ বিদ্যায় একেবারেই তিনি পারদর্শী নন। বিদুরের তুলনায় তিনি নেহাৎ শিশু।

একমাস পূর্ণ হলে দ্বৈপায়ন পুনরায় একচক্রা নগরীতে এলেন। তিনি তাদের এবার পাঞ্চাল নগরীতে যেতে বললেন। তারপর সেখান থেকে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে দৌপদীর স্বয়ংবর সভায় যাবার নির্দেশ দিলেন। বিদুর দ্বৈপায়নকে এটা বোঝাতে পেরেছিলেন যে ধৃতরাষ্ট্র যতোদিন বেঁচে আছেন ততোদিন সম্পূর্ণভাবে সমস্ত সাম্রাজ্য দখল করা সম্ভাবনার পরপারে। সুতরাং যে ভূপতি সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী এবং পরিচিত, অর্জুনের বীরত্ব সম্পর্কে অবহিত, ঠিক তাঁকেই ভেবে বার করেছেন। ইনি যদি পাণ্ডবদের সহায় হন, তাহলে কুরুবংশ ধ্বংস করা অনেকটা সহজ হয়ে আসবে। বিদুর এবং দ্বৈপায়ন সেই কর্মেই প্রবৃত্ত হয়ে এক পা দুই পা করে যুদ্ধের দিকে অগ্রসর হলেন।

সাধারণভাবে এটাই সত্য যে বিদুর যখন দুই পক্ষেরই কেউ নন, তাঁর নিকট কুরুরাও যা পাণ্ডবরাও তাই, অতএব তিনি তৃতীয়পক্ষ। এবং তৃতীয় পক্ষের নিরপেক্ষ হওয়াই স্বাভাবিক, পক্ষপাতদুষ্ট নয়। সুতরাং পাণ্ডবরাই রাজা হোন, বা কুরুরাই রাজা হোন, তাতে তাঁর নিশ্চয়ই কিছু যায় আসে না। বরং ধৃতরাষ্ট্রের রাজবাটীতে তাঁর সম্মান অনাহত। স্বয়ং রাজা তো তাঁর হস্তধারণ করেই হাঁটছেন, তাঁর অদর্শনে রাজা অন্ধকার চোখে আরো অন্ধকার দেখছেন। অথচ পাণ্ডবদের জন্য বিদুরের কীসের এতো মাথা ব্যথা সেটাই দুর্যোধন বুঝে উঠতে পারেন না। কর্ণও তাঁর বন্ধুর মতো একই কথা ভেবে অবাক হন। বিদুরের যে পাণ্ডবদের প্রতি একটা আসক্তি এবং উদগ্র পক্ষপাত আছে সেটা এতোই প্রত্যক্ষ যে কারো চোখেই না পড়ার মতো নয়। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হলেও নির্বোধ তো নন। সমস্তক্ষণই তো বিদুর তাঁর কাছে পাণ্ডবদের স্তুতি গাইছেন, আর দুর্যোধনের মস্তকচর্বণ করছেন। তা নিয়ে কখনো কি তাঁর মনে কোনো বিকার হয় না? মনে হয় না, পাণ্ডবদের নিয়ে বিদুর এতো বাড়াবাড়ি করছেন কেন? কতোটুকু চেনেন তাঁদের। দেখলেন তো এই প্রথম। বিদুরের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের এই অদ্ভুত নির্ভরতা, আপাতভাবে যার কোনো যুক্তি নেই। ভীষ্ম এখন সর্বত্রই অনুপস্থিত। ধৃতরাষ্ট্র তাঁর সঙ্গে কোনো পরামর্শই করেন না। তিনিও অযাচিতভাবে দেন না। এই রাজন্যবর্গের মধ্যে পিতামহ ভীষ্ম আর কর্ণই শুদ্ধ আর্য। সম্ভবত সে জন্যই তাঁরা বর্জিত, দ্বৈপায়ন দ্বারা উপেক্ষিত।

আমরা জানি দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় দুর্যোধন এবং কর্ণ দুজনেই উপস্থিত ছিলেন। দ্রুপদ রাজা ঘোষণা করেছিলেন, যে ব্যক্তি 'সজ্যশরাসনে' শরসন্ধানপূর্বক যন্ত্র অতিক্রম করে লক্ষ্যবিদ্ধ করতে পারবেন, দ্রৌপদী তাঁরই কণ্ঠে মাল্যদান করবেন। এই ঘোষণা তিনি একাধিকবার করেছিলেন।

ধৃষ্টদ্যুম্নও ভগ্নী বিষয়ে ঐ একই ঘোষণা একাধিকবার করেছিলেন। অর্থাৎ তাঁরা ক্ষত্রিয় বললেন না, ভূপতি বললেন না, কোনো জাতিগত প্রথার উপরেই জোর দিলেন না, জোর দিলেন কেবলমাত্র বীরত্বের দিকে।

এই ঘোষণার নিহিত নিগূঢ় অর্থটি যে কী সেই মুহূর্তে না বুঝলেও পরের মুহূর্তেই স্বচ্ছ আর্শির মতো পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিলো। সবই ব্যাসদেবের মন্ত্রণা। যুধিষ্ঠিররা ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে উপস্থিত থাকবেন সেখানে, সেজন্যই এ ঘোষণা। তিনি পূর্বেই বলে এসেছিলেন, দ্রৌপদীকে তোমরাই লাভ করবে। অর্থাৎ, যাতে তাঁরাই লাভ করতে পারেন, সেই বন্দোবস্ত করে এসেছিলেন বলেই এই বাক্য এতো সহজে তিনি বলতে পারলেন তাঁদের। সমস্তটাই সাজানো নাটক।

এই স্বয়ংবর সভায় যাদব বংশীয়রাও এসেছিলেন। কৃষ্ণও এসেছিলেন। অন্যান্য বিখ্যাত এবং বিশিষ্ট রাজা মহারাজারা তো বটেই। দ্রৌপদীর সৌন্দর্যের খ্যাতি ছিলো। যদিও তিনি কাঞ্চনবর্ণা নন। শ্যামাঙ্গিনী।

ধৃষ্টদ্যুম্ন নির্দিষ্ট সময়ে ভগিনীকে নিয়ে ধীরে ধীরে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হলেন। এবং ভগিনীকে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রাজাদের বিষয় অবহিত করে দিলেন। বললেন, 'যিনি এই লক্ষ্য বিদ্ধ করতে পারবেন, তুমি তাঁর গলদেশেই বরমাল্য প্রদান করো।'

কিন্তু সকলেই সেই ভীষণ শরাসনে জ্যা সংযুক্ত করা দূরে থাক, ধনু স্পর্শমাত্র আহত ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হতে লাগলেন। এভাবে সকল ধনুর্দ্ধরপ্রবর যখন হতোদ্যম হয়ে পড়লেন, সেই সময় কর্ণ সত্বর ধনু উত্তোলনপূর্বক তাতে জ্যা সংযুক্ত করে শরসন্ধান করলেন। দ্রৌপদীকে দেখে পাণ্ডবরাও কন্দর্পবাণে অভিভূত হয়েছিলেন। কর্ণকে জ্যা সংযুক্ত করে শরসন্ধান করতে দেখে যুধিষ্টির ভাবলেন, কর্ণই এ কন্যারত্ন লাভ করবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু দ্রৌপদী কর্ণের এ কর্ম দর্শনে বেশ জোরের সঙ্গেই বলে উঠলেন, 'আমি সূতপুত্রকে বরণ করবো না।' কর্ণের অসম্মানটা ভেবে দেখুন। এ স্বয়ংবর সভাতে তো কোনো জাতিগত শর্ত ছিলো না।

তথাপি দ্রৌপদী এরকম একটা জাত তুলে অভদ্র উক্তি করলেন কেন? শ্রবণমাত্র কর্ণ সক্রোধ হাস্যে শরাসন পরিত্যাগ করলেন। তাঁর মুখমণ্ডল বর্ষার কোমল পদ্মফুলের মতো বেদনায় সজল হয়ে উঠলো।

হিশাবে একটু ভুল হয়ে গিয়েছিলো ব্যাসদেবের। কর্ণের কথা তাঁর মনে ছিলো না। অর্জুনকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভেবেছিলেন। কন্যা স্বয়ং রক্ষা করলেন তাঁকে। এইরকম একটি বিশিষ্ট সমাবেশে দ্রৌপদী যে তাঁর পিতা ও ভ্রাতার ঘোষণাকে এইভাবে উপেক্ষা করে জাত তুলে কথা বললেন, তাতে তাঁর পিতা ও ভ্রাতা কিন্তু একটু বিচলিত হলেন না। দ্রৌপদীর পিতা ও ভ্রাতা যেমন জানতেন দ্রৌপদী কার কণ্ঠে মাল্যদান করবেন, দ্রৌপদী নিজেও জানতেন। ছদ্মবেশে এলেও, যেমন দ্রুপদ রাজাও জানতেন কোন যুবা তাঁর জামাতা হবেন, তেমনি দ্রৌপদীও সে বিষয়ে অবজ্ঞাত ছিলেন। অর্জুনকে চিনতে দ্রৌপদীর অসুবিধে হয়নি। হয়তো কোনো সংকেতও ছিলো। তবে কর্ণকে 'সূতপত্র' হিশেবে তিনি জানলেন কী করে, সে প্রশ্ন থেকে যায়। কর্ণ সেখানে অঙ্গদেশের রাজা হিশেবেই এসেছিলেন, আর তাঁর চেহারায় সূতপুত্রজনিত কোনো লক্ষণ প্রকট ছিলো না।

এবার এঁদের কার্যকলাপের ধারাবাহিকতাটা কীভাবে এগিয়ে চলেছে সেটা বোধহয় অনুধাবনযোগ্য। প্রথমত, বিদুর একটি সদ্যোজাত শিশুকে, যে-শিশু রাজবাড়ির প্রথম সুস্থ বংশধর, তার পিতা রাজা ধৃতরাষ্ট্রের দ্বারা নিহত করাবার আপ্রাণ প্রচেষ্টা করেছেন। তারপরেই পাণ্ডু এবং তার কনিষ্ঠা পত্নীর নিঃশব্দ নির্জন সাক্ষীহীন মৃত্যু। তিন নম্বর, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র জন্মানো মাত্র, ঠিক মেপে মেপে পাণ্ডুরও ক্ষেত্রজ গ্রহণ এবং জ্যেষ্ঠটিকে, অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরকে দুর্যোধনের চেয়ে এক বৎসরের বড় বলে দাবি। চতুর্থ, জতুগৃহদাহ। জতুগৃহে অগ্নি প্রদানের পূর্বে বিদুরের পাঠানো একজন কৃতবিদ্য প্রযুক্তিবিদের দ্বারা পাতালপথ নির্মাণ। পাতালপথ থেকে বেরিয়ে আকাশের তলায় এসে পাণ্ডবরা যেখানে দাঁড়ালেন, সেখানেই একজন পথপ্রদর্শকের দাঁড়িয়ে থাকা। এইসব সাজানো ঘটনাবলী সবই সাম্রাজ্য দখলের ভূমিকা ব্যতীত আর কী ভাবা যায়? ধৃতরাষ্ট্র বেঁচে আছেন, যিনি এঁদের পিতৃব্য। অন্তত তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে এঁরা, অর্থাৎ বিদুর রাজি নন। এঁদের ষড়যন্ত্রের কাছে, যে ষড়যন্ত্র কেবলমাত্র খুনের রক্তেই রঞ্জিত নয়, আরো বহুদূর অগ্রসর, দুর্যোধনের দৌরাত্ম্য নেহাৎ শিশুসুলভ হম্বিতম্বি। যে বিদুরকে মহাভারত পাঠকদের নিকট 'ধর্ম' বলে ধার্য করে দিয়েছে, সেই ধর্ম নামক ব্যক্তিটির অধার্মিক আচরণ দ্বিতীয়রহিত।

দ্রৌপদীর স্বয়ংবরসভায় যেহেতু বৃষ্ণিবংশীয় যদুশ্রেষ্ঠগণও উপস্থিত ছিলেন, এই সময় থেকে কুরুদের বিপক্ষদলে আরো একজন যিনি যুক্ত হলেন তাঁর নাম কৃষ্ণ। কৃষ্ণের পিতা বসুদেব কুন্তীর ভ্রাতা, অতএব কুন্তী কৃষ্ণের পিতৃস্বসা, সম্পর্ক নিকট। কৃষ্ণও কিন্তু জানতেন না এই

পুত্ররা পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ। এই সভাতেই প্রথম দর্শন। বড়ো বড়ো পাঁচটি বহিরাগত যুবককে দেখে তিনি বিস্মিত হলেন, শেষ পর্যন্ত তাঁদের বলবিক্রম দেখে উল্লসিত হলেন। যখন থেকে এঁরা পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ হিশেবে হস্তিনাপুরে এসেছেন, তখন থেকে এঁদের নামে তিনি অনেক গুজব শুনেছেন। কৌতূহল ছিলো। এখন বীরত্ব দেখে মুগ্ধ হলেন এবং বন্ধুতা হতে দেরি হলো না।

মহাভারত নামের গ্রন্থটির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী কিঞ্চিৎ অবহিত হয়ে পাঠ করলে সহজেই বোঝা যায় সবাই কোনো না কোনো উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত কর্ম করে যাচ্ছেন। সত্যবতী থেকে তার শুরু। এখন কৃষ্ণতে এসে শেষ হলো। অর্থাৎ সাতটি নদী কৃষ্ণরূপ সমুদ্রে এসে মিলিত হলো। সেই নদী ক'টি সবই অনার্য অবৈধ পুত্রের সমষ্টি। প্রথমে সত্যবতীর পুত্র ব্যাসদেব, তারপর তাঁর অবৈধ পুত্র বিদুর, বিদুরের অবৈধ পুত্র যুধিষ্টির, আর চারটি ভ্রাতা ভীম অর্জুন নকুল সহদেব, যাদেরও কোনো পিতৃপরিচয় নেই।

দ্রুপদ রাজাও যে আর্য হয়ে অনার্য রীতি মেনে নিয়ে কন্যাকে পাঁচটি ভ্রাতার হস্তে পাণিরত করলেন, তা-ও নিজেকে আরো শক্তিশালী করে অন্য কোনো আক্রমণ স্তব্ধ করার উদ্দেশ্যে। পাণ্ডুরাজার ক্ষেত্রজ নাম দিয়ে যে পাঁচটি পাণ্ডব এসে উপস্থিত হলো, তা-ও রাজ্যপ্রাপ্তির আশায়। আর কৃষ্ণ এলেন জরাসন্ধের ভয়ে দ্বারকাপুরীতে লুকিয়ে পালিয়ে থাকা জীবন থেকে এদের সাহায্যে বেরিয়ে আসতে। কৃষ্ণ দুটি মানুষকে ভয় পেতেন, একজন জরাসন্ধ, একজন শিশুপাল। এই দুজন শক্তিশালী রাজা তাঁর বুজরুকিতে বিশ্বাস করতেন না।

স্বীয় উদ্দেশ্যসাধন হলেও, সত্যবতী শান্তনুনন্দন দেবব্রতকে সোজাসুজিই তাঁর শর্ত পালনে সম্মত করিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু বাকি অন্যান্যদের ভূমিকার মধ্যে পাঁচটি বহিরাগত পুত্র, তাদের মাতা কুন্তী, এবং যুধিষ্ঠিরের পিতা বিদুর, রাজত্ব পাবার আশায় এমন কোনো গূঢ় অপরাধ নেই জগতে, যা তাঁরা করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েছেন। তারপরে   যে অন্যায় এবং নৃশংসতার লীলা শুরু হলো সেটা যুদ্ধের শেষদিন পর্যন্ত অদমিত রইলো।

প্রথম লীলাটি হলো দ্রৌপদীর প্রকৃত স্বামী অর্জুন হলেও তাঁকে বিবাহ করতে হলো পাঁচজনকেই। স্বয়ংবর সভায় মাল্যদান মানেই বিবাহ। পাণিপ্রার্থীদের মধ্যে পাত্রী যাঁকে মাল্যদান করবেন তিনিই হবেন তাঁর পতি। মাল্যদান করেই শকুন্তলা দুষ্মন্তকে বিবাহ করেছিলেন। মাল্যদান করেই কুন্তী পাণ্ডুর পত্নী হয়েছিলেন। বেচারা দ্রৌপদী! যাঁকে মাল্যদান করলেন, তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতাও যে একজন মস্ত দাবিদার হয়ে তাঁর শয্যায় এসে উপস্থিত হবেন, তা কি তিনি স্বপ্নেও ভেবেছিলেন কখনো! আর্যকুলের বিবাহে এই রীতি কখনই সম্ভব নয়।

দ্রৌপদীকে জয় করে, যেখানে পাণ্ডবরা আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে আনন্দিত স্বরে বললেন, 'মাতঃ, অদ্য এক রমণীয় পদার্থ ভিক্ষালব্ধ হইয়াছে।'

কুন্তী গৃহাভ্যন্তরে ছিলেন, বললেন, ‘সকলে সমবেত হয়ে ভোগ করো।’ তারপরই দ্রৌপদীকে নিরীক্ষণ করে বললেন, ‘এ আমি কী বললাম!’ ধর্মভয়ে যেন কতো চিন্তাকুল এমন ভাব করে দ্রৌপদীর হস্তধারণপূর্বক যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করে বললেন, ‘পুত্র, তোমার অনুজরা দ্রুপদনন্দিনীকে এনে ভিক্ষা বলে আমার নিকট উপস্থিত করলো, আমিও অনবধানতা-প্রযুক্ত হয়ে বললাম, ‘‘তোমরা সকলে সমবেত হয়ে ভোগ করো।’’ এখন তুমি দ্যাখো, আমার বাক্য যেন মিথ্যা না হয়।’

এসব কথার সমস্তটাই কৃত্রিম, সমস্তটাই বানানো। তা ব্যতীত, মুখনিঃসৃত সমস্ত ভাষ্যই বাণী নয়। যাকে প্রকৃত অনৃতভাষণ বলে, কুন্তীর এই অন্যমনস্ক অনুমতি তার মধ্যে পড়ে না। তাছাড়া, কুন্তী কোনো মহর্ষি মহাযোগীও নন যে মুখের কথা ফেরৎ নিতে পারেন না।

পুত্রগণ বলেছেন, ‘এক রমণীয় পদার্থ এনেছি’। মানুষ কখনো পদার্থ হয় না। যারা অমানুষ তাদের অপদার্থ বলা গেলেও মানুষকে কোনো অর্থে পদার্থ হিশেবে ধরা হয় না। পদার্থের অর্থ দ্রব্য, বস্তু, জিনিশ। দ্রৌপদী যখন একজন মানুষ, তিনি নিশ্চয়ই দ্রব্য, বস্তু, জিনিশ নন সেক্ষেত্রে যখন কুন্তী ‘পদার্থ’ কে ভোগ করতে বলেছেন, এবং পরে একজন মানুষকে দেখেছেন, সেখানে তো তাঁর এই বাক্যকে কোনো অর্থেই অনৃতভাষণ বলা যায় না। বলা যায় ‘আমি ভেবেছিলাম কোনো ভালো জিনিশ পেয়েছো।’ পরন্তু, তিনি কী করে জানলেন এই কন্যা দ্রুপদনন্দিনী? যুধিষ্ঠিরকে বলছেন, ‘পুত্র, ইনি রাজা দ্রুপদের নন্দিনী। কিন্তু আমি বলেছি তোমরা সকলে মিলে ভোগ করো। অতএব, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! এখানে যাতে আমার বাক্য মিথ্যা না হয় এবং অধর্ম দ্রুপদকুমারীকে স্পর্শ না করে এমন উপায় বিধান করো।’

কুন্তী খুব ভালোভাবেই জানতেন তাঁর পুত্রগণ ব্যাসদেবের নির্দেশে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় গিয়েছেন। যদি কিছু নিয়ে আসেন তবে যে দ্রৌপদীকে জয় করেই ফিরবেন, তা-ও তাঁর অজ্ঞাত ছিলো না। সত্যরক্ষার দোহাই তা-ও তাঁর অজ্ঞাত ছিলো না। সত্যরক্ষার দোহাই দিয়ে কুন্তী যা করতে চাইছেন তার অর্থটা পরমুহূর্তেই বোধগম্য হলো। যে বীরত্বের শর্তে মহারাজা দ্রুপদকন্যাকে সম্প্রদান করবেন, সে বীরত্ব কার আছে তা-ও তিনি জানেন। এবং দ্রুপদরাজা যে অর্জুনকে জামাতারূপে পেতে উৎসুক তা-ও জানেন। কিন্তু অর্জুনকে জামাতা করলে তো হবে না, যুধিষ্ঠিরকেই করতে হবে। যুধিষ্ঠিরের জন্যই তো এতো কাণ্ড। কোনো শক্তিশালী রাজার সাহায্য পাবার জন্যই তো অজ্ঞাতবাসের আয়োজন। সুতরাং জামাতা হতে গেলে যুধিষ্ঠিরকেই হতে হবে। যুধিষ্ঠির সিহাংসনে বসবেন, সেটাই বিদুর, কুন্তী এবং দ্বৈপায়নের একমাত্র উদ্দেশ্য। আসলে তিনি এতোক্ষণ অবশ্যই অতি উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করছিলেন খবরটির জন্য। তারপর, যেন না জেনেই ছেলেদের উপভোগ করতে বলেছেন বলে অচিন্তনীয় চিন্তায় একেবারে অথৈ পাথারে পড়ে গেলেন। অস্থির না হলে তাঁর বাক্যের সত্যতা নিয়ে

লড়াই করবেন কি উপায়ে?

কিন্তু এক কন্যাকে পাঁচজন পুরুষ কী করে ভোগ করবেন, গণ্ডগোল বাধলো সেটা নিয়েই। দ্রৌপদীর পিতা হতবাক হলেন। তিনি বলেছিলেন 'অদ্য শুভ দিবস, অতএব অর্জুন আভ্যুদয়িক ক্রিয়ান্তে দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করুন।'

উত্তরে যুধিষ্ঠির বললেন, 'রাজন! আমারও দারসম্বন্ধ কর্তব্য হইয়াছে। পূর্বে জননী অনুমতি করিয়াছেন যে দ্রৌপদী আমাদিগের সকলেরই মহিষী হইবেন। আমি অদ্যাপি দারপরিগ্রহ করি নাই এবং ভীমও অকৃতবিবাহ। অর্জুন আপনার কন্যারত্ন জয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমাদিগের ভ্রাতৃগণের মধ্যে নিয়ম আছে যে, যে কোনো উৎকৃষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হইলে আমরা তাহা সকলে একত্র ভোগ করিয়া থাকি।'

দ্রৌপদী কি সত্যিই বস্তু? তাঁর কি মন প্রাণ বলে কিছু নেই? তিনি কি মানবকন্যা নন? ইচ্ছে হোক না হোক, শ্রদ্ধা করুন বা না-ই করুন, ভালোবাসুন আর না-ই বাসুন, যে কোনো পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হতে পারেন তিনি? তাঁর মতামতের কি মূল্য নেই? তিনি যাঁকে মনোনীত করেছেন, তাঁর গলদেশেই মাল্যদান করেছেন। পূর্বকালের নিয়মমতো সেটাই বিবাহ। যজ্ঞসেন বিস্ময়ে তাকিয়ে যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রুতিগোচর করছিলেন। যুধিষ্ঠির গোঁ ধরে তাঁর বাক্য সমাপন করলেন, 'অতএব আমরা কোনোক্রমেই চির-আচরিত নিয়ম লঙ্ঘন করতে পারবো না। অগ্নিসাক্ষী করে আমাদের সঙ্গে জ্যেষ্ঠাদিক্রমে তনয়ার পরিণয় ক্রিয়া সম্পাদিত করুন।'

যজ্ঞসেন বিস্ময়ের সীমান্তে পৌঁছে বললেন, 'এক পুরুষের বহুপত্নী বিহিত আছে বটে, কিন্তু এক স্ত্রীর অনেক পতি এ তো আমি কখনই শুনিনি। আপনার এ রকম কথা বলা অনুচিত।'

প্রত্যুত্তরে যুধিষ্ঠির বললেন, 'পূর্বপুরুষদিগের আচরিত পদ্ধতিক্রমেই আমরা চলে থাকি।'

যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য যদি সত্য হয়, তবে তো তিনি পাণ্ডুরাজের ক্ষেত্রজ হতেই পারেন না। রাজা শান্তনুর কোনো বংশধরই এই আদিম নিয়মের অধীন নয়। যেহেতু পাণ্ডু স্বয়ংবর সভায় গিয়ে কুন্তীকে বিবাহ করেছিলেন, ভীষ্ম সেই বিবাহও তাঁদের বংশের নিয়ম অনুযায়ী হয়নি বলে আবার বিবাহ দিলেন মাদ্রীর সঙ্গে। তাঁদের নিয়ম কন্যাকে স্বীয়গৃহে আনয়ন করে বিবাহ দেওয়া। এখানে অর্জুন অবশ্য কন্যাকে স্বীয় গৃহেই আনয়ন করেছিলেন, এবং দ্রৌপদী তাঁর কণ্ঠেই মাল্যদান করেছিলেন। এখন কেবল অনুষ্ঠানটাই বাকি। অর্জুন যুধিষ্ঠিরের বয়োকনিষ্ঠ ভ্রাতা, তাঁর স্ত্রীকে তিনি কী হিশেবে বিবাহ করবেন? তাঁর সঙ্গে তো সম্পর্ক স্থাপিতই হয়ে গেছে। ধৃতরাষ্ট্র কখনো কুন্তীকে বিবাহের কথা ভাবতে পারতেন, যখন পাণ্ডুকে মাল্যদান করে কুন্তী কুরুগৃহে প্রবেশ করলেন? দ্রুপদ রাজার পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নও ঠিক তাই বললেন, 'জ্যেষ্ঠ, সুশীল ও সদাচারসম্পন্ন হয়ে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্যায় কেমন করে গমন করবেন? ধর্ম অতি সূক্ষ্ম পদার্থ।

ধর্মের গতি আমরা কিছু জানি না। সুতরাং ধর্মাধর্মের নিশ্চয় করা আমাদের অসাধ্য। অতএব কৃষ্ণা যে পঞ্চস্বামীর মহিষী হবে সেটা আমরা কখনই ধর্মত অনুমোদন করতে পারি না।'

এই সময়ে যথানিয়মে ব্যাসদেবের আগমন। তাঁকে দেখে দ্রুপদ বললেন 'একা দ্রৌপদী কী করে অনেকের ধর্মপত্নী হবে, অথচ সঙ্কর হবে না, এটা কেমন করে ঘটতে পারে? হে দ্বিজোত্তম! এক স্ত্রী বহু পুরুষের পত্নী, এ তো কখনো দেখিনি। এমন কী মহাত্মা প্রাচীন পুরুষদিগেরও আচরিত ধর্ম নয়।'

ব্যাসদেব বললেন, 'হে পাঞ্চাল! আমি এর নিগূঢ় তত্ত্ব সর্বসমক্ষে ব্যক্ত করবো না।' এ বলে তিনি গাত্রোত্থান করে দ্রুপদের করগ্রহণপূর্বক রাজভবনে প্রবেশ করলেন। তারপরে প্রকাশ্যে কয়েকটা রূপকথা শোনালেন। যা মহাভারতের, তথা ব্যাসদেবের, স্বার্থসিদ্ধির একমাত্র অস্ত্র ও উপায়। তা থেকে জানা গেল, পূর্বজন্মে দ্রৌপদী মহাদেবের (এখানে আবার একজন মহাদেবের সৃষ্টি করেছেন, যিনি একমাত্র অনার্যদেরই তৈরি করা আরাধ্য দেবতা) নিকট নাকি পাঁচবার একই বর প্রার্থনা করেছিলেন, তিনি যেন সর্বগুণসম্পন্ন পতি লাভ করেন। তখন মহাদেব তাঁকে অভিলষিত বরদানপূর্বক বললেন, 'ভদ্রে! তোমার পাঁচজন স্বামী হবেন।' পূর্বজন্মে দ্রৌপদী ঋষিকন্যা ছিলেন, সেই ঋষিকন্যা বলেন, 'আমি এক পতি প্রার্থনা করি।' মহাদেব বললেন, 'তুমি উপর্যুপরি পাঁচবার পতি প্রার্থনা করেছ। অতএব জন্মান্তরে তোমার পঞ্চস্বামী হবে।'

রূপকথা শেষ করে ব্যাসদেব বললেন, 'দ্রৌপদী স্বর্গলক্ষ্মী, পাণ্ডবগণের নিমিত্ত আপনার যজ্ঞে সমুৎপন্ন হয়েছেন। এই সর্বাঙ্গসুন্দরী দেবদুর্লভা দেবী স্বকীয় কর্মফলে পঞ্চপাণ্ডবের সহধর্মিণী হবেন।' প্রথমে রাজঅন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হয়ে ব্যাসদেব দ্রুপদকে কী নিগূঢ় তত্ত্ব গোপনে বুঝিয়েছিলেন জানি না, পরে পূর্বজন্মের এই রূপকথাটি বলে শেষ করলেন বাক্য।

কিন্তু দ্রৌপদী? দ্রৌপদী কী করে রাজি হলেন? অত বড় একটা মহতী জনসভায় যিনি উচ্চকণ্ঠে বলে উঠতে পারলেন, 'সূতপুত্রকে আমি বিবাহ করবো না', যেখানে তাঁর পিতা ভ্রাতা দুজনেই পুনঃপুন ঘোষণা করেছেন এই স্বয়ংবর সভায় জাতমানকুল কিছু নেই, বীরত্বই প্রধান, যেখানে বিদ্যায় বুদ্ধিতে রূপে গুণে শ্রেষ্ঠ এক বীরকে তিনি পিতা ভ্রাতার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করে, অসম্মান করে, ধুলোয় লুটিয়ে দিলেন, এবং অন্য এক বীরকে স্বামীরূপে নির্বাচিত করে মাল্যদান করলেন, সেখানে কী করে তিনি তাঁর স্বামীর জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠের শয্যাসঙ্গিনী হতে রাজি হলেন? কী করে সেটা সম্ভব হলো? বিবাহের আসরে বসে পরপর পাঁচজন ভ্রাতাকেই স্বামীরূপে গ্রহণ করতে তাঁর মনে কি কোনো বেদনা জাগলো না? অসম্মান জাগলো না? লজ্জাবোধ এলো না? তাঁর বিবেকের কাছে কি তাঁর কোনো কৈফিয়ৎ নেই? মহাভারত বলে তিনি অতি তেজস্বিনী নারী, সেই তেজ তখন তাঁর কোথায় গেলো? তিনি কি জানেন না স্বয়ংবর সভায় কন্যা যাঁর

কণ্ঠে মাল্যদান করেন শুধু তিনিই হন তাঁর পতি? কেন তিনি অন্য পুরুষ গ্রহণ করতে কোনো প্রতিবাদ জানালেন না? আর তাঁর নির্বাচিত পতিকে তিনি কবে পেলেন? যখন তাঁর প্রেম এক বছর ধরে তাঁর স্বামীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠিরই ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছেন। তারপর ভীমের কাছে গেছে সেই দেহ। নারীদেহ তো নয়, যেন খেলার বল। একের কাছ থেকে অপরের কাছে। তার মধ্যে অর্জুনের বারো বছরের জন্য নির্বাসনও হয়ে গেলো।

এই উপাখ্যান এখন যেখানে এসে পৌঁছেছে সেখান থেকে যুদ্ধের ময়দান খুব দূরে নয়। কিন্তু কেন এতদূর এলো? কে তার জন্য দায়ী? এই বহিরাগত পঞ্চপাণ্ডব নামধারী মানুষ ক'টি পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ হিশেবেই গণ্য হয়ে, রাজপুত্রদের সঙ্গেই শিক্ষাদীক্ষা সহবতে মিলিত হয়েছিলো। তার মধ্যে যদি বিদুরের প্রবেশ না ঘটতো, তা হলে হয়তো বা তারা কুরুকুলের ভ্রাতা হয়েই মিলেমিশে থাকতে পারতো। যার মনে যে সন্দেহই থাক, আস্তে আস্তে মুছে যেতো সেটা। বিদুর তো সেজন্য তাদের নিয়ে আসেননি এখানে। এনেছেন পুত্রকে একচ্ছত্র সাম্রাজের অধিপতি করতে। প্রথমেই ঘোষণা করলেন দুর্যোধন সাম্রাজ্যের ভাগ দেবার ভয়ে ওদের সঙ্গে শক্রুতা করছে। একজন প্রতিপক্ষ দাঁড় করাতে না পারলে বৈপরীত্যের সৃষ্টি হয় না। যেখানে বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে ব্যাপার, সেখানে দুর্যোধনকে সহজেই শক্রুপক্ষ হিশাবে বিশ্বাস করানো, এক্ষেত্রে, এই পরিবেশে, খুবই সহজ। সুতরাং, অপপ্রচার জনগণের মনে ধরানোর কার্যটি বিদুর খুব ভালোভাবেই সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন। তথাপি, পুরবাসীদের অনেকের মনই কুন্তীর এই পঞ্চপুত্র বিষয়ে নিঃসংশয় ছিলো না। তার পরিচয় পাওয়া গেলো কৃত্রিম যুদ্ধের দিন, যখন দুর্যোধন বললেন, 'তোমাদের কী ভাবে জন্ম তা-ও কিন্তু আমরা জানি।' তখন কেউ তার জবাব দিতে সক্ষম হলেন না। পঞ্চভ্রাতাও নয়, বিদুরও নন, গুরুজনেরাও নিঃশব্দ।

ঘটনাগুলো অনুধাবন করলে এখানেও অনেকগুলো বিষয়, যেমন, মহারাজা শান্তনুর মৃত্যুর পরে বিমাতার প্রতি দেবব্রতের কার্যকারণহীন আনুগত্য, দ্বৈপায়নের দ্বারা দাসীর গর্ভে বিদুরের জন্ম, দুর্যোধন জন্মানোমাত্রই বিদুরের তাকে হত্যা করবার প্রয়াস, স্বীয় অবৈধ পুত্র যুধিষ্ঠিরকে পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ প্রমাণ করবার জন্য কুন্তীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে পাণ্ডুকে ও মাদ্রীকে নিহত করা, পুত্রদের অজ্ঞাতবাসে পাঠিয়ে কোনো ক্ষমতাশালী নির্দিষ্ট রাজার সঙ্গে সম্পর্ক পাতাবার চেষ্টা, বারণাবতে নিজেরা আগুন লাগিয়ে অতোগুলো মানুষকে পুড়িয়ে ধৃতরাষ্ট্র আর তাঁর পুত্র দুর্যোধনের নামে চালাবার মিথ্যাচার, একজন কৃতবিদ্য প্রযুক্তিবিদ পাঠিয়ে বিদুরের পাতাল পথ রচনা, সেই পথে হেঁটে দূরবর্তী অন্য এক লোকালয়ে গিয়ে উঠে মাতাসহ পঞ্চপাণ্ডবের আকাশের তলায় দাঁড়ানো এবং অপেক্ষমান পথপ্রদর্শকের সঙ্গে গিয়ে বিদুরের পাঠানো যন্ত্রযুক্ত নৌকায় আরোহণ, অপর তীরে অবরোহণ করে আবার নির্দিষ্টভাবে দক্ষিণ দিকে গমন, চলতে চলতে নির্দিষ্ট স্থানে ব্যাসদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ, ব্যাসদেবের নির্দেশে প্রথম একমাস

একচক্রা নগরে-অবস্থান, তারপরে পুনরায় একমাস পরে ব্যাসদেবের আগমন এবং পাঞ্চাল নগরে ব্রাহ্মণের বেশে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় গিয়ে অর্জুনের বীরত্বে দ্রৌপদী লাভ, কুন্তীর চালাকিতে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে বিবাহ দেবার ধূর্ততা—ষড়যন্ত্র এবং হঠকারিতার নিদর্শন ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু এতোগুলো হঠকারিতার মধ্যে দুর্যোধন কোথায়? অথচ বিবিধ অসাধু কর্মের দায় দুর্যোধনের নামেই চালানো হলো। পড়তে পড়তে দুর্যোধনের জন্য বেদনা অনুভব করাই তো স্বাভাবিক। দুর্যোধনের মুখনিঃসৃত যে দুটি বাক্য লিখিত হয়েছে, তা ঐ কৃত্রিম যুদ্ধের আসরে। ভীমের নিম্নশ্রেণীর কলহদীর্ণ ভাষার জবাবে জানানো, 'হে ভীম! কর্ণকে এভাবে বলা তোমার উচিত নয়।' আর বিদুরের প্রচারে যুধিষ্ঠির একেবারে ক্ষমতার তুঙ্গে উঠে তাদের পরাজিত করে সিংহাসন দখল করবার মতো ক্ষমতাশীল হয়ে উঠেছেন শুনে ভীত হয়ে পিতাকে বলা, 'ওদের যদি কিছুদিনের জন্য অন্যত্র কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে ঐ সময়ের মধ্যে আসন্ন বিপদের হাত থেকে উদ্ধার পাবার একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে।' বিদুর-কুন্তীসহ এই পাঁচটি ভ্রাতার বিবেকহীন, অসাধু এবং লুব্ধ ব্যবহারের পরিবর্তে দুর্যোধনের সৌজন্য এবং ধৈর্য বরং অনুকরণযোগ্য বলেই মনে হওয়া উচিত।

সত্যবতী যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রাসাদের সর্বময়ী কর্ত্রী হয়ে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন, এবং যে উদ্দেশ্য সাধন করতে শান্তনুর একমাত্র পুত্র দেবব্রতকে চিরকুমার ব্রহ্মচারী থাকতে বাধ্য করেছিলেন, সেই সংকল্প সাধন করলেন তাঁর নিজের পুত্র বিচিত্রবীর্যের বিধবা পত্নীদ্বয়ের গর্ভে তাঁর অবিবাহিত কালের সন্তান দ্বৈপায়নের দ্বারা সন্তান উৎপাদন করিয়ে। তদ্ব্যতীত, বিদুরকে পর্যাপ্ত প্রশ্রয় দিয়ে এমন একটা স্তরে উত্তোলিত করে রেখে বনগমন করলেন যেখান থেকে তাঁর স্খলনের আর কোন সম্ভাবনা রইলো না। আর বিদুরপুত্র যুধিষ্ঠিরের অনার্য অবৈধ রক্ত এতো পরিশ্রুত হলো যে শান্তনুর আদি বংশের ক্ষত্রিয় রক্ত আর এক কণাও অবশিষ্ট থাকলো না। বৈরানল তখনি প্রজ্জ্বলিত হলো। যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো। এই যুদ্ধও সত্যবতীরই অবদান। শান্তনুর প্রাসাদে দ্বৈপায়নের প্রবেশ না ঘটলে বিদুর জন্মাতো না, বিদুর না জন্মালে যুধিষ্ঠিরও জন্মাতো না, যুধিষ্ঠির না জন্মালে রাজত্ব নিয়ে এই প্রমাদও উপস্থিত হতো না।

দ্বিতীয়পর্ব

১

এর পরবর্তী আখ্যানটি আরম্ভ করতে হচ্ছে অতি ক্ষমতাশীল রাজা দ্রুপদের অন্তঃপুর থেকে, যে অন্তঃপুরে তিনি যজ্ঞ থেকে উত্থিতা একমাত্র কন্যাকে পাঁচটি ভ্রাতার পাণিস্থ করেছেন এবং ভেবেছেন আমার তুল্য বলশালী রাজা আর কেউ থাকলো না এ জগতে। সেই সময়ে একটি পত্নী নিয়ে পাঁচটি ভ্রাতাও দ্রুপদের অন্তঃপুরে যথেষ্ট আহ্লাদের সঙ্গে দিনযাপন করছিলেন। তবে তাঁদের পত্নীর মন সেই আহ্লাদের সঙ্গে কতোটা যুক্ত ছিল সে কথা কেউ ভাবেননি। তাঁর নিজের প্রেমিক, যাঁকে সত্যিই তিনি নিজের নির্বাচিত স্বামী হিশেবে গ্রহণ করেছিলেন, সেই অর্জুনকে তখনো পাননি তিনি, তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই ভোগ করছিলেন কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূকে। যার যার স্বার্থসিদ্ধির কারণে সকলেই তাঁকে বলিদানের পাঁঠা হিশেবে ব্যবহার করছিলেন। স্বয়ং ব্যাসদেবই যুধিষ্ঠিরের জন্য সমাজবিরোধী এই কর্মটি করতে নানান ছলে বলে কৌশলে দ্রুপদরাজা আর তার পুত্রকে প্রভাবিত করলেন। অর্জুনকে মাল্যদান করবেন বলেই, পিতা-ভ্রাতার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করে দ্রৌপদী চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, 'আমি সূতপুত্রকে বিবাহ করবো না।' অর্জুন বিষয়ে দ্রৌপদীর মনে নিশ্চয়ই অনেক স্বপ্ন ছিলো, পিতা-ভ্রাতার ঘোষণা লঙ্ঘন করে বরণও করলেন তাঁকে, কিন্তু রাজনীতির যূপকাষ্ঠে সেইসব স্বপ্নের কোনো ঠাঁই নেই। যে পিতা-ভ্রাতা তাঁদের আদেশ লঙ্ঘন করে কর্ণকে অসম্মান করার জন্য বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না, যেহেতু তাঁদের নির্বাচিত জামাতা অজুর্নই ছিলেন, সেই পিতা-ভ্রাতাই ব্যাসদেবের পরামর্শে যে আজ্ঞা পালনে বাধ্য করলেন কন্যাকে, সেই বাধ্যতা রক্ষা করা আর মৃত্যু, দুই-ই হয়তো তখন সমতুল্য মনে হয়েছিলো দ্রৌপদীর। তাঁর শ্বশ্রূমাতা কুন্তী স্বেচ্ছায় পাঁচটি পুরুষের অঙ্কশায়িনী হয়েছিলেন। কিন্তু দ্রৌপদীর মতো একটি অনাহত শুদ্ধ চরিত্রের কন্যা পতি হিশাবে অর্জুনকে মাল্যদান করে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শয্যায় যেতে যে নিজেকে অতিমাত্রায় কলুষিত লাঞ্ছিত বঞ্চিত মনে করেননি তা কি হতে পারে? কুন্তী তাঁকে পদার্থ বললেও সত্যি তো তিনি পদার্থ নন। অর্জুন বস্তুতই আকর্ষণীয় পুরুষ। বীরত্বেও কর্ণ ব্যতীত আর কেউ তাঁর সমতুল্য আছেন কিনা সন্দেহ। সেই ইপ্সিত প্রেম ও বাসনা নিয়ে যখন তাঁর হৃদয় থরোথরো তখনই যেতে হলো অর্জুনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের শয্যায়। স্বীয় উপভোগান্তে যুধিষ্ঠির সেই 'পদার্থ' নামের দেহটা পাঠিয়ে দিলেন ভীমের শয্যায়। ইতিমধ্যে অর্জুনের নির্বাসনও হয়ে গেল বারো বছরের জন্য, যেহেতু, যুধিষ্ঠির যখন দ্রৌপদীর সঙ্গে ছিলেন তখন নিয়মবিরুদ্ধভাবে কোনো অনিবার্য কারণে অর্জুনকে সেই ঘরে ঢুকতে হয়েছিলো। কে জানে কতো নিঝুম রাতের অন্ধকারে চোখের জলে ভেসে গেছে দ্রৌপদীর হৃদয়ের সব স্বপ্ন।

তার উপরে অর্জুনকে এই নির্বাসন! এই নির্বাসন মেনে নিতে অর্জুনেরও কি কোনো কষ্ট হয়নি? হয়েছে। তিনি ইচ্ছাক্রমে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ঘরে যাননি। কোনো মানবিক কারণে একজনকে রক্ষা করা নিতান্তই প্রয়োজন ছিলো বলে গিয়েছিলেন। অবশ্য অর্জুনের নির্বাসন বা দ্রৌপদীর অর্জুনকে না পাওয়া নিয়ে ব্যাসদেব একটি লাইনও লিখে সময় নষ্ট করেননি। এটা ধরেই নিতে বলেছেন, কুন্তীর আদেশ পূর্ণ না করলে কুন্তীকে অনৃতভাষণের দায়ে পড়তে হয়, এবং পূর্বজন্মে দ্রৌপদী পাঁচবার বর চেয়ে এ জন্মে পঞ্চপতির পত্নী হয়েছেন।

এদিকে বিদুর যেই জানলেন দুর্যোধন আর কর্ণ সেই স্বয়ংবর সভা থেকে হতদর্প হয়ে প্রত্যাবৃত হয়েছেন, আনন্দ আর ধরে না। ধৃতরাষ্ট্রকে দুঃখ ও হতাশায় জর্জরিত করতে তখুনি ছুটলেন খবর দিতে। গিয়ে ভালোমানুষের মতো বললেন, 'মহারাজ! ভাগ্যবলে কৌরবেরাই জয়ী হয়ে ফিরেছেন।' সংবাদ শুনে ধৃতরাষ্ট্র পরম সন্তুষ্ট হয়ে বলতে লাগলেন, 'বিদুর, তুমি আজ আমাকে কী শুভ সমাচারই না প্রদান করলে।' আসলে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে অতিমাত্রায় জব্দ করবার মানসেই 'কৌরবেরা' বলেছিলেন। বিদুরের জালে মাছের মতো আবদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র সেই 'কৌরবেরা' শুনে মনে করলেন তাঁর পুত্র দুর্যোধনই জয়ী হয়েছে। চতুর বিদুর এই অন্ধ অনুগত রাজাটিকে নিয়ে কতো খেলাই না করেছেন। ধৃতরাষ্ট্র উৎসাহিত এবং উত্তেজিত হয়ে আজ্ঞা প্রদান করলেন, যেন দুর্যোধন দ্রৌপদীকে বহুবিধ ভূষণে ভূষিত করে তাঁর সম্মুখে আনয়ন করেন।

অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের জালে ধরা দিলেন। ছটফটে মাছের মতোই আনন্দ ও উত্তেজনায় অস্থির হয়ে গেলেন। এই সময় বিদুর বললেন, 'মহারাজ! বরমাল্য পাণ্ডবেরাই প্রাপ্ত হয়েছেন।' ভয় দেখাবার জন্য বললেন, 'সেই স্বয়ংবর প্রদেশে তুল্যবলশালী অনেকানেক বন্ধুবান্ধব এসে তাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন।'

ধৃতরাষ্ট্র যতোটা ভেঙে পড়বেন বলে ভেবেছিলেন, ঠিক সেই রকম কোনো প্রতিক্রিয়া তাঁর হলো না। বরং বললেন, 'দ্রুপদের সঙ্গে মিত্রতা করে কোন ক্ষত্রিয় কৃতকার্য হতে বাসনা করে না? আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হচ্ছে যে আমার দুরাত্মা পুত্রদিগের আর নিস্তার নেই।'

অনন্তর, দুর্যোধন এবং কর্ণ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আগমনপূর্বক নিবেদন করলেন, 'তাত, বিদুরের সন্নিধানে আমরা কোনো প্রকার দোষ কীর্তন করতে পারবো না, এ আপনার কীদৃশ ইচ্ছা? বিপক্ষের বুদ্ধি আপন বুদ্ধি বলে মনে করছেন। বিদুরের নিকট সপত্নদের স্তুতিবাদ করছেন। এবং কর্তব্য কর্মে মনোযোগ দিচ্ছেন না। হে তাত! শত্রুদিগের বল বিঘাত করা সর্বতোভাবে কর্তব্য হয়েছে। এখন আমাদের এমন একটি মন্ত্রণা করা আবশ্যক যাতে তারা আমাদের সর্বস্ব গ্রাস করতে না পারে। যেন আপনাকে উচ্ছেদ না করে।'

এরপরে একটি মন্ত্রণা সভা বসলো। ভীষ্ম দ্রোণ ইত্যাদির সমতুল্য বোধে ধৃতরাষ্ট্র সেই মন্ত্রণা সভায় বিদুরকেও আমন্ত্রণ না করে পারলেন না। ভীষ্ম দুর্যোধনকে বললেন, 'পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করা আমার অনভিমত। যেমন তুমি ধর্মত রাজ্যলাভ করেছো, তাঁরাও ইতিপূর্বে সে রকম রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অতএব বিবাদে প্রয়োজন নেই, সৌহার্দ্যপূর্বক তাদের রাজ্যার্ধ প্রদান করলেই উভয়পক্ষের মঙ্গল।'

বিদুর বললেন, 'মহারাজ! পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে রণে সহ্য করে এমন লোক ত্রিজগতে লক্ষ্য হয় না। যে মহতী অকীর্তি লোকবিদিত হয়েছে, সেটা স্খলন করুন। আমি তো আপনাকে পূর্বেই বলেছি দুর্যোধনের অপরাধে এই সুবিস্তীর্ণ রাজবংশ উচ্ছিন্ন হবে।'

আমরা পাঠকরা এ-কথাটা অবশ্যই বলতে পারি, দুর্যোধনের জন্যই বিদুর নামক পাপিষ্ঠটি অন্ধ দুর্বল ধৃতরাষ্ট্র নামের রাজাটিকে, এবং তাঁর রাজ্যটিকে, খুব সহজে গ্রাস করতে পারছিলেন না। কেননা রাজা হিশাবে দুর্যোধন প্রকৃতই একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তাঁকে হটানো যে সহজ নয় সে বুদ্ধিটুকু বিদুরের ছিলো। প্রকৃতপক্ষে, দুর্যোধন তাঁর রাজ্য স্বীয় বুদ্ধিতে স্বীয় চেষ্টায় অনেক বাড়িয়ে ফেলেছিলেন। রাজন্যবর্গের মধ্যে তিনি অত্যন্ত সম্মানিত রাজা। বিদুরের জীবনে দুর্যোধন এজন্যই সবচেয়ে বড় শত্রু। এই শত্রুর জন্যই তিনি যা চান সেটা সহজে করতে পারেন না। সেই কারণেই দুর্যোধনের প্রতি তাঁর ক্রোধ তাঁকে মুহূর্তের জন্যও শান্তিতে জীবনধারণ করতে দিচ্ছিলো না। বিদুরকে সবাই ধর্ম বলে জানে, বিদুর যখন যা বলেন এবং করেন সেটা ন্যায্য বলে সকলে ভাবতে অভ্যস্ত। মাঝখান থেকে এই দুর্যোধনই তাঁকে চুড়ান্ত অবিশ্বাসী জেনে অত্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখেন।

শেষ সিদ্ধান্তে ভীষ্মও যা বললেন, দ্রোণও তাই বললেন। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, 'হে বিদুর। তা হলে তুমি যাও। সৎকার প্রদর্শন পূর্বক কুন্তী ও দ্রৌপদী সমভিব্যাহারে পাণ্ডবদের আনয়ন করো।'

সবচেয়ে আশ্চর্য, এই সভায় কিন্তু এরকম কোনো কথাই কেউ বললেন না, যে এক কন্যাকে পাঁচটি পুরুষ যেখানে বিবাহ করেছে, সেই বিবাহ সঙ্গত বলে আমরা মানি না। অন্তত ভীষ্মের বলা উচিত ছিলো। তিনি তো ভয় পাবার পাত্র নন। দ্রুপদরাজ যতোই বলশালী রাজা হোন না কেন, ভীষ্ম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলে সে বল নিমেষেই দুর্বল হয়ে যাবে। এই ভীষ্মই পাণ্ডুকে দ্বিতীয়বার বিবাহ দিয়েছিলেন, যেহেতু তিনি স্বয়ংবর সভায় কুন্তীর মাল্যদান গ্রহণ করে বিবাহিত হয়ে এসেছিলেন। ভীষ্মের বংশ এই বিবাহকে শুদ্ধ বিবাহ বলে গণ্য করে না। কন্যাকে স্বভবনে এনে অনুষ্ঠান করতে হয়। বংশের মাত্র এইটুকু নিয়মের ব্যতিক্রমেই যিনি অতো বিচলিত হয়েছিলেন, এই বিবাহ তো তাঁর বিবাহ বলেই বোধ হওয়া সম্ভব নয়। তাঁদের পূর্বপুরুষেরা কখনো এক কন্যার পঞ্চপতি ধর্মসংগত বিবাহ হিশেবে ধার্য করেছেন তার কোনো নজির নেই। কিন্তু ঐ সভায় এ বিষয়ে কোনো কথাই উঠলো না। কেন? কুন্তীর মুখনিঃসৃত অনুদেশ নেহাৎ

ভুল বোঝাবুঝির ফল। তাকে 'বেদবাক্য' মানবারও কারণ বোঝা যায় না। ব্যাসদেব পাণ্ডবদের বিষয়ে এমন কোনো কথা কোথাও লেখেননি যেটা তাদের বিরুদ্ধে যায়। এই 'নিষ্কাম' ব্রহ্মচারীটি শুধু যে নিষ্কাম ছিলেন না তাই নয়, নিস্পৃহও ছিলেন না। পাণ্ডবরা কে, কার দ্বারা জন্মগ্রহণ করেছে, সত্যিই পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ কিনা, সবই জানতেন খুব ভালোভাবে। গোপনীয়তার আশ্রয় নিতেও দ্বিধা করতেন না। বলেও ছিলেন, 'তোমাদের অধিক স্নেহ করি। তোমরা যা চাও তাই হবে।'

বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুক্রমে বিবিধ রত্ন ধনসম্পত্তি নিয়ে দ্রুপদ ও পাণ্ডবদিগের সন্নিধানে উপনীত হলেন। দ্রুপদও বিদুরকে সাদর সম্ভাষণপূর্বক আদর অর্ভ্যথনা করলেন। বিদুর পাণ্ডবদের স্নেহভরে আলিঙ্গন করলেন। অতঃপর তিনি তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য জানালেন।

দ্রুপদরাজ খুশি হয়েই কন্যাকে তার শ্বশুরালয়ে পাঠাতে রাজি হলেন। বললেন, 'কৌরবগণের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ হওয়াতে আমার যথেষ্ট পরিতোষ জন্মেছে। পাণ্ডবগণের স্বদেশগমন করাই আমার মতে উচিত। কিন্তু আমি স্বয়ং এঁদের এ স্থান থেকে বিদায় করতে পারি না। এদের পরম প্রিয়কারী বাসুদেব যদি সম্মত থাকেন তা হলে এঁরা স্বরাজ্যে গমন করুন। আমার কোনো আপত্তি নেই।'

এইসব কথাবার্তার পরে কৃষ্ণা-কুন্তীকে নিয়ে পাণ্ডবগণ হস্তিনাপুরে এলেন। গুরুজনদের পাদবন্দনার পরে ধৃতরাষ্ট্র সস্নেহে তাঁদের বিশ্রাম করতে বললেন। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পরে ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম তাঁদের আহ্বান করলেন। ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'বৎস! তুমি ভ্রাতৃগণের সঙ্গে আমার বাক্য শ্রবণ করো। তোমরা রাজ্যের অর্ধাংশ গ্রহণ করে খাণ্ডবপ্রস্থে গিয়ে বাস করো। তাহলে দুর্যোধনাদির সঙ্গে তোমাদের পুনরায় বিবাদ হবার আর সম্ভাবনা থাকে না।'

পিতৃব্যের আজ্ঞানুসারে পাণ্ডবগণ তাই করলেন। সঙ্গে কৃষ্ণও ছিলেন। খাণ্ডবপ্রস্থে এসে নগরের সৌন্দর্যে তাঁরা মোহিত হয়ে গেলেন। নগরটি অতি সুরক্ষিত। সমুদ্রসদৃশ পরিখা দ্বারা অলংকৃত। গগনস্পর্শী প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। অস্ত্রশস্ত্রে সুরক্ষিত ও সুশোভিত। এই পরম রমণীয় প্রদেশে কুবের গৃহতুল্য ধনসম্পন্ন কৌরবগৃহ বিরাজিত।

পাণ্ডবগণ এই অপূর্ব নগরীটি দেখে অতিমাত্রায় পুলকিত হলেন, এবং অত্যন্ত সুখে বাস করতে লাগলেন। কৃষ্ণ কিছুদিন তাঁদের সঙ্গে বাস করে স্বগৃহে ফিরে গেলেন। যুধিষ্ঠির অনায়াসে ভ্রাতাদের বীরত্বে সমস্তই, এমন কি দ্রৌপদীর মতো পত্নীটিকে পর্যন্ত পেয়ে, মহা আনন্দে রাজা হয়ে সিংহাসনে অধিরূঢ় হলেন। দিন সুখেই কাটতে লাগলো।

২

খাণ্ডবদাহন পর্বাধ্যায়ে কৃষ্ণ এবং অর্জুন শিল্পকর্ম বিশারদ ময়দানবের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। একদিন ময়দানব এসে তাঁর কৃতজ্ঞতা জানাতে যুধিষ্ঠিরের জন্য একটি উৎকৃষ্ট সভা নির্মাণ করে দেবার অভিলাষ জানালো। এ কথায় দুজনেই প্রীত হয়ে সম্মতি জানালে, ময়দানব বহু পরিশ্রম করে এমন একটি সভাস্থল নির্মাণ করলো যে-সভা ভূমণ্ডলে আর কারো নেই। নিজের কোনো যোগ্যতা না থাকলেও, ঈশ্বর যাকে সমস্ত রকম সুখ সম্মান আহ্লাদ দিতে ইচ্ছে করেন, সে অবশ্যই ভাগ্যবান। তার আর কোনো পুরস্কারের প্রয়োজন হয় না। অবিশ্রান্ত ভাগ্যই তাকে সমস্তরকম সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দিয়ে ঘিরে রাখে। যুধিষ্ঠির সেই অলৌকিক অসাধারণ ভাগ্য নিয়েই জন্মেছিলেন। ভ্রাতাদের প্রসাদেই তিনি সব কিছুর অধিকর্তা। অতএব ময়দানবের তৈরি তুলনাহীন সভাটিতেও তিনিই বসবার অধিকারী হলেন। বিদুরের বুদ্ধিতে পা ফেলে ফেলে চলে, ব্যাসদেবের সহায়তায়, অর্জুনের বীরত্বে, ভীমের বলে, আজ তিনি অদ্বিতীয়া রূপবতী পত্নীর পতি হয়ে যেন যাদুবলে এমন একটি রাজ্যের এমন এক আশ্চর্য সভার সর্বাধিপতি। অথচ এতো কিছু পাবার জন্য একটি আঙুলও তাঁকে নাড়তে হয়নি।

অনুপার্জিত ক্ষমতায় পার্থিব সুখসমৃদ্ধির তুঙ্গে উঠে যুধিষ্ঠিরের লোভ আরো উর্ধ্বগামী হলো। মনে মনে তাঁর সম্রাট হবার বাসনা উদিত হলো। ক্রমে ক্রমে সেই ইচ্ছা তাঁকে অস্থির করে তুললো। রাজসূয় যজ্ঞ করবার বাসনায় তিনি যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। মন্ত্রিগণ ও অনুজদের আহ্বান করে বললেন সেকথা। পরামর্শ করবার জন্য কৃষ্ণকেও দূত পাঠিয়ে আনয়ন করলেন। কৃষ্ণ যথাসম্ভব শীঘ্র এসে উপস্থিত হলেন। যখন শুনলেন যুধিষ্ঠির রাজসূর যজ্ঞ করবার জন্য লালায়িত হয়েছেন, ভিতরে ভিতরে সম্ভবত তাঁর মন আনন্দে কম্পমান হলো। বোধহয় তৎক্ষণাৎ তাঁর মনে হলো যা তিনি চেয়েছেন এঁদের সঙ্গে বন্ধুতার বিনিময়ে, সেই সুযোগ সমুপস্থিত। বললেন, 'একটা কথা, যজ্ঞ যদি নির্বিঘ্নে সমাপন করতে চান, তা হলে আপনার প্রথম কর্তব্য হবে জরাসন্ধকে নিধন করা।'

যুধিষ্ঠির অনুজদের দিকে তাকালেন। সাধ-আকাজ্ক্ষা যুধিষ্ঠিরের, যাঁরা মেটাবেন তাঁরা ভ্রাতারাই। তিনি যে অযোগ্য তা তিনি জানেন। এ পর্যন্ত যা হয়েছে বা যা হতে পেরেছে সব কিছুর জন্য তো ভ্রাতাদের অনুকম্পাই তাঁর সম্বল। ভ্রাতারা কৃষ্ণের দিকে তাকালেন। কৃষ্ণ বললেন, 'মহীপতি জরাসন্ধ স্বীয় বাহুবলে সমস্ত ভূপতিগণকে পরাজিত করে, তাদের দ্বারা পূজিত হয়ে, অখণ্ড ভূমন্ডলে একাধিপত্য স্থাপন করেছে। তাকে পরাজিত করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।'

তৎক্ষণাৎ যুধিষ্ঠির ভয় পেলেন। বললেন, 'হায় হায়! আমি তো তোমারই বাহুবল আশ্রয় করে আছি। যখন তুমিই জরাসন্ধকে ভয় করো, তখন আমি নিজেকে কী করে বলবান মনে করবো?' এই পঞ্চভ্রাতা এতোদিন বিদুরের চাতুর্যে ও ব্যাসদেবের সহায়তায় এইখানে এসে পৌঁছেছেন। এর মধ্যে জতুগৃহে অগ্নি প্রজ্বলিত করে কতোগুলো ঘুমন্ত মানুষকে পুড়িয়ে মারা ব্যতীত তাঁদের নিজেদের অন্য কোনো কৃতিত্ব মাহাত্ম্য বা বীরত্বের কোনো প্রমাণ ছিলো না। একমাত্র অর্জুনের লক্ষ্যভেদটাই উল্লেখযোগ্য। সেখানেও তিনি অদ্বিতীয় নন। অর্জুনের পূর্বে সেটা কর্ণই করেছিলেন।

যুধিষ্ঠিরের ভীতি দেখে কৃষ্ণ যে বিষয়ে অতি দক্ষ, নিভৃতে সেই পরামর্শটি দিলেন। বললেন, 'একটা উপায় আছে, যদি আজ্ঞা করেন তো বলি।'

যুধিষ্ঠির উৎসুক হলেন। কৃষ্ণ বললেন, 'দেখুন, আমি নীতিজ্ঞ, ভীমসেন বলবান, এবং অর্জুন আমাদের রক্ষক। অতএব, তিন অগ্নি একত্র হয়ে যেমন যজ্ঞ সম্পন্ন করে, তেমনই আমরা তিনজন একত্র হয়ে জরাসন্ধের বধসাধন করবো। আমরা তিনজন নির্জনে আক্রমণ করলে জরাসন্ধ নিশ্চয়ই একজনের সঙ্গে সংগ্রাম করবে। সে অবমাননা, লোভ ও বাহুবীর্যে উত্তেজিত হয়ে ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ করবে সন্দেহ নেই। তখনি ভীমসেন তাকে সংহার করতে পারবে।'

কী অন্যায়! এর নাম কি বীরত্ব? কিন্তু এঁরাই মহাভারতের শ্রেষ্ঠ বীর বলে বর্ণিত। কোনো রাজা বা রাজপুত্র কখনো এভাবে শত্রুসংহার করে না, তাতে তাঁদের অপমান হয়। এবং কৃষ্ণও জানেন জরাসন্ধও করবেন না। ধর্মত দুর্যোধনও এই ধরনের কর্ম কখনও ভাবতে পারবেন না। কিন্তু যিনি মহাত্মা ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির, তিনি এই প্রস্তাবে ভীষণ খুশি হলেন। লুকিয়ে কোনো অন্তঃপুরে ঢুকে, তাঁর আতিথ্যে সমাদৃত হয়ে, সহসা সেই মানুষকে তাঁর অসতর্ক মুহূর্তে খুন করার মধ্যে যে যথেষ্ট পরাজয় আছে, অন্যায় আছে, অধর্ম আছে, একবার□ও সেকথা তাঁর মনে হলো না। যে কোনো বীরের পক্ষে সেই অপমান মৃত্যুর অধিক। মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের মন কিন্তু এই প্রস্তাব অসততার চূড়ান্ত বলে বর্জন করলো না।

আর এদিকে অর্জুনের মতো একজন মহাবীরের কাছেও সেই প্রস্তাব কাপুরুষতার নামান্তর হিশেবে গণ্য হলো না। ইতিহাস যাঁকে ধর্মের ধ্বজা বলে চিহ্নিত করেছে এবং যাঁকে বীরত্বের শেষ সীমা বলে প্রচার করেছে, তাঁদের দুজনের একজনও এই বুদ্ধিকে কুবুদ্ধি বলে বর্জন করলেন না। বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন ও মহাবীর ভীম চুপ করে রইলেন, শ্রেষ্ঠ ধার্মিক যুধিষ্ঠির বললেন, 'তুমি প্রজ্ঞা নীতি বল ক্রিয়া ও উপায় সম্পন্ন। অতএব ভীম ও অর্জুন কার্যসিদ্ধির জন্য তোমাকেই অনুসরণ করুন।'

যিনি প্রকৃত বীর তিনি যে কখনোই বীরত্বকে অবমাননা করেন না, কৃষ্ণ সেটা জানেন। সেটা

তাঁদের পক্ষে অপমান, অমর্যাদা, এবং অধর্ম। নচেৎ, কীরূপে জ্ঞাত হলেন যে নিরুপায় লোকটিকে তিনজনে আক্রমণ করলেও তিনি সর্বাপেক্ষা যিনি বলবান তাঁর সঙ্গেই যুদ্ধ করবেন? একজন বীরশ্রেষ্ঠর পক্ষে সেটাই তাঁর যোগ্যতার সম্মান এবং প্রমাণ। সারা মহাভারত ভর্তি কোটি কোটি অক্ষরের প্রকাশে যাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ বীর হিশেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সেই অর্জুন কিন্তু যুদ্ধের সময় প্রকৃতপক্ষে কোনো বড়ো যোদ্ধার সঙ্গেই শঠতা ব্যতীত বীরত্বের প্রমাণ দেননি। আর যিনি ধর্মাত্ম মহাত্মা সত্যবাদী যুধিষ্ঠির, তিনি নিজে অক্ষম হয়েও, অপরের পারঙ্গমতার সাহায্যে তাঁর নিজের লোভ চরিতার্থের জন্য যে কোনো পাপকর্মে অন্যদের লিপ্ত হতে দিতে মুহূর্তমাত্র দ্বিধা করেননি। যে কর্ম করতে কর্ণ এবং দুর্যোধন ঘৃণা বোধ করতেন, লজ্জা বোধ করতেন, এঁরা সেটা অনায়াসে করেন।

৩

পরামর্শের পরে কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুন ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে মগধপুরে গমন করলেন। পথে যেতে যেতে নানাবিধ অন্যায় কর্মে নিরত করলেন নিজেদের। সারি সারি সব দোকান শূন্য করে ফেলে দিলেন, কাউকে কুবাক্য বললেন, তারপর দ্বারদেশে এসে নগরচৈত্যের সম্মুখে উপস্থিত হলেন।

জরাসন্ধ বৃষরূপধারী দৈত্যকে সংহার করে তার চর্ম দিয়ে তিনটি ভেরী প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। সেই ভেরীতে একবার আঘাত করলে একমাসব্যাপী গম্ভীর ধ্বনি অনুরণিত হতো। মহারাজা নিজপুরীতে সেই ভেরী তিনটি রেখেছিলেন। ভেরীগুলো এঁরা ভেঙে ফেললেন। তারপর নিজেদের অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করে জরাসন্ধের সঙ্গে বাহুযুদ্ধ করবার জন্য পুরপ্রবেশ করে জরাসন্ধের নিকট সমুপস্থিত হলেন।

মহারাজা জরাসন্ধ তাঁদের দেখে ব্রাহ্মণ ভেবে সত্বর গাত্রোত্থান করে, মধুপর্ক ইত্যাদি দ্বারা পাদ্য পূজা করে, স্বাগত প্রশ্ন করলেন। ভীম আর অর্জুন চুপ করে রইলেন। কৃষ্ণ বললেন, 'হে রাজেন্দ্র! এঁরা নিয়মস্থ। এঁরা এখন কথা বলবেন না। এঁরা পূর্বরাত্রি অতীত হলে আপনার সঙ্গে আলাপ করবেন।' ভেবে দেখুন কী সহজে মিথ্যে কথা বলতে পারেন কৃষ্ণ!

সেদিন কোনো পূজা নিবন্ধন মহারাজা জরাসন্ধ উপবাসী ছিলেন। একথা শুনে তাঁদের যজ্ঞাগারে রেখে স্বীয় গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হলেন। কিন্তু কোনো স্নাতকব্রাহ্মণ অর্ধরাত্র সময়ে উপস্থিত হলে তিনি তৎক্ষণাৎ গমন করলেও প্রত্যুদ্গমন করতেন। অর্ধরাত্রে এসে পুনরায় তিনি তিনজনের সমীপে উপস্থিত হয়েই পূজা করলেন। একটু আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'হে বিপ্রগণ! আমি জানি স্নাতকব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণগণ সভাগমন ব্যতীত কখনো মাল্য বা চন্দন ধারণ করেন না। আপনারা কে?'

কৃষ্ণ বললেন, 'হে বৃহদ্রথনন্দন! ধীর ব্যক্তিগণ শত্রুগৃহে অপ্রকাশ্যভাবেই প্রবেশ করে। আমরা স্বকার্য সাধনার্থে শত্রুগৃহে প্রবেশ করেছি।'

জরাসন্ধ বললেন, 'হে বিপ্রগণ! আমি কখন আপনাদের শত্রুতা করেছি? কী নিমিত্ত আমাকে শত্রু বলে স্থির করলেন? আমি সতত স্বধর্ম সাধনে নিয়ত থাকি। প্রজাদের ব্যথিত করি না। নিশ্চয়ই আপনাদের কোনো প্রমাদ ঘটেছে।'

গভীর রাত্রির নির্জন মুহূর্তে দুটি বলবান যোদ্ধার আশ্রয়ে সাহসী হয়ে উঠে কৃষ্ণ স্বমূর্তি ধারণ

করে বললেন, ‘তোমাকে কপট সংহার করতেই আমরা এখানে এসেছি। আমরা ব্রাহ্মণ নই। আমি বসুদেবনন্দন কৃষ্ণ, এঁরা দুজন পাণ্ডুতনয়।’

এরপর ভীমের সঙ্গে জরাসন্ধের প্রবল যুদ্ধ শুরু হলো। চতুর্দশ দিবসে ধূর্ত কৃষ্ণ ক্লান্ত মগধরাজকে কীভাবে হত করা যাবে জানাতে ইঙ্গিতপূর্ণ ভাবে ভীমের দিকে তাকালেন, বললেন, ‘হে ভীম! তোমার যে দৈববল ও বাহুবল আছে, আশু সেটা জরাসন্ধকে প্রদর্শন করাও।’ বলামাত্র ভীম অব্যবস্থিত, ক্লান্ত, উপবাসী, অসতর্ক, জরাসন্ধকে তাঁর দানবীয় শক্তি দিয়ে উৎক্ষিপ্ত করে ঘূর্ণিত করতে লাগলেন। তারপর হাঁটু দিয়ে চেপে বসে তাঁর পৃষ্ঠদেশ ভগ্ন ও নিষ্পেষণ করে তাঁর পদদ্বয় দুহাতে ধরে দ্বিধা-বিভক্ত করলেন। কৃষ্ণ এবং অর্জুন বসে বসে সেই নারকীয় দৃশ্য উপভোগ করলেন।

অবশ্য আমি যতো সহজে যুদ্ধের শেষ দৃশ্যে এনে ফেলেছি এতো সহজে ভীম এখানে এসে পৌঁছতে পারেননি। কিন্তু সেই বর্ণনায় গিয়ে লাভ নেই। প্রকৃত পক্ষে, কৃষ্ণের লুকিয়ে পালিয়ে থাকা জীবন থেকে এতোদিন মুক্তি ঘটলো। এই কারণেই, এতোকাল পরে, নব পরিচিত এই যুবকদের সঙ্গে তাঁর বাড়াবাড়ি বন্ধুতার কার্যকারণটাও বুঝতে অসুবিধে হলো না। জরাসন্ধকে হত্যা করে এসে তিনি হাঁপ ছাড়লেন। এবং দেশে দেশে রটে গেলো পুরুষোত্তম কৃষ্ণ, মহাবল ভীম, অজেয় যোদ্ধা অর্জুন, জরাসন্ধকে নিহত করেছেন।

পাণ্ডবরা যা করেছেন সবই ক্ষাত্রধর্ম বিরুদ্ধ। এভাবে গোপনে কারো অন্তঃপুরে প্রবেশ করে অসতর্ক গৃহস্থকে হত্যা করা, কেবলমাত্র ক্ষত্রিয়ই নয়, যে কোনো মনুষ্যের পক্ষেই অতিশয় গূঢ় অপরাধ বলে গণ্য। প্রথম দিন থেকে শেষদিন পর্যন্ত পাণ্ডবরা এই কর্মই করে গেছেন। কিন্তু তাতে তাঁদের কোনো নিন্দা নেই মহাভারতে। আইনত ফাঁসির যোগ্য অপরাধও বীরত্ব বলে ঘোষিত হয়েছে। আমরা পাঠকরা সেটা মেনে নিতে পারি না। যা অন্যায় তা অন্যায়ই, সেটা যিনিই করুন।

কৃষ্ণের দুজন শত্রুর একজন এই জরাসন্ধ, অন্যজন শিশুপাল। জরাসন্ধ শিশুপাল অপেক্ষা কৃষ্ণের অন্তরে অনেক বেশী ভীতিজনক ব্যক্তি ছিলেন। জরাসন্ধের ভয়েই তিনি লুকিয়ে দ্বারকাবতীতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পাঞ্চালীর স্বয়ংবর সভাতে গিয়েই তিনি বুঝেছিলেন অর্জুন এবং ভীম একত্র হলে তিনি অনেক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটাতে পারেন। দেরি না করে তিনি তাঁদের প্রিয় সখা হয়ে উঠলেন। অনুমান ব্যর্থ হলো না।

এবার যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের পরামর্শে নির্ভয়ে যজ্ঞে নিয়োজিত হলেন। অতঃপর চতুর্দিকে সমস্ত ব্রাহ্মণ এবং রাজগণকে আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ করতে দূত পাঠালেন। সকলেই সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে চলে এলেন সভাতে। কৃষ্ণের আর একজন শত্রু শিশুপালও এলেন। তিনি যে আসবেন কৃষ্ণ জানতেন। মনে মনে প্রস্তুত হয়ে রইলেন এই ব্যক্তিটিকেও নিধন করার জন্য।

সেটা অবশ্য লিখিত নেই, তবে বুঝতে দেরি হয় না। এবং ঘটনাটা অচিরেই ঘটে গেলো। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, যে পাণ্ডবরা বিদুর ব্যতীত কুরুকুলের আর কারো প্রতিই কোনো আত্মীয়তা অনুভব করতেন না, হঠাৎ দেখা গেলো কুরুপিতামহ ভীষ্মকে তাঁরা এই বৃহৎ যজ্ঞের একজন বিশিষ্ট গণ্যমান্য কর্তাব্যক্তি হিশাবে স্থান দিয়েছেন। অথচ এতোকাল তাঁকে উপেক্ষাই করে এসেছেন তাঁরা। যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষেক, জতুগৃহদাহ, পাণ্ডবদের দগ্ধ হবার সংবাদ, পাঞ্চালরাজের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক, একজন কন্যাকে পাঁচজন ভ্রাতার বিবাহ এতোগুলো ঘটনার মধ্যে কখনোই কুরুকুলপতি পিতামহকে কেউ স্মরণ করেননি। আর কোথাও না হোক, বিবাহ বাসরে তাঁর উপস্থিতি স্বাভাবিক ছিলো। সতেরো দিনের মৃত গলিত পাণ্ডু ও পাণ্ডুপত্নী মাদ্রীকে নিয়ে যখন কুন্তী বহু বৎসর পরে পাঁচটি বড়ো বড়ো পুত্রসহ এলেন, ভীষ্মই তখন তাঁদের সমাদরে গ্রহণ করে পুরবাসীদের মনকে সংশয়হীন করেছিলেন। পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ বলে গ্রহণ করে কুন্তীর সম্মানও যেমন রক্ষা করলেন, পাঁচটি অজানিত পুত্রদেরও কুরুকুলে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তিনিই তাদের শিক্ষা দিয়েছেন। ক্ষত্রিয়জনোচিত বীর তৈরী করতে দ্রোণাচার্যকে উপযুক্ত সম্মান দিয়ে গুরু নিয়োগ করেছেন। স্নেহ মমতা দিয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেলো বিদুর এবং ব্যাসদেবই পাণ্ডবদের সব।

প্রকৃতপক্ষে ভীষ্ম ছিলেন সত্যবতীর প্রয়োজনের হাতিয়ার। কিন্তু এখন আর কীসের প্রয়োজন? বরং যে উদ্দেশ্যে বিদুর তাঁদের অজ্ঞাতবাসে রেখে ব্যাসদেবের সাহায্যে মহারাজা ধৃতরাষ্ট্রকে গদিচ্যুত করবার বাসনায় অন্য কোনো বলশালী রাজার সঙ্গে যুক্ত, সেখানে ভীষ্ম অবশ্যই

অপাঙক্তেয়। তদ্ব্যতীত, যে পদ্ধতিতে একজন কন্যা পঞ্চস্বামীর হস্তে সমর্পিত হলো, সেই পদ্ধতি আর্যকুলে বা ক্ষত্রিয়কুলে সম্ভবই নয়। আর্য নিয়ম বা ক্ষত্রিয় নিয়ম না মেনে অনার্য অবৈধ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যেভাবে তাঁর পৌত্র যুধিষ্ঠিরকে হস্তিনাপুরের রাজত্বে সর্বময় কর্তৃত্বের আসনে বসাবার রাস্তা সাব্যস্ত করলেন, সেখানে ভীষ্মকে স্মরণ করাও একটা মস্ত বড় বাধা। পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ হলে এই প্রথা অনুসারে বিবাহ করা বা বিবাহ দেওয়া তিনি কি মেনে নিতেন? কিন্তু নিয়েছিলেন। কেন নিয়েছিলেন? তার কারণও কি সত্যবতী? মৃত সত্যবতীকে স্মরণ করে?

অকস্মাৎ দেখা গেল সত্যবতীর দয়ায় অপাঙক্তেয় বৃদ্ধ প্রায়বিস্মৃত ভীষ্মকে পাণ্ডবরা অতিশয় সম্মান দেখিয়ে সেই যজ্ঞে আহ্বান করে একজন প্রধান ব্যক্তি হিশেবে নিয়ে এসেছেন। সম্ভবত কৃষ্ণের পরামর্শেই সেটা করেছিলেন তাঁরা, এবং নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য ছিলো। নচেৎ এতোকাল পরে এ বৃদ্ধকে তাঁদের কী দরকার? কিন্তু যতোই নিস্তাপ হয়ে যান না কেন, তিনি খাঁটি ক্ষত্রিয় তো বটে! এই আগুন কখনো নির্বাপিত হয় না। একটু খুঁচিয়ে বাতাস দিলেই দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। এই সত্য কৃষ্ণের বুদ্ধির অন্তর্গত হওয়াই স্বাভাবিক। এতোবড়ো যজ্ঞসভায় এই রকম ক্ষত্রিয় বীরকে সহায় পাওয়া প্রয়োজন। তাঁকে হাতে রাখার জন্য কৃষ্ণ অবশ্যই অনেক মধুর ব্যবহার এবং অনেক মধুর বাক্য বিনিময়ে সম্মোহিত করে ফেলেছিলেন ভীষ্মকে। এসব কথা লিখিত না থাকলেও অলিখিত সত্য বলে ধরে নেওয়া যায়। যজ্ঞের শুরুতে প্রধান পদের মর্যাদায় স্থিত ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'ঋত্বিক, সম্বন্ধী, স্নাতক এবং প্রিয় ব্যক্তি এঁরাই অর্ঘার্হ। এঁদের সকলের জন্যই এক একটি অর্ঘ্য নিয়ে এসো।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'আপনি কাকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করছেন?'

ভীষ্ম শেখানো বুলির মতো বললেন, 'কৃষ্ণ।'

সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণকে অর্ঘ্যও প্রদান করা হলো, কৃষ্ণও তা গ্রহণ করলেন।

তারপরেই, যা অবশ্যম্ভাবী বলে কৃষ্ণ ভেবে রেখেছিলেন, তাই হলো। রাজন্যবর্গের প্রতিভূ হয়ে সঙ্গত কারণেই শিশুপাল প্রতিবাদ করে বললেন, 'বাসুদেব ঋত্বিক নয়, আচার্য নয়, নৃপতি নয়, তবে কেন তাকে অর্ঘ্য প্রদান করা হবে? হে পাণ্ডব। এই সমস্ত রাজগণ উপস্থিত থাকতে কখনোই কৃষ্ণ পূজার্হ হতে পারে না। তুমি কামতঃ কৃষ্ণের অর্চনা করেছো। ধর্মের কিছুই জানো না, ধর্ম অতি সূক্ষ্ম পদার্থ। আর এই ভীষ্ম অদূরদর্শী এবং স্মৃতিশক্তিহীন। হে ভীষ্ম! যে কৃষ্ণ রাজা নয়, তুমি তাকে কী বলে অর্ঘ্য প্রদান করলে? সে-ই বা কী করে সকল মহীপতির মধ্যে সেই পূজা গ্রহণ করলো? হে কুরুনন্দন! কৃষ্ণ সর্বদাই তোমার অনুবৃত্তি করে তোমার প্রিয়ার্থী হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু দ্রুপদ থাকতে কৃষ্ণের পূজা করা তোমার উচিত হয়নি। যদি কৃষ্ণকে

আচার্য মনে করে থাকো, তা হলে দ্রোণ থাকতে কৃষ্ণ কেন অর্চিত হলো? কৃষ্ণকে ঋত্বিক মনে করে থাকলে বৃদ্ধ দ্বৈপায়ন উপস্থিত আছেন। শান্তনব ভীম, সর্বশাস্ত্রবিশারদ অশ্বত্থামা, রাজেন্দ্র দুর্যোধন, ভারতাচার্য কৃপ, মদ্রাধিপ শল্য, এই সমস্ত মহাত্মারা থাকতে এবং জমদগ্নির প্রিয় শিষ্য, যিনি আত্মবল আশ্রয় করে রণক্ষেত্রে সমুদয় রাজলোক পরাভব করেছিলেন, সেই মহাবল-পরাক্রান্ত কর্ণকে অতিক্রম করে কী করে কৃষ্ণের পূজা করলে? মনে মনে যদি এই স্থির ছিলো তোমার, তবে এ সমস্ত রাজাদের আহ্বান করে তাদের অপমান করলে কেন? কোন ধার্মিক পুরুষ ধর্মভ্রষ্ট ব্যক্তিকে সজ্জনোচিত পূজা করে? যে বৃষ্ণিকুলে জন্মগ্রহণ করেছে এবং ভীমসেন ও ধনঞ্জয় দ্বারা অতি হীনভাবে মহাত্মা জরাসন্ধের প্রাণ সংহার করিয়েছে, কোন ব্যক্তি তাকে ন্যায্য বলে স্বীকার করতে পারে? সেই দুরাত্মা কৃষ্ণকে অর্ঘ্য নিবেদন করাতে আজ যুধিষ্ঠিরের নীচত্বই প্রদর্শিত হলো। ধার্মিকতাও বিনষ্ট হলো। জানি কুন্তীতনয়েরা ভীত, নীচস্বভাব তপস্বী, কিন্তু ওহে কৃষ্ণ! তারা না হয় নীচতাপ্রযুক্ত তোমাকে পূজা প্রদান করলো, তুমি কী করে তা স্বীকার করলে?'

এ সমস্ত বলে শিশুপাল গাত্রোত্থান করে অন্যান্য রাজগণের সঙ্গে সভা ত্যাগ করতে উদ্যত হলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, 'হে মহীপাল। তুমি যা বললে তা নিতান্ত অধর্মযুক্ত, পরুষ ও নিরর্থক। ধর্ম কাকে বলে তুমি নিজেই তা জানো না।'

ভীষ্ম বললেন, 'হে যুধিষ্ঠির! কৃষ্ণের অর্চনা যার অনভিমত, এমন ব্যক্তিকে অনুনয় করার দরকার নেই। এই নৃপসভায় এমন কোন নৃপতি আছেন, তেজবলে কৃষ্ণ যাকে পরাভব করেননি?'

এটা সত্য কথা নয়। কৃষ্ণ যাদববংশের সন্তান, তাঁদের পেশা যুদ্ধ বিগ্রহ নয়। কোনো নৃপতির সঙ্গেই তিনি কখনো যুদ্ধ করেননি, হারজিতের প্রশ্নও ওঠেনি। ভীষ্মের এ অদ্ভুত কথা শুনে সমস্ত নৃপকুল সংক্ষোভিত হয়ে উঠলো। কৃষ্ণ রাজা নন, ক্ষত্রিয় নন, কবে কোন রাজার সঙ্গে যুদ্ধ হলো তাঁর?

কৃষ্ণ তাঁর তৃতীয় নয়নের তীব্রতায় এই ছবিটা পূর্বেই দেখতে পেয়েছিলেন। কোনটার পর কী ঘটবে সেটা তাঁর নখদর্পনে ছিল। সুতরাং তিনি জানতেন অপমান আর যে নৃপই সহ্য করুন, শিশুপাল করবেন না। এবং এই ক্ষেত্রে কুরুকুলের সর্বজ্যেষ্ঠ ভীষ্মকেই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। তাঁকে প্রধান করে কলহের সূত্রপাত তাঁর দ্বারা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাঁকে কোনোক্রমে যদি ক্ষিপ্ত করে তোলা যায়, তবে আর কোনো ভয় থাকে না। ভীষ্মের মতো যোদ্ধার কাছে শিশুপালও শিশুই। যজ্ঞ পণ্ড হতে পারে, তা হোক, এই সুযোগে শিশুপালকে নিহত করাই আসল কথা।

শিশুপালকে বধ করতে হলে এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর কিছু হতে পারে না। অসংখ্য লোকের মধ্যে, বিশাল কর্মকাণ্ডের মধ্যে, এই রকম প্রচণ্ড গোলমালের মধ্যে, যেখানে কে কী করছে বোঝা দুষ্কর, যেখানে অধিকাংশই অধিকাংশকে চেনে না, সেখানে কে কোথায় কোন অবস্থায় অবস্থান করলে আসল কর্মটি সকলের অলক্ষ্যে সাধন করা যায়, সে ভাবেই গতিবিধি নির্দিষ্ট ছিলো। জরাসন্ধের ক্ষেত্রে কৃষ্ণ যেমন ইঙ্গিত দিয়েছিলেন ভীমকে, এখানে তেমন ইঙ্গিতেরও প্রয়োজন নেই। শিশুপাল এলেই যে তাঁকে অর্ঘ্য দেওয়া নিয়ে একটা প্রচণ্ড বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হবে সেটা কৃষ্ণের জানাই ছিলো। ভীষ্মকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করানো হয়েছে কৃষ্ণ মানুষের আকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও ইনিই ঈশ্বর। ঈশ্বরের সব মহিমাই তাঁর মধ্যে নিহিত হয়ে আছে। ইনি ইচ্ছা করলে এই মূর্তিতেই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সবই মুহূর্তে ঘটিয়ে ফেলতে পারেন।

ভীষ্মের কথা শুনে সুনীথনামা এক পরাক্রান্ত বীরপুরুষ ক্রোধে কম্পিত হয়ে আরক্ত নয়নে বললেন, 'আমি পূর্বে সেনাপতি ছিলাম, সম্প্রতি যাদব ও পাণ্ডুকুলের সমূলোন্মূলন করার জন্য সমরসাগরে অবগাহন করবো।'

অন্যান্য রাজারাও কৃষ্ণের প্রতি এই মিথ্যা গৌরব আরোপ করাতে ক্রোধপরবশ হয়ে মন্ত্রণা করতে লাগলেন। রাজমণ্ডলকে রোষপ্রজ্বলিত দেখে ভীতু যুধিষ্ঠির আরো ভীত হয়ে ভীষ্মের আশ্রয় নিলেন। ভীষ্ম বললেন, 'যুধিষ্ঠির, ভীত হয়ো না, কুক্কুর কখনো সিংহকে হনন করতে পারে না। এরা চিৎকার করছে, করুক। পার্থিবশ্রেষ্ঠ শিশুপাল অচেতন হয়ে পার্থিবদের যমালয়ে নিয়ে যাবার বাসনা করছে। চেদিরাজের এবং সমস্ত মহীপতিরই মতিচ্ছন্ন হয়েছে। নারায়ণ শিশুপালের তেজ অবিলম্বেই প্রত্যাহর করবেন।'

শিশুপাল বললেন, 'হে ভীষ্ম! বৃদ্ধ হয়ে কি তুমি কুলের কলঙ্ক হয়েছো? তোমার কি মতিভ্রম হয়েছে? স্থবিরাবস্থা উপস্থিত হয়েছে? তুমি কি বিচেতন হয়ে দুরাত্মা কেশবের স্তুতিবাদ করছো? যাকে বালকেরাও ঘৃণা করে, তুমি জ্ঞানবৃদ্ধ হয়ে তাকে কী ভেবে প্রশংসা করছো? তুমি কি জানো, এই দুরাত্মা কংসের অন্নে প্রতিপালিত হয়ে তাকেই সংহার করেছে? অন্নদাতার প্রতি শস্ত্রপাত কি মহাত্মার লক্ষণ? না কি গোপনে হত্যা করা কোনো তেজের লক্ষণ? তাকে কি ধর্ম বলে? তুমি কৌরবের প্রধান হয়েছো। ধর্মসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করাই তোমার কর্তব্য। স্তাবকতা নয়।'

ভীষ্ম বললেন, 'কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করা থেকে যে সব অলৌকিক কর্মের পরিচয় দিয়েছেন, আমি পুনঃ পুনঃ তার ভূয়সী প্রশংসা শুনেছি এবং আশ্চর্য হয়েছি। অতএব অশেষ গুণবাহুল্যযুক্ত বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগকে অতিক্রম করেও কৃষ্ণের অর্চনা করা বিধেয়। কৃষ্ণ যা করেছেন তা কোনো সামান্য ব্যক্তির দ্বারা সম্ভব নয়। হে চেদিরাজ! তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আর যেন কখনো

বুদ্ধির এরকম ব্যতিক্রম না হয়। যেন কখনো এরকম গর্ব প্রকাশ না করো।'

হাস্যসহকারে শিশুপাল বললেন, 'তুমি কি বাসুদেবকে অপার্থিবজ্ঞানে পার্থিবগণকে বিভীষিকা দেখাচ্ছ, না কি পুতনাঘাত প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ কীর্তন করে আমাদের কাছে পরিহাসের পাত্ররূপে প্রদর্শন করছো? ক্রীড়নকের মতো ব্যবহার করছো কেন? বাল্যকালে পক্ষীর ন্যায় আকাশে উড্ডীন তৃণাবর্ত এবং যুদ্ধানভিজ্ঞ অশ্ব ও বৃষভ বিনষ্ট করেছিলো, প্রাণহীন এক কাষ্ঠময় শকট পাদদ্বারা পতিত করেছিলো, অথবা রাশিকৃত অন্নভোজন করেছিলো, বাসুদেবের এই কর্মের মহিমাতেই, হে ভীষ্ম! তুমি সেই গোপ বালকদের মতো বিস্ময়াবিষ্ট হলে? তুমি এখন কৌরবশ্রেষ্ঠ না কৌরবাধম!'

ভীম দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করে মূর্তিমান কালান্তকের মতো অগ্রসর হয়ে এলেন শিশুপালের দিকে।

ভীমের ক্রোধ দেখে কুপিত সিংহ যেমন মৃগের প্রতি উপেক্ষা করে থাকে, সেই রকম উপেক্ষা সহকারে হাসতে হাসতে শিশুপাল বললেন, 'হে ভীষ্ম, একে পরিত্যাগ করো, এই ভীম পতঙ্গকে আমি এখুনি দগ্ধ করছি, উপস্থিত নরপতিরা দেখুন। আর, তোমার মন যদি কেবল পরের স্তুতিবাদ করেই সন্তুষ্ট থাকে, তবে অন্য ভূপালদের স্তুতিবাদ করো। মহাবীর কর্ণের প্রশংসা করো, যিনি অঙ্গ ও বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ এবং সহস্রাক্ষসদৃশ বলশালী, যাঁর মহাবাহুর চাপবিকর্ষ অতি ভয়ানক, কুণ্ডলদ্বয় সহজাত, যিনি সত্যি সত্যি বীর, যিনি সম্মুখযুদ্ধে জরাসন্ধকে পরাজিত করেছিলেন। আরো কতো সব অনন্যসাধারণ বীরগণ উপস্থিত আছেন, তাঁদের প্রশংসা করো না। তাছাড়া সাগরাম্বনা পৃথিবীতে যিনি অদ্বিতীয়, সেই রাজেন্দ্র দুর্যোধনই তো এখানে উপস্থিত, তাঁকে স্তুতি করতে ইচ্ছা হয় না তোমার? তুমি মোহবশত এদের উপেক্ষা করে ঐ অস্তবনীয় বাসুদেবকে স্তব করছো কেন? তোমার বুদ্ধি প্রকৃতির অনুগত নয়।'

ভীষ্ম বললেন, 'আমরা গোবিন্দকে পূজা করেছি, তিনিও সম্মুখে বিদ্যমান। বেশ তো, যাঁর নিতান্তই মরণসাধ হয়েছে সে বাসুদেবকে যুদ্ধে আহ্বান করুক না।'

ভীষ্মের বাক্য শ্রবণমাত্রই শিশুপাল বাসুদেবকে সংগ্রামে আহ্বান করে বললেন, 'কই হে, এসো, আমি তোমাকে আহ্বান করছি। সাহস থাকে তো আমার সঙ্গে সংগ্রাম করো। আজ তোমাকে পাণ্ডবগণ সমভিব্যাহারে যমালয়ে প্রেরণ করি। তুমি রাজা নও, তুমি দাস, দুর্মতি, ও পূজার অযোগ্যপাত্র। এই পাণ্ডবরা সেই তোমাকেই অন্য সব মাননীয়কে অবজ্ঞা করে পূজনীয় হিশাবে পূজা দিয়েছে। তাদের বধ করেও এই অপমানের প্রতিশোধ নেবো।'

কৃষ্ণ অতি সত্বর গা ঢাকা দিলেন। পাণ্ডবরাও তাঁকে অনুসরণ করলেন। কৃষ্ণ পাণ্ডবদের নিয়ে অন্যান্য ক্রুদ্ধ ভূপতিদের আড়ালে বসে খুব নিচুস্বরে অতি বিনীত ভঙ্গিতে বললেন, 'আপনারা দয়া করে শুনুন, এই সাত্যকিনন্দনের কর্মই হলো যে তার উপকার করে তার অপকার করা।

এটাই ওর স্বভাব। এই পাপিষ্ঠ আমাকে অনর্থক পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেছে। আমার সহচরদের বিনষ্ট করেছে। স্বীয় মাতুল বিশালাপতির কন্যা ভদ্রাকে অপহরণ করেছে। (এখানে পুনরায় উল্লেখ করছি, কৃষ্ণের পরামর্শে অর্জুনও তাঁর মাতুল কন্যা সুভদ্রাকে অপহরণ করেছিলেন। অর্জুনের মাতা কুন্তী বাসুদেবের পিতা বসুদেবের ভগ্নি। সুতরাং সুভদ্রাও তাঁর মাতুলকন্যা।) এই পাপাত্মার কুকর্মের সীমা নেই, দুষ্কর্মের শেষ নেই। তথাপি আমি একে কেন এতোদিন সহ্য করেছি জানেন? এর মাতা আমার নিজের পিতৃস্বসা। তাঁর কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম ওর সহস্র অপরাধ ক্ষমা করবো। এখন আপনাদের অবগতির জন্য জানাই আজই ওর সেই সহস্র অপরাধ পূর্ণ হলো। আর আমি ওকে ক্ষমা করবো না।'

নিন্দিতকর্মা যাদুকর কৃষ্ণ তাঁর বাকচাতুর্যে যতক্ষণ এইসব ক্রুদ্ধ নৃপতিদের বিভ্রান্ত করে, ব্যস্ত করে, অমনোযোগী করে রাখলেন, সেই সুযোগে শিশুপালবধ সাঙ্গ হলো।

এই হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা, যা পূর্বেই কী ভাবে কী করতে হবে স্থিরীকৃত ছিলো, তার সমস্ত প্রক্রিয়াটাই যুধিষ্ঠিরের অনুমোদনে কৃষ্ণের বুদ্ধিতে যে সংগঠিত হয়েছিলো সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যজ্ঞবাড়ির কোলাহল তখন তুঙ্গে। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, জ্ঞাতিকুল, সহকারীগণ, নানা দেশ থেকে আগত প্রধান প্রধান সব ক্ষত্রিয়রা ও অমাত্যবর্গ, লোকে লোকারণ্য। সেইসব হট্টগোলে আর দীয়তাং ভুজ্যতাং শব্দে আকাশ পরিব্যাপ্ত। তার মধ্যে কাকে কোথায় কী উদ্দেশ্যে নিয়োগ করে রাখা হয়েছিলো কে লক্ষ করেছে? মন্ত্রণাপ্রদানে সুচতুর বাসুদেব প্রকৃতই অতি দক্ষ। অনবধান ব্যক্তিকে পিছন থেকে লুকিয়ে সংহার করানোই তার ধর্ম। এই হত্যাকাণ্ড অতি নিপুণতার সঙ্গে সাঙ্গ হলো। শব্দসমুদ্রের মধ্যে একটু উঁচু থেকে নিজেকে আড়াল করে রেখে খুব কাছে থেকেই কেউ আঘাত করেছিলো শিশুপালকে। আঘাতের প্রচণ্ডতা এতো অধিক ছিলো যে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মস্তক বিদীর্ণ হয়ে গেলো। যে গুরভার লৌহচক্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছিলো, কোনো মানুষের পক্ষে সে আঘাত সহ্য করা সম্ভব নয়। চক্রের ফলা অতি সুতীক্ষ্ণ ছিলো। মহাভারতে অবশ্য 'মধূসূদনের চক্র' নামক অলৌকিক বস্তুকে নিয়ে আসা হয়েছে কৃষ্ণের গরিমা প্রকট করতে, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে শিশুপালের মতো বীরকে বধ করার জন্য নিশ্চয় সেই রকমই এক বলিষ্ঠ গুপ্তঘাতক সংগ্রহ করা হয়েছিলো, যার হাতের জোরও প্রচণ্ড। চোখের পলকে কী ভাবে যে নৃপতিদের অমনোযোগের সুযোগে (যে সুযোগটা কৃষ্ণ দিচ্ছিলেন নিজের ক্ষমতার গল্প শুনিয়ে) ঘটনাটা ঘটে গেলো বোঝাও গেলো না।

অকস্মাৎ এই রকম একটি ভয়ঙ্কর মৃত্যু প্রত্যক্ষ করে নৃপতিগণের বাক্য স্ফূরিত হলো না। সবাই নিঃশব্দ হয়ে রইলেন। ভয়ে বিস্ময়ে কেউ এর বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারণ করতে সাহস পেলেন না। নিঃশব্দেই কেউ কেউ ক্রোধে করে কর পেষণ করলেন, কেউ কেউ ওষ্ঠ দংশন করতে লাগলেন, কেউ কেউ ভীষণ ক্রোধে ক্ষিপ্ত বোধ করলেন, কেউ বা উদাস ভঙ্গিতে

অন্যদিকে তাকিয়ে থাকলেন, অনেকে আবার এটা কৃষ্ণেরই অলৌকিক লীলা ভেবে কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি অনুভব করলেন। অতঃপর বাসুদেব সম্পূর্ণ নির্ভয় হয়ে শঙ্খচক্রগদা হস্তে আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত ঐ যজ্ঞ রক্ষা করলেন।

৫

তদনন্তর যজ্ঞশেষে একে একে সকলেই বিদায় নিলেন। দুর্যোধন আর তাঁর মাতুল সৌবল ময়দানবের তৈরি অভূতপূর্ব সভাটিতে বসেছিলেন। অন্যান্য অতিথি ও নৃপতিবৃন্দ ইত্যাদিরা বিদায় নিলে দুর্যোধন সভাকক্ষটি পর্যবেক্ষণ শুরু করে অবাক হয়ে গেলেন। দুর্যোধন সভামধ্যে একটি স্ফটিকময় স্থলে এসে ভীষণ লজ্জিত হলেন। তিনি সত্যি জলভ্রমে বসন উত্তোলিত করেছিলেন। পুনরায় অন্যত্র, স্থলভ্রমে জলের মধ্যে পড়ে গেলেন। একটু দূরে দাঁড়িয়ে দুর্যোধনকে সে অবস্থায় দেখে ভীম তাঁর কিঙ্করগণের সঙ্গে অতি উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন। পরে যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে উত্তম শুষ্ক বস্ত্র এনে দিলেন। দুর্যোধন তার পরেও পুনরায় পূর্বের মতো স্থলভাগে জলের আশঙ্কা আর জলে স্থলের আশঙ্কা করে কেবলই ভুল করছেন দেখে ভীম অর্জুন নকুল সহদেব সকলেই উপহাস করতে লাগলেন। দুর্যোধনের পক্ষে এই উপহাস অসহ্য বোধ হচ্ছিলো, কিন্তু করবার কিছু ছিলো না। তার ওপরে সাজানো সভার কৌশলে নানাবিধ প্রতরণার সম্মুখীন হয়ে তাঁদের নিকট আরো হাস্যাস্পদ হলেন। এমনকি কৃষ্ণ পার্থ দ্রৌপদী এবং অনেক মহিলারা পর্যন্ত এমন হাস্যতরঙ্গ তুললেন যে বেদনা অপমান সব মিলিয়ে দুর্যোধন যেন আর দুর্যোধনের মধ্যে রইলেন না।

পাণ্ডবরা যদি তাঁকে নিজেদের ভ্রাতা বলেই গণ্য করতেন তবে কি তাঁরা তাঁকে এমন মর্মান্তিকভাবে উপহাস করতে পারতেন? এমনকি নববধূ দ্রৌপদী পর্যন্ত কী অশালীন ব্যবহার করলেন! দুর্যোধন একজন বিশ্ববরেণ্য রাজা, সেই সম্মানটাও তাঁকে দিলেন না ওঁরা। আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসার উদ্দেশ্য কি তবে এভাবে নিজেদের ঐশ্বর্য দেখিয়ে অপমান করা? তাচ্ছিল্য দেখিয়ে হাস্যাস্পদ করা? দুর্যোধন তাঁদের কী ক্ষতি করেছেন? তাঁদেরও নয়, আর কারোরই নয়। পাণ্ডুরা ক্ষেত্রজ হিশাবে ক্ষত্রিয় হয়ে যে সব অন্যায় কর্ম অবলীলাক্রমে করে চলেছেন, তেমন একটি কর্মও দুর্যোধনের দ্বারা সাধিত হয়নি। জতুগৃহ দাহ করে, অতগুলো লোককে পুড়িয়ে মেরে, তাঁর নামে দোষ চাপিয়ে, ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে নিজেদের প্রচ্ছন্ন রেখে, দ্রুপদরাজার কন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় গিয়ে উপস্থিত! সবই যে বিদুর আর ব্যাসদেবের সাহায্যে হচ্ছে সেটা বোঝবার জন্য খুব বেশি বুদ্ধি খরচ করতে হয় না।

প্রত্যাবর্তনকালে দুর্যোধন নিতান্তই বিমর্ষ ছিলেন, অন্যমনস্ক ছিলেন, তাঁর মাতুল তাঁকে চিন্তাকুলচিত্তে গমন করতে দেখে বললেন, 'দুর্যোধন, তোমার কী হয়েছে? এরকম বিষণ্ন মনে গমন করছো কেন?'

দুর্যোধন বললেন, 'আমার এমন অন্তর্দাহ হচ্ছে যে আর বেঁচে থাকার বাসনা অনুভব করছি না। একটা প্রতিশোধস্পৃহায় আমি দহ্যমান হচ্ছি। পাণ্ডবরা নিজেদের জয়ী করবার জন্য কৃষ্ণের পরামর্শে এমন কোনো পাপ কিংবা দুষ্কর্ম নেই যা করতে পরাঙমুখ হয়েছে। সবাই জানে আমি তাদের ভ্রাতা। কিন্তু তারা কি জানে? ওদের সভা যে-ভাবে নির্মিত হয়েছে তাতে যে ভ্রম অনিবার্য, জলকে স্থল ভাবা, স্থলকে জল ভাবা বা বহির্গত হবার জন্য স্ফটিকভিত্তিকে দ্বার বিবেচনা করে অগ্রসর হওয়ামাত্র মস্তকে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে ফিরে আসা, বা অন্য কোনো প্রতারক-দ্বারে ধাক্কা দিয়ে পতিত হওয়া, এইসব হবে জেনেই তারা অপেক্ষা করছিলো সকলের সম্মুখে আমাকে হাস্যাস্পদ করবার জন্য। এইসব হঠকারিতা আমাকে নিঃশব্দে সহ্য করতে হয়েছে। হে মাতুল! শিশুপালকে ওরা যেভাবে হত্যা করলো তা দেখে সমস্ত নৃপতিকুলই স্তম্ভিত হয়ে যেমন নিঃশব্দে ছিলেন, আমাকেও সেইরূপ নিঃশব্দেই ফিরে আসতে হয়েছে। ক্ষত্রিয়দিগের কোনো ধর্মই ওরা পালন করে না। ক্ষত্রিয়দের সম্মুখযুদ্ধই ধর্ম। যেভাবে অন্তঃপুরে ঢুকে ওরা জরাসন্ধকে মেরেছে, যেভাবে শিশুপালকে মেরেছে, সেটার নাম কি বীরত্ব? যুদ্ধ? এই অসীম ধনরাশির অধিকারী হয়েও তাদের চিত্তশুদ্ধি হলো না। হে মাতুল! কারো মর্মপীড়াই কেউ বোঝে না। একমাত্র সে নিজেই জানে সেই অপমান কী অকথ্য বেদনাবোধে একটা মানুষকে মৃত্যুর সীমানায় নিয়ে যায়। আমার বেদনা আমি আর যার হৃদয়েরই সংক্রামিত করতে পারি, আমার পিতৃহৃদয়ে যে পারবো না, তা আমি জানি। তিনি বিদুরের আনুগত্যে আচ্ছন্ন। বিদুর তাঁকে আমার প্রতিও অবিশ্বাসে বিমোহিত করে রেখেছেন। শুধুমাত্র পিতার প্রতিই বা কেন, পিতামহ ভীষ্ম, গুরুদেব দ্রোণ সকলেই বিশ্বাস করেছেন বিদুরের বাক্য। পিতা ধৃতরাষ্ট্র প্রতিপদেই পথভ্রষ্ট হচ্ছেন। পরিণত প্রাজ্ঞ হয়েও স্বীয় কার্যসাধনে যত্নবান নন। তিনি কখনো একথা ভাবছেন না, রাজাদের সর্বদাই অপ্রমত্তচিত্তে স্বীয় স্বার্থচিন্তা করাই কর্তব্য। গূঢ় কিংবা বাহ্য উপায়ে, যার দ্বারাই হোক, শত্রুকে যাতে চিহ্নিত করা যায় সেই উপায়ই গ্রহণ করা উচিত। সেই উপায়ই শস্ত্রধারীদের শস্ত্র স্বরূপ। কেউ আমার পক্ষে থাকুক বা না থাকুক, আমি আমার একার ক্ষমতা বলেই যুদ্ধ করবো। তথাপি আমি আমার সম্মান আর এভাবে আহত হতে দেবো না।'

শকুনি বললেন, 'একথা বলছো কেন? তোমার পক্ষে আমরা সবাই আছি। তোমার ভ্রাতারা, আমি, তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু কর্ণ, তোমাদের অর্থবহ ভীষ্ম দ্রোণ সবাই। কিন্তু সেটা কথা নয়। তোমার পিতাই তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন। অবশ্যই বিদুরই তাঁকে মত দেবেন না। পাণ্ডবরা এখনো তো ঠিকমতো গুছিয়ে বসতে পারেননি। সবে তো যজ্ঞ শেষ হলো।'

পিতার কথা দুর্যোধন জানেন। খুব ভালোই জানেন। যে বিদুর তাঁর আসল শত্রু, তাঁকেই তিনি সর্বোৎকৃষ্ট মিত্র বলে হৃদয়ে সবচেয়ে বড়ো আসন পেতে বসিয়ে রেখেছেন। সেই আসনে

দুর্যোধনের ঠাঁই নেই। সেখানে দুর্যোধনের কোনো কথার কোনো মূল্য নেই। দুর্যোধনের নামে মিথ্যা অপবাদের কোনো শেষ রাখেননি বিদুর। জতুগৃহ যে যুধিষ্ঠিরই পাঁচটি পুত্রসহ একটি নিরাপরাধ মাতাকে এবং পুরোচনকে দগ্ধ করে, নিজেরা নিরাপদে সেখানে থেকে পাতাল পথে নেমে অন্যপথে নিরুদ্দেশ হয়েছেন, তা কি বিদুর জানেন না? নিরুদ্দেশ হয়ে কীভাবে নদী অতিক্রম করে ব্যাসদেবের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন তা-ও তিনি জানেন। সবই তো তাঁর কীর্তি। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ীই সব হয়েছে। কিন্তু সে কথা কি কারোকে বলেছেন তিনি? সকলকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানানোই তাঁর কাজ। রাজা প্রজা সবার কাছে বদনাম রটাচ্ছেন দুর্যোধনের। এটা নিশ্চয়ই সৎকর্ম বা সত্য কথা নয়। কিন্তু যেহেতু বিদুর স্বয়ং ধর্ম, সেহেতু তাঁকে সকলেই বিশ্বাস করেন, তাঁর কথাই একমাত্র বলে মেনে নেন। প্রতিবাদ করে লাভ নেই। নিঃসন্দেহে বিদুরের পাঠানো লোক দিয়েই মাটির তলার পথ তৈরি হয়েছে। সেখান থেকে অন্যদিকের যে পথে পাণ্ডবরা উঠে এসেছেন আকাশের তলায়, সেখানে বিদুরের পাঠানো পথপ্রদর্শকই অপেক্ষা করছিলো। বিদুরের পাঠানো যন্ত্রযুক্ত নৌকোর কাছে সেই পথপ্রদর্শকই নিয়ে এসেছিলো তাঁদের। সেই নৌকাতেই তাঁরা অপর তীরে অবরোহণ করে, বিদুরেরই মানচিত্র অনুযায়ী পথ চলে পথের সীমানায় মিলিত হয়েছিলেন দ্বৈপায়নের সঙ্গে। সমস্ত ব্যাপারটাই ঘটেছিলো তাঁর চক্রান্তে। কণামাত্রও কি তিনি জানতে দিয়েছিলেন কাউকে? বলেছেন সবই দুর্যোধনের কর্ম। এই মহাগ্রন্থে অধার্মিকের অবতারই ধার্মিকের মুখোশ পরে এইসব অপকর্ম করে বাহবা পেয়েছেন। ধৃতরাষ্ট্রের অতিশয় পুত্রবাৎসল্যের জন্যই যে এতো সব দুর্ঘটনা ঘটতে পেরেছে সে বিষয়ে কারো মনেই কোনো সন্দেহের অবকাশ রাখেননি বিদুর। অথচ ভীষ্ম-দ্রোণ-ধৃতরাষ্ট্র প্রত্যেকেই বিশ্বাস করেছেন, সব কুকর্মের জন্য দুর্যোধনই দায়ী। তথাকথিত 'পুত্রবৎসল পিতা' সততই ছেলের বিপক্ষে। ধৃতরাষ্ট্র যা-ই বুঝুন বা না বুঝুন, দুর্যোধন ঠিকই বুঝেছেন হস্তিনাপুরের সিংহাসনটিই পাণ্ডবদের আসল লক্ষ্য; এই লক্ষ্যপূরণের জন্যই তাঁকে হেয় করতে উঠে পড়ে লেগেছেন বিদুর এবং পাণ্ডবরা। শত্রু তাঁদের ধৃতরাষ্ট্র নন, দুর্যোধন। ক্ষমতা তাঁরা কম সংগ্রহ করেননি। বিপুল ঐশ্বর্যেরও অধিকারী হয়েছেন। আকস্মিকভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধৃতরাষ্ট্রকে সিংহাসনচ্যুত করা আদৌ কঠিন নয়। কঠিন দুর্যোধনকে স্ববশে আনা। নিজের ক্ষমতায় অনেক উঁচুতে তিনি উঠে গেছেন। শিশুপাল বলেছিলেন, 'এই সাগরাম্বরা পৃথিবীতে যিনি অদ্বিতীয় সেই রাজেন্দ্র দুর্যোধন তো এখানে উপস্থিত, তাঁকে স্তুতি করতে ইচ্ছা হয় না তোমার?' এই বাক্য নিশ্চয়ই তাঁদের বুকে শেল বিদ্ধ করেছিলো। হয়তো সেই ক্রোধই এইভাবে তাচ্ছিল্যের দ্বারা কিঞ্চিৎ প্রশমিত হলো। জানিয়ে দিলো, তোমাকে আমরা ভয় পাই না, তুচ্ছজ্ঞান করি। কিন্তু সত্যিই কি তাই?

পিতা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের জন্য যখন যা করেছেন দুর্যোধন কখনো সে বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি বা বাধা দেননি। এই যে ধৃতরাষ্ট্র কতো সমাদর করে, কতো যৌতুক পাঠিয়ে,

দ্রৌপদীকে কুলবধূর সম্মান দিয়ে গ্রহণ করলেন, সেটা তাঁর ঔদার্যেরই পরিচয় বহন করে। পাণ্ডবরা তো তাঁকে তাঁদের বিবাহের সময়ও ডাকেননি। পাঁচজন পুরুষ একটিমাত্র মেয়েকে বিবাহ করে আর্য ও ক্ষত্রিয় সমাজের যে বিরুদ্ধাচার করলো, সেজন্যও বিন্দুমাত্র তিরস্কার করেননি। বরং তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন, গোলমালের দরকার নেই। যেমন পাঁচটি বহিরাগত কিশোরকে কুন্তীর বাক্যানুযায়ী পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ বলেই গ্রহণ করে সব সমস্যার নিরসন করেছিলেন, এখানেও সেটাই করলেন। এবং পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ হিশাবেই রাজ্যের অর্ধাংশ দিলেন। তা নিয়েও দুর্যোধন একটি বাক্যও উচ্চারণ করেননি। তথাপি তাঁর প্রতি এঁদের এই আক্রোশ কেন?

কেন, সেটা কেউ বলে না দিলেও বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না। সম্পূর্ণ রাজত্বের দখল নেবার একমাত্র অন্তরায় হবেন যিনি, তাঁর নাম দুর্যোধন। দুর্যোধন বেঁচে থাকলে যুদ্ধ বিনা সাম্রাজ্য দখলের অন্য কোনো পথ নেই। অতএব, এই লোকটিকে যদি ধৃতরাষ্ট্রকে দিয়ে ত্যাজ্যপুত্র করানো যায়, বা কোনো না কোনোভাবে নিধন করানো যায়, তা হলে চোখের পলকে সরিয়ে দেওয়া যাবে ধৃতরাষ্ট্রকে। যুদ্ধকে যতোই এড়িয়ে চলা যায়, ততোই মঙ্গল। ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ অশ্বত্থামা যেদিকে একত্রিত হবেন, সেখানে জয়ী হওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু পিতাকে সেটা বলা না বলা দুই-ই সমান। পিতার নিকট তাঁর পুত্র দুর্যোধন যা বলবেন, তদপেক্ষা বিদুর যা বলবেন তার মূল্য অনেক বেশি। পরন্তু, পিতার নিকট দুর্যোধন যা বলেছেন তা-ও বলে দেবেন। বিদুর নিত্য পিতার নিকট বসে তাঁর পুত্রের মৃত্যুকামনা করছেন, পিতা নিঃসাড়। এক নৌকার সঙ্গে বদ্ধ অন্য নৌকার মতো তিনি বিদুর যেভাবে চালাচ্ছেন চলছেন। বিদুরই তাঁর অনুশাসক। ধৃতরাষ্ট্রের জানা উচিত, জন্মের পর থেকে ক্রমশ যেমন শরীরের বৃদ্ধি হয়, সেই রকম যে রাজা সম্পদের ক্রমিক বৃদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনিই জ্ঞাতিগণের মধ্যে সমৃদ্ধ হন। পরাক্রমই তৎকালীন উন্নতির উপায়স্বরূপ। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, পাণ্ডবেরা নানা দেশের নৃপতির সঙ্গে বন্ধুতা করে, কৃষ্ণের সহায়তা লাভ করে, জরাসন্ধ আর শিশুপালকে নিধন করে, অতিশয় বলশালী হয়েছেন। উদ্বেগহীনও হয়েছেন। এখন শুধু একটু গুছিয়ে বসা। তার পরের কর্মই হবে ধৃতরাষ্ট্রকে উচ্ছিন্ন করে সম্পূর্ণ অধিকারের জন্য এই রাজ্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া। তারপর অখণ্ড রাজ্যের রাজ্যেশ্বর হয়ে সিংহাসনে উপবেশন। পাণ্ডব এবং কুরু এই দুটি নাম কার রচনা সেটা না জানলেও সম্পর্কের মধ্যে এই যে একটা শুষ্ক মরুভূমি তৈরি হয়েছে এটা বিদুরেরই অবদান। সম্পর্কের কথা বাদ দিয়েও, দুর্যোধনের মতো একজন দেশবরেণ্য রাজা যদি এই অপমান সহ্য করে, চোরের মতো ফিরে এসে চুপিচুপি বসে থাকেন, তদপেক্ষা বেশি পরাজয় আর কী হতে পারে? সেই পরাজয় আর মৃত্যু দুই-ই সমান। এর যদি কোনো প্রতিবাদ না করেন তবে তো ওরা তাঁকে সময় সুযোগ মতো সর্বদাই এভাবে তাচ্ছিল্য করবে। অপমান করবে। সুযোগ পেলে চক্রান্ত করে নিধনও করতে পারে। এরা তো কৃষ্ণের পরামর্শে সম্মুখ

যুদ্ধের অপেক্ষা অন্যায় হত্যার রাজনীতিই অনুসরণ করছে। যদি সুযোগ না থাকে, সুযোগ তৈরি করে নিতে কতোক্ষণ? এই অসম্মানের জবাব তাঁকে দিতেই হবে, সেটা যে উপায়েই হোক।

ফিরে এসে ধৃতরাষ্ট্রকে দুর্যোধন জানালেন সেকথা। ধৃতরাষ্ট্রের তাতে কোনো চৈতন্য উদয় হয়েছে বলে মনে হলো না। তাঁর ধারণায় উৎকৃষ্ট অন্নভোজন আর উৎকৃষ্ট বস্ত্রপরিধানই সব। তিনি জানেন না, কাপুরুষেরাই অশনে বসনে পরিতৃপ্ত হয়ে থাকে, অধর্মপুরুষেরাই অমর্ষশূন্য হয়। দুর্যোধন যাঁদের এতো বড় শত্রু, তাঁরাই বা দুর্যোধনের কাছে মিত্র হবেন কেমন করে? তাঁদের তিনি বিনষ্ট করতে কেন বদ্ধপরিকর হবেন না? যুধিষ্ঠিরের দীপ্যমান রাজলক্ষ্মী, যার গর্বে গর্বিত হয়ে সবাই মিলে তাঁকে এতোখানি যন্ত্রণায়, লজ্জায়, অপমানে দগ্ধ করেছে, সেই রাজলক্ষ্মীকেই বা কেন তিনি কেড়ে নেবেন না? ওরা তাঁর বীরত্ব দেখুক একবার। দুর্যোধন লুকিয়ে হত্যা করতে অক্ষম, সেটা তাঁর ক্ষত্রিয় ধর্মের বিপরীত পন্থা। কিন্তু যোদ্ধা হিশেবে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে জানেন তিনি। সভাচত্বরে জলভ্রমে পরিচ্ছদ উৎক্ষিপ্ত করলে, ওরা তাঁকে শত্রুসম্পত্তি দর্শনে বিভ্রান্ত ও রত্নানভিজ্ঞ মনে করে উপহাস করেছিলো। সেই উপহাসের শাস্তি তাদের দিতেই হবে। এজন্যই, অভ্যুদয় কালেই শত্রুদের উপেক্ষা না করে, পরিবর্ধিত ব্যাধির ন্যায় মূলোচ্ছেদ করা উচিত। সামান্য কণ্টকও কালক্রমে ব্রণকারণ হয়ে ওঠে।

মাতুল পূর্বেই বলেছিলেন, ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধে কিছুতেই রাজি হবেন না, বিদুরই দেবেন না সেটা, কেননা এখনো ওরা প্রস্তুত হতে পারেনি।

ঠিকই বলেছিলেন। সব শুনে পিতা বললেন, 'হে পুত্র! যুদ্ধ করা আমার অভিপ্রেত নয়।'

এরপরে ধৃতরাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে আরো নানা বিষয় পর্যালোচনার পরে সৌবল নির্জনে বললেন, 'একটা উপায় আছে যা তোমাকে তোমার মনোমতো স্থানে হয়তো পৌঁছে দিতে পারে। সেটা কোনো গোপন ষড়যন্ত্র নয়, ছদ্মবেশে কারো অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হয়ে কারোকে নিধন করাও নয়, কোনো কাপুরুষের নীতিও নয়। রাজাদের একটা ব্যসন মাত্র। আমি অক্ষবিদ্যায় অভিজ্ঞ, মর্মজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ। যুধিষ্ঠির দ্যূতপ্রিয়, কিন্তু তদ্বিষয়ে তাঁর নিপুণতা নেই। ক্ষত্রিয় রীতি অনুসারে দ্যূতের নিমিত্ত আহ্বান করলে তিনি আসবেন, এবং আমি অতি সহজেই তাঁকে পরাস্ত করবো।'

কথাটা দুর্যোধন খুব পছন্দ না করলেও মন্দের ভালো এটাই ভেবে নিলেন। তাঁর ইচ্ছা করছিলো মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই অসম্মানের ভালো জবাব দেন। শিশুপাল কৃষ্ণের শত্রু আর দুর্যোধন পাণ্ডবদের শত্রু। শিশুপালকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে যেভাবে যথেষ্ট পরিমাণে অপমান করা হয়েছিলো এবং বধ করা হয়েছিলো, সেটা মেনে নেওয়া সহজ নয়। আর নিধন না

করলেও চূড়ান্ত অপমান তাঁকেও করা হয়েছে। দুর্যোধন এবং পাণ্ডবগণ একই কুরুবংশের সন্তান হিশাবে গণ্য, পরন্তু যার যার পিতার অংশ তারা তারাই সঠিকভাবে ভোগ করছে। উপরন্তু, এই মুহূর্তে রাজসূয় যজ্ঞ করে পাণ্ডবরা যেখানে পৌঁছেছেন, তাঁদের ব্যবহার সেই মর্যাদার উপযুক্ত শালীনতার গণ্ডিতে পড়ে না, সদ্বংশের গণ্ডিতে পড়ে না। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রকে কে বোঝাবে সে কথা?

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, 'বিদুর আমাদের মন্ত্রী, বিদুর আমাকে যে মন্ত্রণা দেবেন, আমি তাই শুনবো। বিদুর দূরদর্শিতা প্রভাবে উভয় পক্ষের মঙ্গল ও ধর্মানুসারে মন্ত্রণা দেবেন।' বলাই বাহুল্য, বিদুর সব শুনে দুর্যোধনের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করলেন।

মহাভারত নামের পুস্তকটিতে যেমন ধর্ম বলতে বিদুরকে বোঝায়, সত্যবাদী বলতে যুধিষ্ঠিরকে বোঝায়, পুত্রস্নেহে অন্ধ বলতে বোঝায় ধৃতরাষ্ট্রকে। এই সব ক'টি প্রবাদই নিতান্ত অসত্য। বিদুরের মতো অধার্মিক যেমন সচরাচর দেখা যায় না, দু'একটা অনৃতভাষণ এই পুস্তকে যাঁর মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে তাঁর নামই যেমন যুধিষ্ঠির, স্বীয় পুত্রকে মরার বাড়া গাল দিয়েও যাঁর হৃদয়ে বিন্দুমাত্র কষ্টের সঞ্চার হয় না, তিনিই হচ্ছেন ধৃতরাষ্ট্র।

ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের পরামর্শ নিয়ে বললেন, 'বিদুর যখন অক্ষবেদনে অনুমোদন করছেন না, তা হলে এসবে প্রয়োজন নেই। তোমার কী অভাব? তুমি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত, পৈতৃক রাজ্য বর্ধিত করেছো, প্রতিনিয়ত আজ্ঞাপ্রচার করে দেবেশ্বরের ন্যায় দীপ্তি পাচ্ছো, তবে তোমার দুঃখের বিষয় কী বলো?'

দুঃখের বিষয়টা যে কী সেটা কি দুর্যোধন বলেননি? পুত্রের সেই অসম্মানে পিতা হয়ে তাঁর হৃদয়ে কি কোনো প্রতিক্রিয়া হয়েছে? বেদনার সঞ্চার? অপমানবোধ? কী ভাবে সবাই মিলে তাঁকে উপহাস করলো! দ্রৌপদী পর্যন্ত! তার প্রতিও দুর্যোধনের কি কিছু কম প্রতিশোধস্পৃহা জন্মেছে? প্রতিশোধস্পৃহা কর্ণেরও কিছু আছে বৈকি! কী ভাবে স্বয়ংবর সভায় জাত তুলে কর্ণকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন দ্রৌপদী, তা কি ভোলা সম্ভব? আর তারপরে কী হলো? যে কন্যা উদ্ধত প্রতিবাদে কর্ণকে প্রত্যাখ্যান করে অর্জুনকে বরমাল্য দিলেন, তাঁকে বিয়ে করতে হলো পাঁচজনকে। পাঁচজনকে বিয়ে করা মেয়ের পক্ষেই বুঝি নববধূ হয়েও ওরকম নির্লজ্জ হাসি শোভা পায়। যে নারী পাঁচজনের সঙ্গে বিবাহে সম্মতি দেয়, তোকে সমাজ এবং অন্যান্য পুরুষ সম্ভ্রমের চোখে দেখে না। সুযোগ পেলে দুর্যোধন তাঁকে ছেড়ে দেবেন না। পিতাকে বোঝানো অসম্ভব, কে শত্রু কে মিত্র এটা কারো শরীরে লেখা থাকে না। সেরকম কোনো সাংকেতিক শব্দও নেই। যে যাকে সন্তাপিত করে শুধু সে-ই জানে কে কার শত্রু।

এর পরে আর পিতার সঙ্গে কোনো বিতর্কে গেলেন না দুর্যোধন, কিন্তু নিজের সংকল্প থেকেও

চ্যুত হলেন না। জীবনে এই প্রথম উপলব্ধি করলেন দুষ্টু লোকের মিথ্যা প্রচারে স্বীয় সম্মানকে পদাহত হতে দেওয়াও একধরনের কাপুরুষতা। ক্ষতি যা করবার বিদুর সেটা ষোলো আনার স্থলে আঠারো আনাতেই পৌঁছে দিয়েছেন। এইবার একটা হেস্তনেস্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এমন কোন দুর্নাম আর তাঁর বাকি আছে যা মুখে মুখে বিদুর মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে রটিয়ে বেড়াননি? ধৃতরাষ্ট্র না জানুন, দুর্যোধন জানেন বিদুর যতোটাই পাণ্ডবগণের হিতৈষী, ততোটাই ধার্তরাষ্ট্রদের অহিতাকাঙ্ক্ষী। স্থির করলেন, হয় অক্ষবেদনে যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ জানাবেন, নচেৎ যুদ্ধে নিহত হবেন। তিনি জানেন, পৌরুষশালী ব্যক্তি পরমার্থের সাপেক্ষ হয়ে স্বকার্য সাধনে প্রবৃত্ত হয় না। কর্তব্যানুষ্ঠান বিষয়ে দুইজনের মত সমান হওয়া নিতান্ত দুর্ঘট। কী ব্যাধি কী মৃত্যু কেউ শ্রেয় প্রাপ্তির জন্য প্রতীক্ষা করে না। অতএব ভবিষ্যৎ কালের অপেক্ষা না করে শ্রেয়স্কর কর্মের অনুষ্ঠান করাই কর্তব্য। দুর্যোধন দৃঢ়ভাবে বললেন, ‘হয় পাণ্ডবলক্ষ্মী লাভ করবো, নতুবা আমার প্রাণধারণের আবশ্যকতা নেই।’ পুত্রের এই দৃঢ় কণ্ঠ শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্র ভৃত্যগণকে আদেশ করলেন, ‘তোমরা সহস্রস্তম্ভশোভিত হেমবৈদুর্যখচিত শতদ্বারবিশিষ্ট ক্রোশায়ত তোরণস্ফটিক নামে এক মহতী সভা শীঘ্র নির্মাণ করো।’

তাই হলো। সুনিপুণ শিল্পীগণ শীঘ্র সভা নির্মাণ করে সমুচিত দ্রব্যসামগ্রীতে সুশোভিত করে স্বল্পকাল মধ্যেই বহুরত্নে খচিত ও বিচিত্র হেমাসনে শোভিত করলেন। সভা সুসম্পন্ন হলো। তারপরেই ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে বললেন, ‘তুমি ইন্দ্রপ্রস্থ গিয়ে যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে এসো।’

সঙ্গে সঙ্গে বিদুর বিরক্ত হয়ে বললেন, ‘আপনার এই ইচ্ছে আমি কোনোরকমেই সমর্থন করতে পারছি না। আপনি আমাকে এই অনুমতি দেবেন না। এতে সুহৃদভেদ হয়।’

কথাটা অযৌক্তিক নয়। কিন্তু সুহৃদভেদ হয়েছে বলেই যে এই আয়োজন তা-ও বিদুর জানেন। রাজত্ব পেয়েও তাঁদের মন থেকে যে দুর্যোধনের প্রতি এক কণা বিদ্বেষও প্রতিহত হয়নি, সেটা অকাট্য সত্য। অতি প্রতাপশালী একজন রাজা, যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী, সৈন্যস্থাপনে সুযোগ্য, তাঁর পক্ষে ভীষ্ম আছেন, দ্রোণাচার্য আছেন, অশ্বত্থামা আছেন, আছেন কর্ণ। সুস্থির হয়ে বসে তবে তো পাণ্ডবরা এদিকে মন দেবেন? সুতরাং দুর্যোধনকে তো তাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বীর দৃষ্টিতেই দেখবেন। এ অবস্থায় যুধিষ্ঠির যদি জুয়াখেলায় মত্ত হয়ে উঠে হেরে যান, তবে তো সব গেলো। এই ভীতিতেই বিদুর কিছুতেই মত দিতে পারেন না।

কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র বললেন, ‘দৈব প্রতিকূল না হলে কলহ আমাদের পরিতাপিত করতে পারবে না। তুমি কুন্তীপুত্রকে গিয়ে নিয়ে এসো।’

অগত্যা যেতেই হলো বিদুরকে। ইন্দ্রপ্রস্থে পৌঁছে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'ধৃতরাষ্ট্র পাশাক্রীড়াচারীদের সম্মেলন ডেকেছেন। তুমি সেই ধূর্ত পাশাক্রীড়াচারীদের দেখবে। আমি ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞাবাহী হয়েই এসেছি। নিবৃত্ত করতে অনেক চেষ্টা করেছিলাম। তত্রাচ আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে। এখন তুমি যা শ্রেয়স্কর মনে করো, তাই করো।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'দুর্যোধন ব্যতীত আর কোন কোন অক্ষবিদ সেখানে আছেন বলুন, আমি তাদের শতবার পরাজিত করবো।'

বিদুর বললেন, 'অক্ষনিপুণ পাকাহাত শকুনি, বিবিংশতি, চিত্রসেন, রাজা সত্যব্রত, জয়, এঁরা সব সেখানে উপস্থিত হয়েছেন।'

বিদুরের অনিচ্ছা বুঝেও যুধিষ্ঠির যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। দ্রৌপদী প্রভৃতি স্ত্রীগণসহ, ভ্রাতাগণসহ, অনুচরসহচরবর্গভিব্যাহারে বেশ জাঁকজমক করেই হস্তিনাপুরে এলেন। সেই রাত্রি সুখে যাপন করে পরের দিন সভামণ্ডপে প্রবেশ করলে শকুনি বললেন, 'এই সভামধ্যে সকলেই তোমার প্রতীক্ষা করছেন। দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ করা যাক।'

যুধিষ্ঠির আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে বললেন, 'দ্যাখো, কপট দ্যূতক্রীড়া অতি পাপজনক। এতে অণুমাত্র ক্ষাত্রপরাক্রম নেই। তুমি কী কারণে পাশাক্রীড়ার প্রশংসা করছো?' একথা শুনে শকুনি অবশ্যই অবাক হয়েছিলেন। কেননা তিনি তো পাশাক্রীড়ার প্রশংসা করেননি। কিন্তু কিছু জবাব দেবার পূর্বেই যুধিষ্ঠির পুনরায় বললেন, 'ধূর্ত কপটাচারীকে কেউ বিশ্বাস করে না।' শকুনি কবে তাঁর সঙ্গে পাশা খেলেছেন যে ধূর্তকপটাচার করবেন? তারপরেই বললেন, 'তুমি যেন নৃশংসের মতো অসৎপথ অবলম্বন করে আমাদের পরাজিত করো না।'

সভাগৃহে প্রবেশ করেই যুধিষ্ঠির অকারণে অভদ্রের মতো কেন এই কর্কশ উক্তিগুলো প্রায় মুখস্থের মতো বলে যাচ্ছিলেন কারোই সেটা বোধগম্য হচ্ছিলো না। দুর্যোধন কেবলমাত্র শ্রুতিগোচরে বিদুরের কথাই শুনছিলেন। যেমন জতুগৃহ তৈরি হলে তা কী কারণে বহ্নিযোগ্য গৃহে প্রবিষ্ট হয়েই ভীমকে বলেছিলেন, এই বক্তৃতাও অনেকটা সেই রকম। আবার বললেন, 'আর্যলোকেরা মুখে ম্লেচ্ছভাষা ব্যবহার ও কপটাচার প্রদর্শন করেন না।' যদিও সেই সভায় এ পর্যন্ত কোনো রাজাই কোনো কথা বলেননি। তদ্ব্যতীত, ম্লেচ্ছভাষা যুধিষ্ঠির ব্যতীত আর কোনো ক্ষত্রিয় অবগতও নন। রাজসূয় যজ্ঞ করে সম্রাট হয়ে তিনি কি ভারসাম্য হারিয়েছেন? যুধিষ্ঠির বলেই যাচ্ছিলেন, কোনো জবাবের সময়ও দিচ্ছিলেন না, 'শোনো, অপকট যুদ্ধই সৎপুরুষের

লক্ষণ। আমি শঠতা করে সুখ ও ধনপ্রাপ্তির ইচ্ছা করি না।' অর্থাৎ যা করে তিনি রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছেন।

আশ্চর্য! এই তো কদিন পূর্বে তিনিই তাঁর ভ্রাতাদের এবং কৃষ্ণকে জরাসন্ধের অন্তঃপুরে পাঠিয়ে কোনো পূজানিবন্ধনে উপবাসী, অসতর্ক জরাসন্ধকে অসহায় পেয়ে কপটযুদ্ধে খুন করালেন! এসব বলতে তাঁর কি একটু লজ্জাও হলো না? তিনি তাঁর স্বীয় লোভ চরিতার্থ করতে ভ্রাতাদের দিয়ে একটি ঘটনাও কি সৎভাবে সম্পন্ন করেছেন? জরাসন্ধকে গভীর রাত্রে একা পেয়ে এভাবে হত্যা করার প্রস্তাবটা অবশ্য কৃষ্ণই দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে তিনি সম্মতি দিলেন কেন? ব্রাহ্মণ সেজে যাওয়াতে জরাসন্ধর নিকট তাঁরা অতি সাদর সম্ভাষণ ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। তিনি কল্পনাও করেননি নিতান্ত অধঃপতিত ইতর ব্যক্তি ব্যতীত কোনো ক্ষত্রিয় সন্তান এরকম কাপুরুষসুলভ কপটাচার করতে পারে। আর কীভাবে শিশুপালকে খুন করা হলো! সেটা ভাবতেও দেহ কণ্টকিত হয়।

শকুনি দুর্যোধনের মাতুল, গান্ধারীর ভ্রাতা। সেকালের নিয়ম অনুযায়ী তিনি কুটুম্বিতা সূত্রে যুধিষ্ঠিরের মাতুল। যদি কোনো বক্তব্য তাঁর থেকেই থাকে, মাতুলজ্ঞানে তাঁকে প্রথমে সম্ভাষণ জানিয়ে, অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের যথোপযুক্ত সম্ভাষণ জানিয়ে, বলতে পারতেন। মনে হচ্ছিলো, কারোকে যেন তিনি তাঁর উচ্চাসন থেকে দেখতেই পাচ্ছিলেন না। তাঁর ব্যবহারে স্পর্ধিত গর্ব যেন স্ফুলিঙ্গের মতো ছিটকে ছিটকে বেরিয়ে পড়ছিলো।

সব শুনে শকুনি বললেন, 'তুমি যদি আমাকে ধূর্ত বলেই স্থির করে থাকো, যদি দ্যূতক্রীড়ায় ভীত হয়ে থাকো, তা হলে দ্যূতক্রীড়া থেকে বিরত হওয়াই ভালো।'

যুধিষ্ঠির বিরত হলেন না। শুরু হলো খেলা এবং একটু বাদেই বোঝা গেলো শকুনি প্রকৃতই দক্ষ খেলোয়াড়। কিন্তু যেহেতু যুধিষ্ঠির সমানেই হারতে লাগলেন, মহাভারতের ভাষ্যে শকুনি সর্বদাই ''শঠতা'' করে তাঁকে হারালেন। যুধিষ্ঠিরের মতো অক্ষবিদ্যায় অনিপুণ ব্যক্তিকে সৌবলের মতো সর্বজনস্বীকৃত দক্ষ এবং অভিজ্ঞ খেলোয়াড় শঠতা বা ধূর্ততা করে কেন হারাবেন? এখানেও সেই প্রচারের মহিমা। রচয়িতা বলেই খালাস, 'শকুনি শঠতা অবলম্বন করে পাশা খেলে বললেন, ''এই জিতলাম''।' আর তার সঙ্গে শুরু হলো বিদুরের অকথ্য ভাষায় দুর্যোধনকে আক্রমণ। তিনি পুনরায় বললেন, 'পূর্বে যে পাপাত্মা জাতমাত্রই গোমায়ুর মতো বিকৃতস্বরে রোদন করেছিলো, সেই কুলান্তক দুর্যোধন সকলের বিনাশের কারণ তাতে সন্দেহ নেই।'

এখানে একটা কথা বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য, দুর্যোধনের জন্য হস্তিনাপুরীর কোনো বিনাশই হয়নি। হবেও না। দুর্যোধন না বাঁচলে ধৃতরাষ্ট্রকে হত্যা করতে এদের সময় লাগতো না। যার

জন্য এই বিনাশের আশঙ্কা, তিনি যুধিষ্ঠির। দুর্যোধন সাগরাম্বরা পৃথিবীর একজন অদ্বিতীয় শাসক বলে স্বীকৃত। রাজা হয়ে তো তিনি পিতৃরাজ্য আলোকিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, বিনাশের কারণ যুধিষ্ঠিরও নয়, বিদুর নিজে, এবং তাকে প্রলম্বিত করে ধ্বংসের মুখে নিয়ে গেছেন তাঁর পিতা দ্বৈপায়ন। সবই অবশ্য ওই একমাত্র যুধিষ্ঠিরের জন্যই। এখন সত্যবতীর কৃপায় সবাই দ্বৈপায়নের পুত্র পৌত্র। কিন্তু ক্ষেত্রজ পুত্র পৌত্র নয়, যারা অবৈধ তারাই প্রধান ভূমিকায়। এখন আর আর্য অনার্যের প্রশ্ন নেই, সবার জন্মই অনার্য, মিশ্রিত রক্তে। এখন শুধু বৈধ-অবৈধের বিবাদ। বিদুর বললেন, 'দুরাত্মা দুর্যোধন দ্যূতমদে মত্ত হয়েছে (যদিও দুর্যোধন খেলছিলেন না)। মহারাজা, পাণ্ডবদের সঙ্গে শত্রুতা করে অচিরাৎ আপনার পুত্রের পতন হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মহারাজ! আপনি আদেশ দিন, সব্যসাচী অর্জুন দুর্যোধনকে বধ করবেন। এই পাপী নিহত হলে কৌরবগণ সুখী হবে। কাকশৃগালতুল্য দুর্যোধনের পরিবর্তে ময়ূরশার্দুল সদৃশ পাণ্ডবদের ক্রয় করুন।'

সমস্ত জীবন ধরে এই একই বাক্য দুর্যোধন শুনে এসেছেন বিদুরের মুখে। জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেখে আসছেন তাঁর জন্মদাতা পিতা এর বিরুদ্ধে একটি বাক্যও উচ্চারণ করেননি। আজ হঠাৎ দুর্যোধনের সমস্ত দুঃখবেদনা ক্রোধ অপমান অসম্মান আগুনের মতো জ্বলে উঠলো রক্তের মধ্যে। অত্যন্ত কষ্টে সংযত হয়ে বললেন, 'হে ক্ষত্ত! সব সময়ে আমাকে অবমাননা করো কেন? তার কারণ, যারা আমাদের শত্রু তুমি তাদের প্রতি অনুরক্ত। তুমি কি ভাবো যে আমি কিছুই বুঝি না? তোমার বাক্যই কৌরবদের প্রতি তোমার মনের প্রতিফলন। তুমি আমাদের আশ্রিত হয়েও কী কারণে উক্ত বিষয়ের বিরুদ্ধ আচরণে প্রবৃত্ত হয়েছো? তুমি আমাদের তিরস্কার করতে চাও করো, কিন্তু আর তুমি এভাবে আমাকে অপমান কোরো না। আমি তোমার মন বুঝেছি, শত্রুকার্যে ব্যাপৃত থেকো না। আমি তো তোমার কাছে আমার হিত জিজ্ঞাসা করি না। তুমি আমার শাস্তা নও। শাস্তা শুধু একজনই। আমি তাঁর শাসনানুসারেই কার্য করে থাকি। তিনি মস্তক দ্বারা শৈলও ভেদ করতে পারেন, গর্ভস্থ শিশুকেও শাসন করতে পারেন। তুমি কেন বলপূর্বক আমাকে অনুশাসন করো?'

বিদুর যে তাঁদের কতো বড়ো শত্রু সেকথা ধৃতরাষ্ট্রের জ্ঞানের মধ্যে কেন যে প্রবিষ্ট হয় না ভেবে পাওয়া যায় না। স্বীয় সন্তান সম্পর্কে অবিশ্রান্ত এসব শুনতে শুনতে কখনো এক পলকের জন্যও কি তাঁর পুত্রের জন্য বিন্দুমাত্র বেদনার সঞ্চার হয় না? পাণ্ডবরা যে গোপনে গোপনে গিয়ে দ্রুপদের সঙ্গে এই সম্পর্ক পাতালো, পাঁচজনে মিলে একটি মেয়েকে বিবাহ করে ভরতকুলকে কলঙ্কিত করলো, কৌরবদের কারোকে কিছু জানালো না, মাত্রই কয়েক দিনের জন্য বারণাবতে গিয়ে এক বছরের মধ্যেও ফিরে এলো না, এ সব নিয়ে তিনি কি কিছুই চিন্তা করেন না? রাজত্বের চাকা ভীষ্মর জন্যই ঘুরছে, আর তাঁর মনের চাকা ঘোরাচ্ছেন বিদুর। তিনি

বিদুরের কথারই প্রতিধ্বনি করে যখন বলেন, তিনি পাণ্ডবদের কিঞ্চিৎমাত্র কোনো দোষ দেখতে পান না, যতো দোষ ঐ দুর্যোধনের—তখন মনে হয় এইরকম একজন মূঢ়মতি মানুষ কী করে রাজার সিংহাসনে বসে আছেন। মানুষটির তো কাণ্ডজ্ঞান বলে সত্যিই কিছু নেই। পাণ্ডবরা যে তাঁকে বিচ্যুত করে ঐ সিংহাসনটিতে বসবার জন্যই এতো কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে, এবং দুর্যোধন জীবিত আছেন বলেই যে আজও তিনি টিকে আছেন, সে কথা তাঁকে কে বোঝাবে? দুর্যোধনের যোগ্যতাতেই যেমন রাজত্বের পরিধি বেড়েছে, তেমন প্রজারাও দুর্যোধনের জন্যই সুখে আছে, শান্তিতে আছে, বিদ্রোহ নেই, এসবও কি তিনি দেখছেন না? বুঝতে পারছেন না? কোথা থেকে কোন পাঁচটি মানুষ পর্বত থেকে নেমে এসে পাণ্ডুর পুত্র সেজে তৎক্ষণাৎই ধৃতরাষ্ট্রকে উচ্ছিন্ন করতে চাইলে বিদুরের কাছে অবশ্যই দুর্যোধন প্রতিবন্ধক। অবশ্যই দুর্যোধনের মৃত্যু চান তিনি, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রেরও তো স্বীয় বুদ্ধিতে কিছু বোঝা উচিত ছিলো।

খেলার প্রারম্ভ থেকেই বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে এমন সব অসম্মানজনক উক্তিতে জর্জরিত করছিলেন, ধৃতরাষ্ট্র যে অতবড়ো সাম্রাজ্যের একজন অধিকমান্য মহারাজা, বিদুরের জ্যেষ্ঠ, এবং বিদুর তাঁর অর্থবহ, সে কথা মনে হচ্ছিলো না। ধৃতরাষ্ট্র তথাপি বিদুরের এই ব্যবহারে কিঞ্চিৎমাত্রও অসম্মান বোধ করছিলেন না।

খেলতে খেলতে যুধিষ্ঠির যখন সর্বস্বই হারালেন, শকুনি বললেন, 'দ্যূতক্রীড়ায় পাণ্ডবদের সবই তুমি নষ্ট করলে। আর তোমার অপরাজিত ধন কী আছে বলো।'

যুধিষ্ঠির দাম্ভিক কণ্ঠে বললেন, 'আমার অসংখ্য ধন আছে। ধনের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করছো কেন? আমি অযুত পদ্ম খর্ব অর্বুদ শঙ্খ মহাপদ্ম নিখর্ব কোটি মধ্য ও পরার্ধসংখ্যক ধনদ্বারা এ সমস্ত জনসমক্ষে তোমার সঙ্গে ক্রীড়া করবো।'

আবার শুরু হলো খেলা। হিতৈষীরা বারণ করেছিলেন, যুধিষ্ঠির শোনেননি। অনুপার্জিত ধনদৌলতের গরম যুধিষ্ঠিরকে তখনো গরম করে রেখেছে। খেললে তিনি আরো যাঁরা খেলতে এসেছিলেন তাঁদের সঙ্গেও খেলতে পারতেন, কিন্তু সেখানে তাঁর দম্ভে আঘাত লাগছিলো। তাঁর জেদ তিনি শকুনির সঙ্গেই খেলবেন। সুতরাং তাঁর সঙ্গেই খেললেন এবং অবধারিতভাবে পুনরায় হেরে গেলেন। হারতে হারতে যখন নিষ্কপর্দক হলেন, তখন একজন একজন করে প্রত্যেকটি ভাইকেও বাজি রেখে হারলেন। শেষে নিজেকেও পণ রাখলেন। তাতেও যখন হারলেন, তখন দ্রৌপদীকে পণ রাখলেন। সকলে হায় হায় করে উঠলো। সমস্ত সভা তাঁর এই অধঃপতিত কর্মে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলো। বৃদ্ধগণ ধিক্কার দিতে লাগলেন। তিনি কিছুই গ্রাহ্য করলেন না। এতোক্ষণ পঞ্চভ্রাতা দুর্যোধনাদিদের দাস ছিলেন এখন তাঁদের পত্নীও তাঁদের দাসী হলেন। বিদুর জন্মাবধি দুর্যোধনকে যতো অপমান করেছেন, তাঁর পুত্র হয়তো সেই ঋণ এইভাবে শোধ

করলেন।

কেবলমাত্র পুত্র যুধিষ্ঠিরই তো নন, সেই সঙ্গে অন্য চারটি পাণ্ডবভ্রাতার সাহায্যে বিদুর সমস্ত রাজ্য সর্বতোভাবে গ্রাস করবার লোভে এতোদিন যাবৎ যতো মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে, একমাত্র বাধাস্বরূপ দুর্যোধনকে আর তার বন্ধু কর্ণকে যতো ভাবে আঘাত করেছেন, এইভাবেই সেই অন্যায়ের প্রতিবিধানের কাছে মাথা নত করতে হলো।

ঠিক সেই নিয়মেই, সেদিন ধনসম্পদে মত্ত হয়ে দুর্যোধনকে দ্রৌপদী এবং কৃষ্ণসহ সর্বজন যেভাবে উপহাস করে যতো আমোদিত বোধ করেছিলেন, দ্রৌপদীকে সভার মধ্যে আনয়ন করে 'দাসী' 'দাসী' বলে তার শোধ নিলেন দুর্যোধন। কর্ণ উপভোগ করলেন। কিন্তু এই ব্যবহার অবশ্যই দুর্যোধনের পক্ষে অতিশয় অশালীন। এই প্রতিশোধের মধ্যে কোনো সভ্যতা ছিলো না। দ্রৌপদীকে দুঃশাসন চুলের বেণী ধরে সভার মধ্যে আনয়ন করে অতি অভদ্রভাবে অতো সব মাননীয় ব্যক্তিদের সম্মুখে শাড়ি ধরে টানাটানি করলো, এটা অবশ্যই অমার্জনীয় অপরাধ। পাণ্ডবরা সবাই যার যার উত্তরীয় ছুঁড়ে দিলেন তাঁর দিকে। কর্ণকে তাঁর যোগ্যতার মূল্য না দিয়ে, পিতাভ্রাতার প্রতিজ্ঞা না মেনে জাত তুলে প্রত্যাখ্যান করে, স্বয়ংবর সভায় দ্রৌপদী যতো অপমান করেছিলেন, অথবা যজ্ঞের দিন ময়দানবের তৈরি অপূর্ব সভাটিতে পুনঃপুন দুর্যোধনকে বিভ্রান্ত করে সদলবলে যেভাবে উপহাস করেছিলেন, সেটাও মার্জনাযোগ্য নয়। কিন্তু এখানে একজন মহিলাকে নিয়ে এই ব্যবহার, বলা যায় সভ্যতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। ক্রোধে অগ্নিমূর্তি হয়ে ভীম বললেন, 'হে যুধিষ্ঠির! দ্যূতপ্রিয় ব্যক্তিরা স্বগৃহস্থিত বেশ্যাগণকেও পণ রেখে খেলে না। তাঁরা তাদের প্রতিও কিঞ্চিৎ দয়া প্রকাশ করে থাকেন।' বলতে বলতে তাঁর সারা দেহ থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছিটকোতে লাগলো। দ্রৌপদী একটা তর্ক তুললেন, যুধিষ্ঠির কার অধীশ্বর হয়ে তাকে দ্যূতে সমর্পণ করেছেন? অগ্রে নিজেকে অথবা পূর্বে দৌপ্রদীকে দুরোদর মুখে বিসর্জন করেছেন?

দুঃশাসনও 'দাসী' 'দাসী' বলে উচ্চৈঃস্বরে হাসছিলেন। এমনই হাসির রোল যেদিন দুর্যোধনকে ব্যথিত করেছিলো, নিজেকে সেদিন নিশ্চয়ই অতি অসহায় এবং দীন বলে মনে হয়েছিলো তাঁর। আজ দ্রৌপদীকে এই হাসির রোল নিশ্চয়ই তেমনি ব্যথিত ও দীনভাবাপন্ন করে তুলছিলো। কৌরবদের আজকের নির্দয় অভদ্র ব্যবহারের পেছনে মূল কথাটা প্রতিশোধস্পৃহা।

তবু দ্রৌপদী স্ত্রীলোক, তারা পুরুষ। তদ্ব্যতীত, দুঃশাসন যেভাবে তাঁকে সভার মধ্যে নিয়ে এসেছে বা যেভাবে তাঁর বস্ত্র ধরে টানাটানি করছিলো, সেটা অতীব অভব্য ব্যবহার। খুব আশ্চর্য, কেউ তা নিয়ে একটা কথাও বলছিলেন না। দ্রৌপদী ক্রন্দন করতে করতে বললেন, 'হায়, ভরতবংশীয়গণের ধর্মে ধিক্। ক্ষাত্রধর্মজ্ঞগণের চরিত্র নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সভাস্থ সমস্ত কুরুগণ স্বচক্ষে কুরুকর্মের ব্যতিক্রম নিরীক্ষণ করছেন, কিন্তু কেউ এদের নিন্দা করছেন না। বোধহয়

এদেরও এই কর্মে অনুমোদন আছে। দ্রোণ ভীষ্ম বিদুর, এঁদের কিছুমাত্র সত্ত্ব নাই। প্রধান প্রধান কুরুবংশীয় বৃদ্ধগণও দুর্যোধনের এই অধর্মানুষ্ঠান অনায়াসে উপেক্ষা করছেন।'

ভীষ্ম বললেন, 'হে সুভগে! একদিকে পরবশ ব্যক্তি পরের ধন পণ রাখতে পারেন না, অন্যদিকে স্ত্রী স্বামীর অধীন, এই উভয়পক্ষই তুল্যবল বোধ হওয়াতে তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর বিবেচনায় আমরা অসমর্থ। বিশেষত যুধিষ্ঠির আপনার মুখে স্বীকার করেছেন, ''আমি পরাজিত হয়েছি''। শকুনি দ্যূতক্রিয়ায় অদ্বিতীয়। যুধিষ্ঠির স্বয়ং তার সঙ্গে ক্রীড়া করতে অভিলাষী। তিনি স্বয়ং তোমার এই অবমাননা উপেক্ষা করছেন। আমরা কী করে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি?'

এই জবাবটা ভীষ্মের উপযুক্ত হলো না। এটা কোনো জবাবই নয়। গৃহবধূকে এভাবে টেনে সভার মধ্যে অপমান করা যে অন্যায়, সে কথাটাই তাঁর বলা উচিত ছিলো। যুধিষ্ঠির তাঁকে পণ্য করে যতো অসম্মানই করে থাকুন, সেটা আলাদা। কিন্তু বিনিময়ে যেভাবে এঁরা আক্রোশ মেটাচ্ছেন, তার প্রতিবাদ করা গুরুজনদের কেবলমাত্র উচিতই নয়, কর্তব্য। কিন্তু তা কেউ করেননি। কেন করেননি? তার মানে কি এটাই ধরে নেবো যে দ্রৌপদী স্ত্রী কিংবা পুরুষ এটা নিয়ে কারো মাথাব্যথা ছিলো না। স্ত্রীলোকের প্রতি আলাদা কোনো সম্মানের প্রশ্ন নেই। যদি তা থাকতো তাহলে দ্রৌপদীকে সভায় এনে সকলের সম্মুখে, বিশেষত যেখানে ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি গুরুজনেরা সকলেই উপস্থিত, সেখানে এই অশালীন আচরণ করার সাহস তাদের কখনোই হতো না। সেকালের সমাজে মাননীয় অতিথি এলে অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে একজন স্ত্রীলোককেও উপঢৌকন দেওয়া হতো। সেই মনোভাব থেকেই কি দ্রৌপদীকে এভাবে সভার মধ্যে টেনে আনায় তাঁরা কোনো অন্যায় দেখতে পাননি?

আরো একটা কথা ভীষ্ম বললেন, 'পরবশ ব্যক্তি পরের ধন পণ রাখতে পারেন না, অন্যদিকে স্ত্রী স্বামীর অধীন। এই উভয় পক্ষই তুল্যবল বোধ হওয়াতে তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর বিবেচনায় আমরা অসমর্থ।' তাই যদি হয়, তা হলে যুধিষ্ঠিরই তো দ্রৌপদীর একমাত্র স্বামী নন, আরো তো চারজন স্বামী আছেন, তাঁরা কেন কোনো প্রতিবাদ করলেন না? অন্যের স্ত্রীকে পণ রাখার অধিকার যুধিষ্ঠির কোথায় পেলেন? পুরাকালের নিয়ম অনুসারে কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অধীন, কিন্তু তাদের স্ত্রীরা নিশ্চয় তাদের স্বামীর অধীন। তাহলে সেই স্বামীরা নিঃশব্দ রইলেন কেন? তাঁরা তো দ্রৌপদীকে পণ রাখেননি। তাঁরা কেন কোনো প্রতিবাদ করলেন না? শেষ পর্যন্ত এটাই মনে হয়, প্রতিবাদ যখন কেউ করলেন না, গুরুজনেরাও নন, সভাস্থ অন্যান্য জনেরাও নন, স্বামীরাও নন, তবে হয়তো দ্রৌপদীর কারো কাছেই মহিলা বলে আলাদা সম্মান পাবার কোনো প্রশ্ন ছিলো না। অথবা জুয়াখেলার নিয়ম অনুসারে, অনুক্ষণ অপমানিত দুর্যোধন আর কর্ণ যা করছিলেন, সেটা কিছু অন্যায় নয়। দুর্যোধনের কোনো এক ভ্রাতাই একমাত্র ব্যক্তি

যার মুখে একটি প্রতিবাদ উচ্চারিত হলো। বিকর্ণ বললেন, 'যুধিষ্ঠির ব্যসনাসক্ত হয়ে দ্রৌপদীকে পণ রেখেছেন, অধিকন্তু পণ রাখবার পূর্বে তিনি স্বয়ং পরাজিত হয়েছেন, তাতে তিনি স্বত্ববর্জিত হয়েছেন। এসব বিবেচনা করে আমি দ্রৌপদীকে জয়লব্ধ বলে স্বীকার করতে পারি না।'

বিকর্ণর একথা শুনে কর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'দেবতারা স্ত্রীলোকদের এক ভর্তাই বিধান করেছেন। দ্রৌপদী সেই বিধি লঙ্ঘন করে যখন অনেক ভর্তার বশবর্তিনী হয়েছেন, তখন ইনি বারস্ত্রী। সুতরাং সভামধ্যে আনয়ন, বা বিবসনা করা, মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়।'

দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'হে নৃপতে। ভীম অর্জুন নকুল সহদেব তোমার বশীভূত, দ্রৌপদী পরাজিত কিনা তুমিই বলো না।' হাসতে হাসতে বসন সরিয়ে উরুতে চাপড় দিলেন। বলাই বাহুল্য, ব্যবহারটা অশালীন।

কিন্তু আশৈশব তিনি বিদুরের বাক্যদংশনে যে জ্বালায় জ্বলেছেন, বিদুরের পরামর্শে পাণ্ডব নামধারী পঞ্চভ্রাতার সঙ্গে যে বৈরীভাব সৃষ্টি হয়েছে, নিঃশব্দে যে গ্লানি, অপমান, অসম্মান, সতত সহ্য করেছেন, এতোদিনে সেই সব অপমানের প্রতিশোধ নিতে পেরে দুর্যোধনের মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলা আশ্চর্য নয়। বিশেষত, মহিলারা যে সমাজে ভোগের সামগ্রী ব্যতীত আর কিছু নয়। বিশেষত, যে স্ত্রী পঞ্চপতিগামিনী।

তদ্ব্যতীত, দ্রৌপদী এখন কুরুকুলবধূ বলে নিজেকে জাহির করলেও, যজ্ঞের দিন যে চাপল্য প্রকাশ করেছিলেন সেই ব্যবহারটা বিন্দুমাত্র সুষ্ঠু ছিলো না। অন্যকে অসম্মান অপমান করলে, পরিবর্তে অসম্মানিত অপমানিত হবার ঝুঁকি থাকে বৈকি। স্বয়ংবর সভায় জাত তুলে অতি অন্যায়ভাবে কর্ণকে অপমান করেছিলেন দ্রৌপদী, তার মধ্যে কোনো শালীনতা ছিলো না। অতঃপর একজনের গলায় বরমাল্য দিয়ে বিবাহের পরেও তিনি তাঁর বরণীয় পতির জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সকল ভ্রাতার সঙ্গেই বা কী করে বিবাহিত হলেন? কর্ণকে প্রত্যাখ্যান করবার সময়ে তাঁর কণ্ঠে যে জোর ছিলো, বিবাহের সময়ে কেন তেজস্বিনী দ্রৌপদীর কণ্ঠ নিঃশব্দ রইলো?

যুধিষ্ঠিরের মান সম্মান ঐশ্বর্য কিছুই তাঁর স্বোপার্জিত নয়। পত্নীটিও নয়। অনুপার্জিত সমস্ত কিছুই তিনি তাঁর জুয়ার নেশায় সমর্পণ করে ভ্রাতাগণসহ দ্রৌপদীকে নিয়ে কুরুদের দাস হলেন।

দুরোদর রাজাদের বিবিধ ব্যসনের মধ্যে একটা। খেলার জন্য সকল রাজাই সকলকে ডাকতে পারেন—সেটাই নিয়ম। সেটা একটা সম্মানের ব্যাপার। এই খেলার আয়োজন যে কোনো রাজা যে কোনোদিন করতে পারেন, খেলতেও পারেন। যুধিষ্ঠিরকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ডাকলেও একা তাঁকেই ডাকা হয়নি; অন্যান্য কীর্তিমান রাজারাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। যুধিষ্ঠির

নিজেই শকুনির সঙ্গে খেলতে অভিলাষী হলেন। কেন অভিলাষী হলেন তার মধ্যে যে একটা গূঢ় অভিসন্ধি ছিলো সেটা কেউ ধরতে পারেননি। তিনি নিজেই প্রকাশ করেছিলেন সে কথা। সরবে সদরে নয়, দ্রৌপদীর বাক্যবাণে জর্জরিত হয়ে তাঁকে বলেছিলেন যে তাঁর মনে হয়েছিলো খেলতে খেলতে একবার না একবার তিনি জিতবেনই, এবং তখন দুর্যোধনের সমস্ত ঐশ্বর্য তাঁর ক্ষমতার অধীন হবে। একথা যে তিনি শুধু স্ত্রীকেই বলেছিলেন তা-ই নয়, ক্রুদ্ধ ভ্রাতা ভীমকেও বলেছিলেন। নচেৎ, এ খেলাটা যদি তিনি অন্য কারো সঙ্গে খেলতেন, হয়তো জিতেও যেতে পারতেন। কিন্তু দুর্যোধনকে না হারাতে পারলে সুখ কোথায়? এই খেলা যে সবাই পণ নিয়ে খেলেন তা নয়। দুর্যোধনও পণের কথা বলেননি, বলেছিলেন যুধিষ্ঠির নিজেই। তিনি জানতেন তাঁর যতো ঐশ্বর্য আছে, তার সঙ্গে এঁরা কোনোরকমেই পাল্লা দিয়ে উঠতে পারবে না, অতএব এক সময় ধরা দিতেই হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই বাসনা তাঁর মিটলো না। বিদুরের মতো তাঁরও শান্তনুর সিংহাসনটি শেষ লক্ষ্য।

হিতৈষীরা তাঁকে শকুনির সঙ্গে খেলতে বারণ করেছিলেন, তিনি শোনেননি। কুরুরা একটা অভিসন্ধি নিয়ে খেলার আয়োজন করলেও, ফলাফল বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন না। কেননা যুধিষ্ঠির যে সৌবলের সঙ্গেই খেলবেন এমন তো কোনো কথা নেই। যুধিষ্ঠিরের মনে অথচ সেই নিশ্চয়তা ছিলো। ধনদৌলতের আধিক্যে তিনি যে এঁদের অপেক্ষা অনেক বেশি ঐশ্বর্যবান, সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহে ছিলেন। সেজন্যই গৌরব করে বলেছিলেন, 'পণ-পূর্বক খেলো, দেখি তোমাদের কী আছে।' কিন্তু মজাটা এই যে সারা রাজ্যেই রটে গেলো দুর্যোধনের ঈর্ষাতেই যুধিষ্ঠিরের এতো বড় একটা ক্ষতি হলো। যুধিষ্ঠির খেললেন, যুধিষ্ঠির হারলেন, অতি নিন্দিত জুয়াড়িদের চাইতেও অধিক নিন্দিত জুয়াড়ি হয়ে স্বীয় পত্নীকেও পণ রাখলেন; তথাপি যুধিষ্ঠির সৎ, যুধিষ্ঠির নির্দোষ, যুধিষ্ঠির সরল, আর তাঁর সব মন্দকর্মের দায় নিতে হলো দুর্যোধনকে। অবশ্য কর্ণ সৌবল্য বাদ গেলেন না।

এরমধ্যে যেটা উল্লেখযোগ্য তা ভীষ্ম এবং দ্রোণের চুপ করে থাকা। তার অর্থ সম্ভবত এটাই যে তাঁরা সেখানে দুর্যোধনের দোষ দেখতে পাননি। সহসা বিদুর তাঁর পক্ষে যতোটা সম্ভব ভদ্রভাষায় বললেন, 'হে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ, তোমরা অন্যায় দ্যুতক্রীড়া করেছো। যেহেতু সভামধ্যে স্ত্রী নিয়ে বিবাদ করছো, তোমাদের রাজ্যের কল্যাণ বলে আর কিছুই রইলো না। তোমরা সকলেই কুমন্ত্রণা-পরতন্ত্র হয়েছো। সভামধ্যে অধর্মানুষ্ঠান হলে সমুদয় দূষিত হয়। এখন আমার ধর্মবাক্য শ্রবণ করো। দ্যাখো, যদ্যপি যুধিষ্ঠির আত্মপরাজয়ের পূর্বে দ্রৌপদীকে পণ রেখে ক্রীড়া করতেন, তা হলে উনি যথার্থ ঈশ্বর হতেন। কিন্তু অনীশ্বরের নিকট বিজিত ধন, আমার মতে স্বপ্নার্জিত ধনের ন্যায়। অতএব হে কৌরবগণ! তোমরা গান্ধাররাজের বাক্য শ্রবণে বিমূঢ় হয়ে ধর্মচ্যুত হয়ো না।'

দুর্যোধন দ্রৌপদীকে সম্বোধন করে বললেন, 'হে যাজ্ঞসেনী! ভীম অর্জুন নকুল সহদেবের মতই আমার মত। যদি তাঁরা যুধিষ্ঠিরকে অধীশ্বর বলেন, তাহলে তোমার দাসীত্ব মোচন হবে।'

হঠাৎ ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে বলতে লাগলেন, 'আরে দুর্বিনীত দুর্যোধন। তুই একেবারে উৎসন্ন হলি। যেহেতু কুরুকুলকামিনী, বিশেষত পাণ্ডবগণের ধর্মপত্নী দ্রৌপদীকে সভামধ্যে সম্বোধন করলি।'

বিদুর বলেছেন, অতএব ধৃতরাষ্ট্রকে ছেলের বিরুদ্ধে কিছু তো বলতেই হবে। এই প্রৌঢ় রাজাটির অবিবেচনা যতো গভীর, দুর্যোধনের দুর্ভাগ্য ততোধিক। দুর্যোধন তাঁর বয়স্ক পুত্র; স্বাবলম্বী, প্রজাবৎসল বলে খ্যাত একজন রাজা। সভার মধ্যে সকলের সম্মুখে পিতাই যদি তাঁর নিন্দায় মুখর হন, এভাবে অসম্মান করেন, তাহলে অন্যেরা বলবে না কেন? পরিজনদের মধ্যে এমনিতেই বিদুর তাঁকে যে চিত্রে চিত্রিত করে রেখেছেন, সেই চিত্র তবে আর কেমন করে মুছে যাবে? প্রচারের সাহায্যে বিদুর তাঁকে যে পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন, তাতে উত্ত্যক্ত হয়ে দুর্যোধন আজ যদি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠে মাত্রাজ্ঞান হারান, খুব কি দোষের সেটা?

বিদুর ধর্ম! বিদুর মিথ্যা বলতে জানেন না। বিদুর সততার প্রতীক। বিদুর বিবেকের প্রতীক। আর স্বীয় পিতা ধৃতরাষ্ট্র তার ছায়া। দুর্যোধনের জীবনের গভীরতম কষ্টের জায়গা সেটাই।

তারপরেই ধৃতরাষ্ট্র দ্রৌপদীকে তার স্বামীদের সহ সমুদয় ধনসম্পত্তিও ফেরৎ দিলেন। কর্ণ বললেন, 'অসামান্য রূপবতী স্ত্রী দ্রৌপদীর মতো কোনো স্ত্রীলোকের এতাদৃশ কর্ম কর্ণগোচর হয়নি। পাণ্ডবগণ দুস্তর জলপ্লাবনে নিমগ্ন হয়েছিলেন, পাঞ্চালী তরণী হয়ে পার করে দিলেন।'

কর্ণের কথা শুনে অসিহষ্ণু ভীম দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করে বললেন, 'হা! স্ত্রী পাণ্ডবগণের গতি হলো?'

অতঃপর ধৃতরাষ্ট্রের অনুজ্ঞাত হয়ে ধনসম্পত্তি সহকারে পাণ্ডবগণ যখন চলে গেলেন, তার অনতিবিলম্বেই নিজ সহোদর সমন্ত্রী দুর্যোধনের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'আমরা অতীব ক্লেশে যে সমুদয় দ্রব্য সঞ্চয় করেছি, বৃদ্ধ রাজা সমুদয় নষ্ট করছেন। অধিকাংশই পুনরায় শত্রুদিগের হস্তগত হয়েছে। এখন ভালোমন্দ যা হয় তোমরা বিবেচনা করো।'

এ কথা কর্ণগোচর হওয়ায় দুর্যোধন বিস্মিতও হলেন, শঙ্কিতও হলেন। এখন পাণ্ডবরা যে রকম ক্ষিপ্ত অবস্থায় রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেছেন, সেই ক্রোধ থেকে নিস্তার পাবার কী উপায় সেটাই চিন্তার বিষয়। ওদের সহায় সম্বল প্রবল, আর তিনি নিজে এ মুহূর্তে একান্তই অপ্রস্তুত। প্রাণ সংহারোদ্যত এই ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গদিগকে কণ্ঠলগ্ন করে কে থাকবে? সমস্ত উপায় দ্বারাই এখন তাঁদের দমন করা কর্তব্য। আজ হোক কাল হোক, যুদ্ধ এঁরা করবেনই। অস্থিরমতি ধৃতরাষ্ট্রকে সিংহাসনচ্যুত করে অবিভক্ত রাজত্ব না পাওয়া পর্যন্ত এঁরা শান্ত হবেন না। বিদুরও হবেন না।

আর এখন তো একটা বড়ো কারণই পেয়ে গেলেন। প্রকৃতপক্ষে, দ্রৌপদীকে সভায় এনে অসম্মান করাটা তাদের পক্ষেও যেমন একটা অতি অশোভন কার্য হয়ে গিয়েছিলো, সেই অসম্মান পঞ্চপাণ্ডবকে তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষিপ্ত করেছে। ভীম প্রতিজ্ঞা করেছেন দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করবেন, আর দুঃশাসনের রক্তপান করবেন।

অবিলম্বেই সকলে মিলে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। বললেন এসব কথা। তারপর বললেন, 'হে মহারাজ! আমরা বনবাস পণ করে পুনরায় পাণ্ডবদের সঙ্গে পাশাক্রীড়া করবো। তারা বা আমরাই হই, দ্যূতনির্জিত হলে বল্কলাজিন পরিধান করে দ্বাদশ বৎসরের জন্য বনপ্রবেশ করবো। এক বৎসর তারাই হোক বা আমরাই হই, পরিবারসহ অরণ্যে বাস করবো। আপনি অনুমতি করুন, আমরা পুনরায় পাশাক্রীড়া করি।'

ধৃতরাষ্ট্র তৎক্ষণাৎ অস্তির হয়ে পাণ্ডবদের ডেকে পাঠালেন। পরিজনসহ সকলেই পুনরায় ফিরে এলেন। দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'হে যুধিষ্ঠির! এই সভায় বহুবিধ লোকের সমাগম হয়েছে। এসো আমরা পুনরায় অক্ষ নিক্ষেপ পূর্বক দ্যূতারম্ভ করি।'

সৌবল বললেন, 'বৃদ্ধ রাজা আপনাদের যে অর্থ প্রত্যর্পণ করেছেন, সেটা ভালোই করেছেন। কিন্তু এবার আমরা যারাই হারবো, তারাই মহারণ্যে প্রবেশ করে একবৎসর অজ্ঞাত ও দ্বাদশ বৎসর জ্ঞাত, এই ত্রয়োদশ বৎসর অরণ্যে বাস করবো।'

উন্মত্ত জুয়াড়ি যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সঙ্গে মৌনভাব অবলম্বন করে এতো কাণ্ডের পরেও তৎক্ষণাৎ পুনরায় ফিরে গেলেন খেলতে। কারো কোনো বাধাই মানলেন না। কারো দিকে তাকালেনও না। যথারীতি পুনরায় হেরে গিয়ে পুনরায় নিঃস্ব হলেন। অতঃপর শুরু হয়ে গেলো বনবাসপর্ব।

পাণ্ডবগণ প্রব্রজ্যাশ্রম অবলম্বন করেছেন শুনে অনেকেই তাঁদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য মহাবনে যাত্রা করলেন। কৃষ্ণও এলেন। তাঁকে দেখে দ্রৌপদী বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন 'হে কৃষ্ণ! আমার বোধ হচ্ছে আমি পতিপুত্রবিহীনা, আমার বন্ধু নাই, ভ্রাতা নাই, পিতা নাই, তুমিও আমার নাই।' করতলে মুখ ঢাকলেন তিনি। মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত করে রোদন করতে লাগলেন। অজস্র অশ্রুবিন্দুতে তাঁর বক্ষস্থল অভিষিক্ত হতে লাগলো। অসামান্য সুন্দরী সখীর এই বিগলিত বাক্যে কৃষ্ণও যে বিগলিত হবেন তাতে আর সন্দেহ কী? তিনিও বিগলিত কণ্ঠে 'হে ভাবিনী' সম্বোধন করে অনেক সান্ত্বনা দিলেন। এই বনবাস পর্বেই যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে যা বলেছিলেন, পরে সে কথা তিনি ভীমকেও বলেন, 'ভ্রাতঃ! আমার অন্যায়াচরণেই তোমরা বিষাদসাগরে পতিত হয়েছো, তাতে সন্দেহ নাই। আমি দুর্যোধনের রাজ্যহরণে ইচ্ছুক হয়ে অক্ষ গ্রহণ করেছিলাম।'

এইখানে কি আমরা এই প্রশ্ন করতে পারি না, কেন তিনি দুর্যোধনের রাজ্যে লোভ করতে

গিয়েছিলেন? তিনি কি তখন অগাধ ঐশ্বর্যের অধিকারী হননি? পাণ্ডুর অর্ধাংশ পাননি? কীসের অভাব ছিলো তাঁর? আসলে যতোক্ষণ না শান্তনুর সিংহাসনটি সর্বতোভাবে গ্রাস করতে পারেন, ততোক্ষণ বিদুরেরও যেমন শান্তি ছিলো না, তাঁরও ছিলো না। দুর্যোধন এঁদের বিষয়ে এই সব কথাই তাঁর রাজোচিত বুদ্ধিতে অনুমান করতে পেরেছিলেন এবং এঁরা পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ কিনা সে বিষয়েও তাঁর মনে সন্দেহ ছিলো। এছাড়া, যে কারণেই হোক, এর সঙ্গে যে বিদুর সম্পৃক্ত, সে বিষয়েও তাঁর সন্দেহ ছিল না। অন্য কোনো বলবান রাজার সহযোগ পাবার জন্যই যে তাঁরা হস্তিনাপুরীতে আর প্রত্যাবৃত্ত হননি, নিজেদের পরিচয় গোপন করতে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন, এসব কথা অন্তত দুর্যোধনের কাছে গোপন নেই। যদিও বিদুর সকলকে এ কথাই বুঝিয়েছেন যে দুর্যোধনের অসূয়া থেকে মুক্তি পেতে প্রাণভয়েই পাণ্ডবরা পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন।

পাণ্ডবদের উদ্দেশ্য সফলও হয়েছিলো। বিশেষভাবে কৃষ্ণের সহায়তা পেয়ে, বলা যায় সবই প্রায় হাতের মুঠোয় এসে পৌঁছেছিলো। রাজসূয় যজ্ঞের দিন তাঁরা যদি অকারণে দুর্যোধনকে এভাবে অপমান না করতেন, ভৃত্যভৃত্যাদের সম্মুখে স্ত্রীপুরুষ সবাই ওরকম অশালীন অভব্য আচরণ না করতেন, তা হলে তথাকথিত জ্ঞাতিদের বৈভব দেখে দুর্যোধনের মন যতোই কলুষিত হোক না কেন, এই প্রতিশোধের ঘটনা কখনোই ঘটতো না। পাণ্ডবরা নিজেদের যদি কুরুকুলের সন্তান ভাবতেন, আর কিছু না হোক, কুরুকুলের মানসম্মানের দায়েও এটা করতে পারতেন না। এর পরে যে কোনো আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন মানুষই যেভাবে পারে সেভাবেই এর প্রতিশোধ না নিয়ে পারে না। সেখানে দুর্যোধনের তো বহু বছরের জমা রাগ এদের ওপরে। ছেড়ে দেবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কুলে, মানে ধনে জনে দুর্যোধন নিশ্চয়ই একজন অতি বিশিষ্ট ব্যক্তি, সমকক্ষ ক্ষত্রিয় রাজা, তিনি কেন সহ্য করবেন অপমান? সহ্য করলে আমরা পাঠকরাই তাঁকে কাপুরুষ বলে অশ্রদ্ধা করতাম। আত্মসম্মানের প্রতি যাঁদের দৃষ্টি নেই, তাঁরা মানুষ হলেও মানুষ নয়। আত্মসম্মান প্রাণীকুলে একমাত্র মনুষ্য জাতির মধ্যেই বর্তমান।

যখন পাণ্ডবরা দ্রৌপদীসহ বনবাসে যাচ্ছিলেন দুঃশাসন বলেছিলেন, 'যে পাণ্ডবরা ধনমদে মত্ত হয়ে ধার্তরাষ্ট্রদের উপহাস করছিলো, এক্ষণে তারাই নির্জিত ও হৃতসর্বস্ব হয়ে বনপ্রবেশে যাচ্ছে।'

যাবার সময়, তাঁরা ফিরে এসে যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন তা জোর গলায় বলে গিয়েছিলেন পাণ্ডবরা।

অতঃপর বনবাসপর্ব শেষ করে তাঁরা উদ্যোগপর্বে এসে পৌঁছলে গৃহবিবাদের পুনরায় সূত্রপাত হলো। সেই সময়েই বিরাট রাজার কন্যা উত্তরার সঙ্গে অভিমন্যুর বিবাহক্রিয়া সাঙ্গ হয়। বিরাট রাজার গৃহেই মন্ত্রণাসভা বসলো, এখন কী ভাবে দুর্যোধনের হাত থেকে পাণ্ডবদের পিতৃরাজ্য উদ্ধার করা যায় মন্ত্রণার বিষয় সেটাই।

দ্রুপদ বললেন, 'দুর্যোধন সহজে রাজ্য ফিরিয়ে দেবে না। আমাদের এখন প্রয়োজন ধর্মসম্মত যুক্তির দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রকে স্ববশে আনা।' অতএব তিনি তাঁর পুরোহিতকে দূত হিশাবে পাঠিয়ে দিলেন। বলে দিলেন, 'পাণ্ডবদের হিত নিমিত্ত আপনি পুষ্যানক্ষত্রের যোগে জয়সূচক শুভ মুহূর্তে যাত্রা করুন।' পুরোহিতকে গোপনে পরামর্শ দিলেন, 'আপনি সেখানে উপস্থিত হয়ে ধর্মবাক্যে ধৃতরাষ্ট্রকে প্রসন্ন করে, তাঁদের যোদ্ধৃবর্গদের গতি পরিবর্তনের চেষ্টা করবেন। এদিকে বিদুর সেইসব বাক্য শ্রবণ করে ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য প্রভৃতির পরস্পরের মতভেদ উপস্থিত করবেন। অমাত্যবর্গের মধ্যে অন্তর্ভেদ সৃষ্টি হলে ও সৈনিকরা বিমুখ হলে তাদের একতা সম্পাদনের জন্য কৌরবগণকে বিশেষ যত্নবান হতে হবে। সেই সময়টুকুর মধ্যে পাণ্ডবেরা একাগ্রচিত্তে সৈন্যসংগ্রহ প্রভৃতি সাংগ্রামিক কার্যসকলের আয়োজন করতে পারবেন। আত্মভেদ হলেই আপনি সে বিষয়ের পোষকতা করবেন। তা হলে বিপক্ষ দুর্বল হয়ে পড়বে, আর ওরা সেনা সংগ্রহ করতে পারবে না। এখন আপনি যত্নপূর্বক আমাদের এই উদ্দেশ্য সাধন করুন।'

বলরাম বললেন, 'যুধিষ্ঠির দ্যূতপ্রিয়, কিন্তু অজ্ঞ। সুহৃদগণের নিষেধ না শুনে দ্যূতনিপুণ শকুনিকে আহ্বান করেছিলেন। অন্যান্য নৃপতিদের সঙ্গেও তিনি খেলতে পারতেন, হারাতেও পারতেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে না খেলে ঐ শকুনির সঙ্গেই তিনি খেলতে গেলেন, এবং প্রমত্ত হয়ে রাজ্য হারালেন। শকুনি নিজের শক্তিতেই যুধিষ্ঠিরকে পরাস্ত করেছেন। তাতে শকুনির কোনো দোষ হয়নি। যদি আপনারা শান্তি চান, তবে মিষ্ট বাক্যেই দুর্যোধনকে প্রসন্ন করুন। সামনীতিতে যা পাওয়া যায় তাই অর্থকর, যুদ্ধ অন্যায় ও অনিষ্টকর।'

কথাটা কারোই পছন্দ হলো না। যুধিষ্ঠির দ্রুপদ প্রভৃতি সংগোপনে যুদ্ধের আয়োজন করতে লাগলেন এবং নানা দেশের রাজাদের নিকট দূত পাঠালেন। আমন্ত্রণ পেয়ে রাজারা আসতেও লাগলেন।

সাত্যকি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'দুর্যোধন ছল করে যুধিষ্ঠিরের রাজ্য হরণ করেছেন। শকুনি কপট

পাশায় যুধিষ্ঠিরকে হারিয়েছেন। আপনারা দুর্যোধনকে বলুন, দুর্যোধন যে ভরসায় যুদ্ধ করতে চান তা মিথ্যা। পাণ্ডবরাই অধিক বলশালী।'

বলরাম বললেন, 'যুধিষ্ঠির সমধিক সম্পদশালী ছিলেন, কিন্তু দ্যূতে প্রমত্ত হয়েই তাঁর সমস্ত রাজ্য পরহস্তগত হয়েছে, তাতে শকুনির কিছুমাত্র অপরাধ নেই। অতএব কোনো বাগ্মীপুরুষ ধৃতরাষ্ট্র সমীপে উপস্থিত হয়ে, প্রণিপাতপূর্বক সন্ধিবিষয়ক প্রস্তাবই করুন।'

সাত্যকি বলরামকে দোষারোপ করে বলতে লাগলেন, 'এক বংশে ক্লীব ও শূর দুই প্রকার পুরুষই জন্মগ্রহণ করে। যেমন তুমি, তেমনই তোমার বাক্য। অক্ষবিশারদগণ এই দ্যূতানভিজ্ঞ মহাত্মাকে দ্যূতে আহ্বান করলেন কেন? তা না হলে তো তিনি পরাজিত হতেন না? এখন তোমরা সতর্ক হলে মহারাজ যুধিষ্ঠির দীর্ঘকালের আশাপোষিত ('আশাপোষিত' শব্দটা লক্ষ করুন) ধৃতরাষ্ট্রবিসৃষ্ট রাজ্য গ্রহণ করতে পারবেন।'

দুর্যোধন যা ভেবেছেন সেটা যে কতোখানি সত্য এই বাক্যই তার প্রমাণ। তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্যই এই যুদ্ধের প্রয়োজন ছিলো যুধিষ্ঠিরের। দ্রুপদ বলরামের দিকে তাকিয়ে আপোসের গলায় বললেন, 'মহারাজ! আপনি যা বললেন, তাই হবে।'

আসলে বলরামের নির্মল হৃদয়ে কখনো কোনো মিথ্যার কলঙ্ক নেই। যে বিষয়ে তাঁর ভ্রাতা বাসুদেব অতি সুযোগ্য। ন্যায় অন্যায় দুটি শব্দকেই বলরাম কষ্টিপাথরে ঘষে যাচাই করে দেখেন। অন্যায়ের সঙ্গে আপোসে তিনি যতোটা অক্ষম, ততোটাই সক্ষম যা সত্য তার মর্যাদা দিতে। অকারণ অসূয়া বিদ্বেষ স্বার্থ বা কৌটিল্য তাঁর চরিত্রের বিপরীত। শকুনি যে কপট পাশায় হারাননি তার সাক্ষী ছিলেন অন্যান্য নৃপতিরা এবং ভীষ্ম। স্বয়ং যুধিষ্ঠিরও সেখানে এই মিথ্যেটা বলতে পারেননি যে শকুনি তাঁকে কপট পাশায় হারিয়েছেন। সভার সকল সদস্যই দেখেছেন এই খেলায় শকুনির প্রতিভা কী ঊর্ধ্বগতি। একমাত্র বিদুর তার প্রতিকূল। তিনিই শ্রবণ থেকে শ্রবণান্তরে গুজব ছড়িয়ে দিলেন, যুধিষ্ঠিরকে কপট পাশায় হারিয়েছেন মাতুল শকুনি।

আজও পর্যন্ত সেই মিথ্যেই অকাট্য সত্য হিশাবে প্রচলিত। পাশাখেলায় সৌবল প্রকৃতই যে একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি, এবং যুধিষ্ঠির যে তাঁর মতো একজন খেলোয়াড়ের নিকট একটা ফুৎকারও নয়, এ কথা যুধিষ্ঠিরের তো প্রথম খেলাতেই বুঝতে পারা উচিত ছিলো। তখুনি তিনি শেষ করে দিতে পারতেন খেলা। অন্য কারো সঙ্গে খেলতে পারতেন। তাঁর সমকক্ষ খেলোয়াড়ের অভাব ছিলো না সেখানে। কিন্তু সর্ব বিষয়ে অক্ষম ব্যক্তিদের মধ্যে একটা মাত্রহীন জেদ থাকে, কিছুতেই হার স্বীকার করতে পারে না। আত্মসম্মান রক্ষার্থে সেই জেদই চালিত করেছিলো যুধিষ্ঠিরকে। সর্বত্র হেরে যেতে কার বাসনা থাকে? তদ্ব্যতীত, রাজসূয় যজ্ঞ করে এতো অঢেল ধনসম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন যে মনে করেছিলেন তাঁর সঙ্গে এঁরা পাল্লা

দিতে পারবেন না, এবং তিনি খেলতে খেলতে একবার জয়ী হতেই পারবেন। তখন এঁরা তাঁর অর্থের প্রাচুর্য দেখে নিজেদের অনেক দীন বলে ভাববে আর যথেষ্ট অপমানিত হবে। সে ইচ্ছে তিনি শেষ পর্যন্তও ছাড়তে পারেননি। এই অসৎ ইচ্ছাই তাঁকে সেই নরকে নিয়ে গেছে, যেখান থেকে তিনি ভ্রাতাদের বাজি রেখেছেন, পত্নীকে বাজি রেখেছেন, আত্মবিক্রয় করে অবশেষে নিঃস্ব হয়েছেন।

যুদ্ধের আলোচনা সবই একপক্ষে চলছিলো। অভিমন্যু-উত্তরার বিবাহে সব মহানুভব ব্যক্তিরা অতিথি হিশাবে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। সুতরাং ঐ পক্ষ কী করছে সেটা না জেনেই এই আলোচনা চলছিলো। কৃষ্ণ অন্যান্য আমন্ত্রিত রাজাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পরাজিত হলে হৃতরাজ্য ও বনবাসের জন্য সৌবল শঠতাপূর্বক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়েছিলেন যুধিষ্ঠিরকে। এখন কৌরব ও পাণ্ডবগণের পক্ষে যা মঙ্গল তাই আপনারা চিন্তা করুন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অধর্মগতভাবে সুরসাম্রাজ্যও কামনা করেন না। যদিও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা বলবীর্যে এঁদের পরাজিত করতে অসমর্থ হয়েই শঠতাপূর্বক পৈতৃকরাজ্য অপহরণ করে এঁদের এতোদিন দুঃখে দগ্ধ করেছে।' কৃষ্ণ সব কিছু জেনেই এই অসত্য কথাগুলো বললেন।

স্বভাব দোষে অনর্থক অসূয়া বিভিন্ন পিতার পাঁচটি সন্তানের পক্ষে সম্ভব হতে পারে। শৈশব তাঁদের কোথায় কীভাবে কেটেছে তা আমরা কেউ জানি না। কী তাঁদের বোঝানো হয়েছে তা-ও অজানা। কিন্তু কৃষ্ণ কেন দুর্যোধনের বৈবাহিক হয়েও তাঁর ঘোর শত্রু সেটা বোঝা দুরূহ।

মহাভারত নামের বৃহৎ পুস্তকখানিতে আমরা কৃষ্ণকে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভাতেই প্রথম দেখতে পেলাম। দুর্যোধনের সঙ্গে তাঁর কোনো শত্রুতার সংবাদও আগোচর ছিলো। দুর্যোধন তাঁর বৈবাহিক। তাঁর পুত্র দুর্যোধনের কন্যাকে বিবাহ করেছে। সুতরাং একজন বিশেষ আত্মীয়। তাঁকে এই ধরনের অপমান করার মধ্যে যে অশিষ্টতা এবং অভদ্রতা লক্ষ করা যায় তা উন্নতমনস্ক সজ্জনের শোভা পায় না।

কৃষ্ণ তখন প্রৌঢ়ত্বের চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছেন, দুর্যোধনের বয়সও কিছু থেমে নেই, একজন বিশিষ্ট রাজাও বটে। তাঁর সঙ্গে কৃষ্ণের যদি বা কোনো কারণে কোনো শত্রুতাও থাকে, তথাপি এই ব্যবহার তাঁকে মানায় না। তবে কি যাদববংশের এই নেতা কৌলিন্যের অভাবেই বোঝেন না যে ব্যক্তিবিশেষ বলে একটা শব্দ আছে অভিধানে! একথাটা অবশ্যই জানা উচিত, একজন আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি কখনো অপমান ভুলবেন না, ভুলতে পারবেন না। ব্যাসদেব এমনভাবে ঘটনাটা সাজালেন যেন দুর্যোধন ঈর্ষাপরায়ণ হয়েই এই কৌশলে নিতান্ত অকারণে সরল সাধু যুধিষ্ঠিরকে এই অন্ধকারে ঠেলে দিলেন। যেমন একবার ভীমকে বিষ খাইয়ে জলে ফেলে দিয়েছিলেন বলে রটানো হয়েছিলো, এই ঘটনাটাও তারই আর এক চেহারা। পিছনে কোনো কারণ নেই, যা আছে তা যুধিষ্ঠিরের দুর্যোধনের প্রতি নির্ভেজাল এক নারকীয় ঈর্ষা।

বলরামের বাক্য কারো কর্ণেই সুধাবর্ষণ করলো না, শুধু তিক্ততা ছড়ালো। অতএব সত্যটা কখন মুছে গিয়ে মিথ্যাটাই উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

কৃষ্ণ উপস্থিত রাজন্যবর্গকে বললেন, ‘যদি কৌরবগণ এঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, তবে এঁরা আহত হওয়ামাত্রই ওদের নিহত করবেন।’ আরো বললেন, ‘যদি আপনারা মনে করেন পাণ্ডবগণ সংখ্যায় অল্প বলে ওদের পরাজিত করতে অক্ষম হবেন, তা হলে সকল সুহৃদ একসঙ্গে হয়ে তাদের সংহার করতে যত্নশীল হবেন।’ এই পরামর্শে এটা অতি স্বচ্ছ যে কৃষ্ণ যুদ্ধটাই চাইছেন। কৌরব বংশ ধ্বংস করতে কৃষ্ণ এবং বিদুর একই রকম উগ্র ইচ্ছার অধীন। যুধিষ্ঠির তো বটেই।

এদিকে পাণ্ডবগণ সৈন্য সংগ্রহ করেছেন জেনে দুর্যোধনও সৈন্য সংগ্রহে একাগ্র হলেন। দুর্যোধনের আহ্বানে প্রচুর সৈন্য সংগৃহীত হলো। নানাবিধ ধ্বজা পতাকাশালী সৈন্যগণের সমাবেশে হস্তিনানগর পরিপূর্ণ হয়েও ছাপিয়ে গেলো। তাদের সব বিভিন্ন স্থানে সংস্থাপিত করলেন দুর্যোধন। পাঞ্চালপতি প্রেরিত সেই পুরোহিত সৈন্যর প্রাচুর্য দেখে স্তম্ভিত হলেন।

পুরোহিত কৌরবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং দ্রুপদরাজার শিক্ষামতো যা যা বক্তব্য সবই ব্যক্ত করলেন। ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম ইত্যাদি তাঁকে সম্মানের সঙ্গে গ্রহণও করলেন। এবং তাঁদের দিক থেকেও সঞ্জয়কে সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে পাঠালেন। যুধিষ্ঠির বললেন, ‘দুর্যোধন আমাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে যদি ইন্দ্রপ্রস্থ প্রদান করেন, তা হলে আমি শান্তিপক্ষ অবলম্বন করবো। প্রদীপ্ত অগ্নি যেমন ঘৃত পেয়ে তৃপ্ত হয় না, সে রকম বিপুলভোগ্যে বিষয় পেয়েও ধৃতরাষ্ট্র তৃপ্ত হননি। এখন সংকটে পড়ে পরের উপর নির্ভর করছেন। এতে তাঁর মঙ্গল হবে না। এখন তিনি তাঁর দুর্বুদ্ধি ক্রুর স্বভাব কুমন্ত্রীবেষ্টিত পুত্রের জন্য বিলাপ করছেন কেন? বিদুরের উপদেশ অগ্রাহ্য করে অধর্মের পথে চলেছিলেন কেন?’

সঞ্জয়ের বিনীত নিবেদনের উত্তরে এই জবাব নিতান্তই নির্লজ্জ জবাব। রাজা হতে চাইলেও রাজার আচরণ তিনি জানেন না। তদ্ব্যতীত, ধৃতরাষ্ট্রকে যদি নিজের পিতৃব্য বলে বিবেচনা করতেন, তা হলে এভাবে তাঁর বিষয়ে কথা বলতেন না। জন্মাবধি তিনি যদি পাণ্ডুর নিকটই বড়ো হয়ে উঠতেন, তা হলেও এই ধরনের শিক্ষায় শিক্ষিত হতেন না। কথা বলতে জানাটাও যে একটা শিক্ষা, কথাবার্তার মধ্যেও যে মানুষ তার সংস্কৃতির ও আভিজাত্যের প্রমাণ দেয়, তাহলে সেটুকু রাজকীয় জ্ঞান অন্তত জানা থাকতো তাঁর। যে ব্যক্তি জুয়ার নেশায় পত্নীকে পর্যন্ত বিক্রয় করেন, আমরা তেমন ব্যক্তিকে কোনোভাবেই সম্মানিত ব্যক্তি বলে গ্রহণ করতে পারি না। যুধিষ্ঠিরের সামান্য অপরাধবোধ থাকলেও তিনি এভাবে কথা বলতেন না। বিদুরের পুত্র বিদুরই হয়েছেন, রাজবাড়ির প্রলেপ পড়েনি সেখানে। তিনি জানেন, শান্তনুর সিংহাসনের অধিকার না পাওয়া পর্যন্ত, কুরুদের অধীনস্থ না করা পর্যন্ত, শত্রুতা স্তব্ধ হবে না। আর অন্য

কিছুতেই তাঁর তুষ্টি নেই। ভীষ্মের রাজপুত্র বানাবার শিক্ষাও এখানে একান্তভাবেই ব্যর্থ হয়েছে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে যাঁর কিছুই স্বোপার্জিত নয়—সিংহাসন তো নয়ই, এমন কি পত্নীটিও নয় —ভোগের লালসা তাঁর মধ্যে সর্বাধিক। অর্ধরাজ্য পেয়ে তিনি তুষ্ট ছিলেন না, সমস্ত রাজ্যের আকাঙ্ক্ষা নিয়েই শকুনির সঙ্গে খেলেছিলেন। সমস্ত রাজ্যের অধিকার পাবার জন্যই বিদুর তাঁকে হাতে ধরে যে রাস্তায় পা ফেলতে বলেছেন সে রাস্তাতেই তিনি পা ফেলেছেন। তারপর পিতামহর হাত ধরে গিয়েছেন দ্রুপদরাজার কন্যার স্বয়ংবর সভায়। কনিষ্ঠ ভ্রাতার উপার্জিত পত্নীটিকে পর্যন্ত দ্বিধাহীনভাবে গ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে ধৃতরাষ্ট্র কী করেননি তার জন্য? সাদরে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছেন, সন্তুষ্ট চিত্তেই রাজত্বের অর্ধাংশ দিয়েছেন সুখে থাকার জন্য।

সঞ্জয় বললেন, 'আপনি উদ্বেগহীন হয়ে নিজে সরে যান। স্বর্গের পথ থেকে ভ্রষ্ট হবেন না।'

কৃষ্ণ বললেন, 'দস্যু বধ করলে পুণ্য হয়। অধর্মজ্ঞ কৌরবগণ দস্যুবৃত্তিই অবলম্বন করেছে।'

কৃষ্ণ হঠাৎ এই নতুন চেনা পাঁচটি ভ্রাতার সঙ্গে বন্ধুতা করে কেন এই বিবাদটা আরো পাকিয়ে তুলছেন তার কোনো কারণ এই মহাগ্রন্থে লেখা নেই। দস্যুবৃত্তি কৌরবরা করেননি, যা করেছেন পাণ্ডবরাই করেছেন। গ্রন্থটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অবিশ্রান্ত দুর্ব্যবহার করাটাই ছিলো দুর্যোধনের সঙ্গে তাঁদের একমাত্র সম্পর্ক। কোনো না কোনো ছলে তাঁকে অপদস্থ করা আর হারিয়ে দেওয়া। দুর্যোধন মধ্যস্থ না থাকলে অন্ধ রাজাটিকে রাজ্যচ্যুত করে কর্মচারী বানানোর কোনো অসুবিধে ছিলো না, এটাই কি তবে এই শত্রুতার মূল কারণ? কিন্তু কৃষ্ণ কেন তার মধ্যে ঢুকে পড়লেন, বাস্তববুদ্ধিতে তার ব্যাখ্যা মেলে না।

প্রথম দিকে অনেক তেজ দেখিয়ে যুধিষ্ঠির তাঁর রাজত্ব ফিরে চাইছিলেন, শেষের দিকে ভ্রাতাদের নিশ্চুপ দেখে কিছুটা ভীত হয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, রাজ্যের একটি প্রদেশ আমাদের দিক, নতুবা আমাদের পাঁচটি ভ্রাতাকে পাঁচটি গ্রাম দিক।'

সঞ্জয় ফিরে এসে যা বললেন তা শুনে ভীষ্ম বললেন, 'বৎস দুর্যোধন! ধর্ম ও অর্থ থেকে তোমার বুদ্ধি চ্যুত হয়েছে। তুমি যদি আমার কথা অগ্রাহ্য করো, তাহলে বহু লোকের মৃত্যু হবে।'

দ্রোণও তাই বললেন, কিন্তু দুর্যোধন চুপ করে রইলেন। সবাই যখন ধৃতরাষ্ট্রকে পাণ্ডবদের শক্তির কথা বলে ভয় দেখাতে লাগলেন, তখন ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করে দুর্যোধন বললেন, 'মহারাজা! ভয় পাবেন না। পাণ্ডবরা বনে গেলে কৃষ্ণ, কেকয়গণ, ধৃষ্টকেতু, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও বহু রাজা সসৈন্যে ইন্দ্রপ্রস্থের নিকটে এসে আমাদের নিন্দা করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, পাণ্ডবদের উচিত কৌরবদের উচ্ছেদ করে পুনরায় রাজ্য উদ্ধার করা। গুপ্তচরদের মুখে এই সংবাদ পেয়ে

আমার ধারণা হয়েছিলো পাণ্ডবরা তাঁদের বনবাসের প্রতিজ্ঞা পালন করবেন না। যুদ্ধে আমাদের পরাস্ত করবেন। সেই সময়ে পূর্বাপর না জেনে আমাদের মিত্র ও প্রজারা সকলেই ক্রুদ্ধ হয়ে আমাদের ধিক্কার দিচ্ছিলো। তখন আমি ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ ও অশ্বত্থামাকে বললাম, ''পিতা আমার জন্য দুঃখবোধ করছেন।'' অতএব সন্ধি করাই ভালো। তাতে ভীষ্ম দ্রোণাদি আমাকে আশ্বাস দিলেন, ''ভয় পেয়ো না, যুদ্ধে কেউ আমাদের জয় করতে পারবে না।'' মহারাজ অসীমতেজ ভীষ্মদ্রোণাদির তখন এই ধারণা দৃঢ় ছিলো। এখন পাণ্ডবগণ পূর্বাপেক্ষা বলহীন হয়েছে। সমস্ত পৃথিবী আমাদের বশে এসেছে। যে রাজারা আমাদের পক্ষে যোগ দিয়েছেন, তারা শোকদুঃখে আমাদেরই অংশভাগী হবেন। অতএব আপনি ভয় দূর করুন। আমাদের সৈন্য সমাবেশে যুধিষ্ঠির ভীত হয়েছেন। তাই তিনি কেবল পাঁচটি গ্রাম চেয়েছেন। তাঁর রাজধানী চাননি। যুদ্ধজয়ের বল সম্বন্ধে যা মনে করেন তা মিথ্যা। আমি যখন বলরামের কাছে অস্ত্র শিক্ষা করতাম, তখন সকলে বলতো, সম্মুখ যুদ্ধে আমার সমান পৃথিবীতে কেউ নেই। আমি এক আঘাতেই ভীমকে যমালয়ে পাঠাবো। ভীষ্ম দ্রোণ অশ্বত্থামা কৃপ কর্ণ ভুরিশ্রবা শল্য ভগদত্ত ও জয়দ্রথ এঁদের যে কেউ পাণ্ডবদের বধ করতে পারেন। এঁরা সম্মিলিত হলে ক্ষণমাত্রেই তাদের যমালয়ে পাঠাবেন। কর্ণ ইন্দ্রর কাছ থেকে অমোঘ শক্তি অস্ত্র পেয়েছেন। সেই অস্ত্রের সঙ্গে যুদ্ধে অর্জুন কী করে বাঁচবেন? মহারাজ! বিপক্ষের বল আমাদের তুলনায় সর্বরকমেই হীন। আমি জীবন, রাজ্য ও সমস্ত ধন ত্যাগ করবো, কিন্তু কোনো কিছুর বিনিময়েই পাণ্ডবদের সঙ্গে বাস করবো না।'

দুর্যোধন জানিয়ে দিলেন পাঁচটি গ্রাম তো দূরের কথা, তীক্ষ্ণ সূঁচের অগ্রভাগ দিয়ে যতোটুকু ভূমি বিদ্ধ করা যায় তা-ও তিনি পাণ্ডবদের ছেড়ে দেবেন না।

ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'দেবগণ পাণ্ডবদের পিতা, তাঁরা পুত্রদের সাহায্য করবেন। দেবগণের সঙ্গে মিলিত হলে পাণ্ডবদের বিপরীত পক্ষে কেউ দৃষ্টিপাত করতেও ভয় পাবে।'

দুর্যোধন বললেন, 'তাই যদি হতো, তবে তাদের এতোদিন কষ্ট ভোগ করতে হতো না। দেবতারা আমার উপর বিক্রম প্রকাশ করবেন না, কারণ আমারও যথেষ্ট তেজ আছে। আমি মন্ত্রবলে অগ্নি নির্বাপিত করতে পারি, ভূমি বা পর্বতশিখর বিদীর্ণ হলে পুনরায় স্থাপিত করতে পারি, শিলাবৃষ্টি ও প্রবল বায়ু নিবারণ করতে পারি, জল স্তম্ভিত করে তার উপর দিয়ে রথ ও পদাতিক নিয়ে যেতে পারি। আমি যা বলি তা সর্বদাই সত্য হয়। সেজন্যই লোকে আমাকে সত্যবাক্ বলে।'

কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে এলেন। কৃষ্ণ আসছেন শুনেই ধৃতরাষ্ট্র হৃষ্ট হয়ে তাঁর উপযুক্ত সম্বর্ধনার জন্য পুত্রকে আদেশ দিলেন। দুর্যোধন নানা স্থানে সুসজ্জিত পরিমণ্ডল নির্মাণ করে খাদ্য পেয়

ইত্যাদির বন্দোবস্ত করলেন। বিদুর ইতিমধ্যে পুনরায় ধৃতরাষ্ট্রকে তাঁর পুত্রের বিরুদ্ধে এবং পাণ্ডবদের সপক্ষে অনেক কথা বলে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন।

কৃষ্ণ এসে তাঁর বৈবাহিক এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কোনো আদর আপ্যায়ন গ্রহণ না করে প্রথমেই বিদুরের কাছে গেলেন। আর বিদুরের কাছে যাওয়া মানেই কুন্তীর কাছে যাওয়া। কৃষ্ণ আসছেন জেনে দুর্যোধন যতো আয়োজন করেছিলেন তার আসল উদ্দেশ্যটা খুব ভালো ছিলো না। তিনি তাঁকে বন্দী করতে চেয়েছিলেন। আবার এদিকে কৃষ্ণও যে এসেছিলেন সন্ধির নামে, তাও সন্ধির চেহারায় কর্ণকে দলে টেনে নেবার চেষ্টায়। বৈবাহিকের ভোজ্য পেয় গ্রহণ না করলেও সভাস্থ সকলের সঙ্গে দেখা করতে এসে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়ে একেবারে মুহ্যমান করে দিলেন সবাইকে।

দুর্যোধন এসব প্রদর্শনে বিচলিত হতেন না। বরং পাণ্ডব শিবিরে উলুককে পাঠাবার সময়ে বলে দিলেন, 'কৃষ্ণকে আমার হয়ে বলবে, তোমার ইন্দ্রজাল দেখলে অস্ত্রধারী বীর ভয় পায় না, সিংহনাদ করে। আমরাও বহুপ্রকার যাদুবিদ্যা দেখাতে পারি, কিন্তু সেই উপায়ে কার্যসিদ্ধি করতে চাই না। রাজাদের পক্ষে সেটা লজ্জা। ছিলে তো কংসের ভৃত্য, সেজন্য আমার মতো রাজা তোমার সঙ্গে যুদ্ধ পর্যন্ত করে না।'

মহাভারতে এই ধরনের বিশ্বরূপ আরো দুজন দেখাতে পারতেন বলে উল্লেখ আছে। এ কথা তো একান্তই সত্য যে পাণ্ডবদের যতো ক্লেশ, যতো গ্লানি সবই যুধিষ্ঠিরের জন্য। রাজ্যলিপ্সাও যুধিষ্ঠিরেরই প্রবল। যুধিষ্ঠিরই রাজা হয়েছেন, যুধিষ্ঠিরই রাজসূয় যজ্ঞের অধিকারী হয়েছেন, সেই সাধ মেটাতে অতি নিকৃষ্ট পদ্ধতিতে জরাসন্ধ বধ করেছেন, শিশুপালের মস্তক চূর্ণ করেছেন, অবশ্য সবই ভ্রাতাদের হাত দিয়ে। দেশদেশান্তর ঘুরে ক্লান্তবিধ্বস্ত হয়ে ভ্রাতারাই কতো রাজ্য জয় করে কতো রাজাকে যুধিষ্ঠিরের পদতলে এনে ফেলেছেন, সীমাহীন ধনরত্নের অধীশ্বর করেছেন। তারপর তিনি কী করলেন? জুয়া খেলে সবাইকে ডোবালেন। এখনো যে যুদ্ধের জন্য এতো আস্ফালন করছেন, তা-ও তাঁর নিজের ক্ষমতায় নয়। এখন তো আবার চতুর কৃষ্ণ এসে সঙ্গে জুটেছেন।

দুর্যোধন পাণ্ডবপক্ষের সকলেরই শত্রু। এমন কোনো অপযশ নেই যা তাঁর কপালে জোটেনি বিদুরের দয়ায়। এবং সেই বিদ্বেষ পরিজনদের মধ্যে ভালোভাবেই সংক্রামিত হয়েছে। অতএব দুর্নামের আর ভয় নেই দুর্যোধনের। পাণ্ডবদেরও যেমন সুনামের ক্ষয় নেই।

দুর্যোধন এটা ঠিকই বুঝেছেন যে পাঁচটা গ্রাম কেন ইন্দ্রপ্রস্থ দিয়ে দিলেও বিদুর এবং যুধিষ্ঠির যে ক্ষান্ত হবেন তা নয়। মাত্র ঐ অর্ধেক রাজত্বের জন্য তাঁরা পর্বতশিখর থেকে নামেননি। প্রয়াত শান্তনুর সিংহাসনে বসে সম্পূর্ণ হস্তিনাপুরের অধীশ্বর হবার বাসনাই তাঁদের মুখ্য

উদ্দেশ্য। বনবাসে যাবার সময়ও তাঁরা এই প্রতিজ্ঞা করেই গিয়েছিলেন, যুদ্ধে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করবেন, দুঃশাসনের রক্তপান করবেন। যখন জতুগৃহে আগুন লাগিয়ে বিদুরের পাঠানো যন্ত্রযুক্ত নৌকায় উঠলেন, তখনও চালক বলেছিলো, 'বিদুর আপনাদের আলিঙ্গন জানিয়ে বলেছেন, আপনারা দুর্যোধন কর্ণ এবং শকুনিকে যুদ্ধে জয় করবেন।' অবস্থাবৈগুণ্যে সে ইচ্ছা তাঁদের অবদমিত হয়ে থাকলেও সুযোগ পাওয়ামাত্রই সেটা তাঁরা কার্যকর করবেন, সে বিষয়ে দুর্যোধনের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সুতরাং অর্জিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করে নিজেকে বলহীন করা আর তাদের বলবান করার মতো মূর্খতা আর কী হতে পারে? ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হলে চলে না।

কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনে মুগ্ধ ভীষ্ম ও দ্রোণ বললেন, 'দুর্যোধন! যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করো, তিনি তাঁর সুলক্ষণ দক্ষিণ বাহু তোমার স্কন্ধে রাখুন, তোমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিন, (হে ঈশ্বর! কতো অলীক কল্পনাই না এঁরা করতে পারেন) ভীম তোমাকে আলিঙ্গন করুন (সর্বনাশ!)।'

এসবের কী জবাব দেবেন দুর্যোধন! মনে মনে বিদুরকে বাহবা দেন, কী করে এই সব সরল ধর্মজ্ঞ বৃদ্ধদের তাঁর কূটনীতির বুদ্ধি দিয়ে বশ করে ফেলেছেন। তাঁরা তো তাঁর ভালোর জন্যই বলছেন। ভাবছেন, এভাবেই তাঁদের সৌভ্রাত্র পুনরায় স্থাপিত হবে। প্রথমত, আদৌ তাঁরা ভ্রাতা নয়; তদ্ব্যতীত, সেই ভ্রাতৃত্বের জন্মই তো হয়নি কখনো। বিদুর ব্যতীত আর কারোকেই পাণ্ডবরা চেনেন না। জানেন না। মানেন না।

এদিকে হস্তিনাপুর থেকে সকলের নিকট বিদায় নিয়ে প্রত্যাবর্তিত হবার জন্য কৃষ্ণ যখন তাঁর রথে আরোহণ করলেন, তখন কর্ণকেও সঙ্গে নিলেন। আসল উদ্দেশ্য কৃষ্ণের এটাই ছিলো, যুদ্ধে কর্ণকে পাণ্ডবদের সঙ্গী হতে বলা। সন্ধির প্রস্তাবটা একটা ছলনামাত্র। এরকম যোদ্ধাকে সঙ্গে পেলে পাণ্ডবদের শক্তি দ্বিগুণ বেড়ে যাবে।

রথে তুলে বললেন, 'কুমারী কন্যার গর্ভে পুত্র হলে তাকে কানীনপুত্র বলে। কর্ণ, তুমি কানীনপুত্র। রাধেয়, তুমি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের সেবা করেছো, ধর্মশাস্ত্রের সূক্ষ্ম তত্ত্বসকল শিখেছো। তুমি ধর্মানুসারে পাণ্ডুরই পুত্র। অতএব তুমি রাজা হও। তোমার পিতৃপক্ষীয় পাণ্ডবগণ এবং মাতৃপক্ষীয় বৃষ্ণিগণ, দুই পক্ষকেই তোমার সহায় বলে জেনো। তুমি আজ আমার সঙ্গে চলো, পাণ্ডবরা জানুন যে তুমি যুধিষ্ঠিরের অগ্রজ। তোমার পাঁচভ্রাতা এবং দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র এবং অভিমন্যু তোমার চরণধারণ করবেন, দ্রৌপদীও ষষ্ঠকালে তোমার সঙ্গে মিলিত হবেন। আমরা তোমাকে পৃথিবীর রাজপদে অভিষিক্ত করবো। কুন্তীপুত্র, তুমি ভ্রাতৃগণে বেষ্টিত হয়ে রাজ্যশাসন করো, পাণ্ডবভ্রাতাদের সঙ্গে তোমার সৌহার্দ্য হোক।'

মৃদু হেসে কর্ণ বললেন, 'ধর্মশাস্ত্র অনুসারে আমি পাণ্ডুরই পুত্র, সে কথা আমি জানি। কুন্তী

আমাকে গর্ভে ধারণ করেন এবং হিত চিন্তা না করে ত্যাগ করেন। অধিরথ আমাকে তাঁর গৃহে আনেন, তাঁর পত্নী রাধার স্নেহবশে স্তনদুগ্ধ ক্ষরিত হয়েছিলো। আমি কী করে তাঁর পিণ্ডলোপ করতে পারি? পত্নীদের সঙ্গে আমার প্রেমের বন্ধন আছে। গোবিন্দ! সমস্ত পৃথিবী এবং রাশি রাশি সুবর্ণ পেলেও আমি সেই সম্বন্ধ কখনো অস্বীকার করতে পারি না। তদ্ব্যতীত, আমি ত্রয়োদশ বৎসর দুর্যোধনের আশ্রয়ে নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগ করেছি, সূতগণের সঙ্গে আমি বহু যজ্ঞ করেছি, তাদের সঙ্গে সম্বন্ধও আমার গভীর। আর সর্বোপরি, দুর্যোধন আমার ভরসাতেই যুদ্ধের উদযোগ করেছেন। দ্বৈরথ যুদ্ধে অর্জুনের প্রতিযোদ্ধারূপেই আমাকে বরণ করেছেন। কোনো কিছুর বিনিময়েই আমি তাঁর সঙ্গে মিথ্যাচার করতে পারি না। কেশব! সারা বিশ্বে পুণ্যতম স্থান কুরুক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়মণ্ডল যেন অস্ত্রযুদ্ধে নিহত হন। সমস্ত ক্ষত্রিয়ই যেন স্বর্গলাভ করেন।'

কৃষ্ণ একটু হাসলেন, 'তাহলে তুমি পৃথিবীর রাজ্য চাও না?'

কর্ণও মৃদুহাস্যে বললেন, 'সব জেনেও আমাকে কেন ভোলাচ্ছো। পৃথিবীর ধ্বংস আসন্ন, আমরা তার নিমিত্তমাত্র। আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি, তুমি এক রক্তাক্ত পৃথিবীকে হাতে ধরে নিক্ষেপ করছো আর অগ্নিস্তূপের উপর উঠে দাঁড়িয়ে যুধিষ্ঠির স্বর্ণপাত্রে ঘৃতপায়েস ভক্ষণ করছেন, আর তোমার পৃথিবী তা গ্রহণ করছে।'

কৃষ্ণ বললেন, 'তা হলে তুমি এই পৃথিবীর বিনাশই চাও?'

কর্ণ কৃষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন করে বললেন, 'হয়তো স্বর্গেই পুনরায় আমাদের মিলন হবে।' এই বলে নেমে গেলেন রথ থেকে।

কৃষ্ণ বিফল হয়ে ফিরে গেলে কুন্তী ভাবলেন, কর্ণ তো আমারই পুত্র। আমি কিছু বললে কি সে শুনবে না? সকলের মতো আমিও জানি আমার পুত্র দয়ালু, সত্যনিষ্ঠ। এই রকম ভেবে কুন্তীও কর্ণর নিকটে গেলেন। কর্ণ কুন্তীকে দেখতে পেয়ে সবিস্ময়ে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, 'আমি অধিরথ ও রাধার পুত্র কর্ণ। আজ্ঞা করুন, আপনার জন্য আমি কী করতে পারি।'

কর্ণর বাক্য শুনে কুন্তী বললেন,'কর্ণ, তুমি কৌন্তেয়। রাধার গর্ভে তোমার জন্ম হয়নি, অধিরথও তোমার পিতা নন, তপনদেব তোমার জন্মদাতা। তুমি সর্বগুণসম্পন্ন, আমার পুত্রদের সর্বজ্যেষ্ঠ —'

কর্ণ বললেন, 'ক্ষত্রিয়জননী, আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা নেই। আপনার অনুরোধও আমি ধর্মসংগত মনে করি না। আপনি আমাকে ত্যাগ করেছিলেন। তাতে আমার যশ ও কীর্তি নষ্ট করেছেন। জন্মে ক্ষত্রিয় হলেও আপনার জন্য আমি ক্ষত্রিয়োচিত সম্মান পাইনি। এরচেয়ে অধিক অপরাধ কোনো শত্রুও করতে পারে না। যথাকালে আমার প্রতি আপনার কিঞ্চিৎমাত্র

দয়াও ছিলো না। এখন এসেছেন কেবল আপনার নিজের হিতের জন্য। আমার জন্য নয়। কিন্তু আপনার আগমন আমি ব্যর্থ করবো না, আমি অর্জুনকে নিহত করে অভীষ্ট ফল লাভ করবো, অথবা তার হাতে নিহত হয়ে যশোলাভ করবো। যেই মরুক, অর্জুন অথবা আমাকে নিয়ে আপনার পাঁচপুত্রই জীবিত থাকবে।'

স্বার্থপর কুন্তী বললেন, 'এই কথা কিন্তু মনে রেখো।' বলতে বলতে পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে সহসা স্নেহে আপ্লুত হয়ে আলিঙ্গন করলেন পুত্রকে, আশীর্বাদ করলেন। কর্ণ তাঁকে অভিবাদন করলেন।

৯

অতঃপর যা অবশ্যম্ভাবী তাই হলো। শুরু হয়ে গেলো যুদ্ধের প্রস্তুতি। কুরু পিতামহ ভীষ্ম সিংহনাদ করে শঙ্খ বাজালেন। তখন ভেরী পণব আনক প্রভৃতি রণবাদ্য তুমুল শব্দে বেজে উঠলো। কৃষ্ণও তাঁর পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজালেন। যুধিষ্ঠির প্রভৃতিও নিজ নিজ শঙ্খ বাজালেন। সেই শব্দ যেন আকাশ ও পৃথিবী অনুনাদিত করে দুর্যোধনাদির হৃদয় বিদীর্ণ করে দিলো। কৃষ্ণ কুরু-পাণ্ডব সেনার মধ্যে রথ নিয়ে গেলেন। অর্জুনও ঐ পক্ষের স্বজনদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বেদনায় কম্পিত হলেন। তাঁর হৃদয়ও দুর্যোধনের হৃদয়ের মতো বিদীর্ণ হলো। ব্যাকুল হয়ে বললেন, 'আমি বিজয় চাই না। যাদের সঙ্গে বিজেতা হতে যাচ্ছি, তারা কারা? কাদের দেখছি আমি? কাদের নিরীক্ষণ করে আমার বক্ষঃস্থল আমাকে বিরত হতে বলছে? দুই পক্ষেই পিতা-পিতামহস্থানীয় গুরুজন, আচার্য মাতুল শ্বশুর ভ্রাতা পুত্র ও সুহৃদগণ। যুদ্ধ তবে আমি কার সঙ্গে করবো?' কৃষ্ণ তাঁকে ব্যথিত ও অবসন্ন দেখে বললেন, 'এই সংকটকালে তুমি মোহগ্রস্ত হলে চলবে কেন? ক্লীব হয়ো না।' তথাপি অর্জুনকে যুদ্ধবিমুখ দেখে, শোকাচ্ছন্ন দেখে এবং অনেক বোঝালেও বুঝছেন না দেখে কৃষ্ণ তাঁকে বিশ্বরূপ দেখালেন। অর্জুন দেখলেন, দংষ্ট্রাকরাল কালানলসন্নিভ মুখসকলের মধ্যে পতঙ্গ যেমন প্রদীপ্ত অনলে প্রবেশ করে সেই রকম দ্রুতবেগে জীবসমূহ সেই মুখসকলের মধ্যে প্রবেশ করছে। জ্বলন্ত বদনে সর্বদিক থেকে সমগ্রলোক গ্রাস করতে করতে লেহেন করছে। সমস্ত জগৎ সেই তেজে পূরিত হয়ে সন্তপ্ত হচ্ছে। অর্জুন অভিভূত হয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণত হলেন। ভয়ার্ত আবেগে বললেন, 'কে তুমি? তোমাকে নমস্কার। হে দেবেশ, প্রসন্ন হও।'

কৃষ্ণ বললেন, 'আমি লোকক্ষয়কারী কাল। এখানে যারা সমবেত হয়েছে, তুমি না মারলেও তারা মরবে। সব্যসাচী! তুমি নিমিত্তমাত্র। ওঠো, যশোলাভ করো। শত্রুজয় করে সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ করো।'

অর্জুনের অন্তর যখন স্বজনদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে ব্যথিত, অবসন্ন, এঁদের সঙ্গে যুদ্ধ জয় করার চেয়ে ভিক্ষান্ন ভোজনও অনেক ভালো বলে মনে করছেন, এবং কৃষ্ণ যখন তাঁকে উত্তপ্ত করার জন্য বিশ্বরূপ দর্শন করালেন, সেই সময়ে যুধিষ্ঠির তাঁর বর্ম খুলে, অস্ত্রত্যাগ করে, দ্রুত রথ থেকে নামলেন এবং শত্রুসেনার ভিতর দিয়ে পদব্রজে যুক্তকর হয়ে ভীষ্মের অভিমুখে চললেন। তাঁকে এভাবে যেতে দেখে সকলেই উৎকণ্ঠিত বোধ করলেন। ভ্রাতারা অগ্রসর হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'একি। শত্রুসৈন্যর মধ্য দিয়ে আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আপনার অভিপ্রায় কী?' ক্ষণকালের জন্য মনে হয়েছিলো যুধিষ্ঠির এইজন্যই বুঝি মহাত্মা যুধিষ্ঠির। এখন আর

তিনি যুদ্ধ চান না, এভাবেই সব থামিয়ে দিতে চলেছেন। তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। যেমন যাচ্ছিলেন তেমনই যেতে লাগলেন। কৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, 'ইনি ভীষ্মদ্রোণাদি গুরুজনদের সম্মান দেখিয়ে তারপর যুদ্ধে নিয়োজিত হবেন। শাস্ত্রে আছে, গুরুজনদের সম্মানিত করে কোনো কর্মে প্রবিষ্ট হলে সে কাজ সম্পন্ন হয়।'

অত বুদ্ধিমান হয়েও কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে চিনতে পারেননি, কিংবা পেরেও অর্জুনকে প্রবোধ দিচ্ছেন। হাজার হোক, যুধিষ্ঠির তো বিদুরের পুত্র! স্বার্থসিদ্ধির বুদ্ধিতে তিনি সকলের ঊর্ধ্বে। অন্তত এই কর্মে তিনি তা স্পষ্টতই প্রমাণ করলেন। অর্জুনের মতো তাঁর হৃদয়ে কোনো দুর্বলতার প্রশ্ন নেই। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য যুদ্ধে জয়ী হয়ে রাজ্য গ্রহণ। যে উদ্দেশ্যে অজ্ঞাতবাসে থেকে দ্রুপদের জামাতা হয়েছিলেন, উদ্দেশ্য তাঁর সেই গন্তব্যেই স্থিরীকৃত। তিনি জানতেন ভীষ্মকে জয় করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। কী উপায়ে তাঁকে বধ করা যায় সেই কথাটা জানবার জন্যই তাঁর এই গুরুপ্রণামের ছলনা।

ভীষ্মের কাছে এসে তাঁর পদবন্দনা করে বিগলিত করলেন। বললেন, 'পিতামহ, আশীর্বাদ করুন। যুদ্ধে অনুমতি দিন।'

ভীষ্ম বললেন, 'যদি তুমি এভাবে আমার কাছে না আসতে, আমি তোমাকে পরাজয়ের জন্য অভিশাপ দিতাম। তোমার ব্যবহারে আমি প্রকৃতই প্রীতিলাভ করেছি।'

যুধিষ্ঠির যথাযোগ্য বিনীত বচনে বললেন, 'মহাপ্রাজ্ঞ, আমার হিতের জন্য আপনি মন্ত্রণা দিন।'

ভীষ্ম বললেন, 'আমি তোমার শত্রুপক্ষে যুদ্ধ করছি, তুমি আমার কাছে কী সাহায্য চাও?'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'পিতামহ, আপনি অপরাজেয়। যদি আমাদের শুভকামনা করেন, তবে বলুন, আপনাকে কোন উপায়ে জয় করবো?'

ভীষ্ম হেসে বললেন, 'আমি সকলেরই অবধ্য। আমাকে তোমরা জয় করতে পারবে না। তুমি পরে আমার কাছে এসো।'

ভীষ্মের কাছে তাঁর মৃত্যুর উপায় পরে জানবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে দ্রোণাচার্যের কাছে গেলেন। সেখানে গিয়েও এই ভক্তি গদগদ ভাব দেখিয়ে নানা ছলে তাঁর মৃত্যুর উপায় জেনে নিলেন। তারপর গেলেন কৃপাচার্যের কাছে। কিন্তু কৃপাচার্য কিছু বললেন না। তিনি যুধিষ্ঠিরের মনোভাব বুঝতে পেরেছিলেন। যুধিষ্ঠির শল্যের কাছেও গেলেন। গিয়ে তাঁকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করে বললেন, 'আপনি পূর্বে বর দিয়েছিলেন যে যুদ্ধকালে সূতপুত্রের তেজ নষ্ট করবেন, আমি সেটাই আবার কামনা করছি।' শল্য বললেন, 'তাই হবে।' অতঃপর কার্যসিদ্ধ করে যুধিষ্ঠির ফিরে এলেন।

কৃষ্ণ অর্জুনকে যেভাবে চালিত করতে চেয়েছেন সেভাবেই তিনি চলেছেন। যুধিষ্ঠির কিন্তু নামতই ধার্মিক। এটাও শ্রবণ থেকে শ্রবণান্তরে ব্যাপ্ত প্রচার ব্যতীত অন্য কিছু নয়। এবং সেটা তাঁর প্রতি পদক্ষেপেই প্রকট। অর্জুনের হৃদয়বৃত্তি তদপেক্ষা অনেক বড়, অনেক মহৎ। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় ভীমের শান্তিবাদ। শেষ পর্যন্ত ভীমও যুদ্ধ করতে চাইলেন না। বললেন, 'হে মধুসূদন! যুদ্ধের কথা বলো না। তুমি আমাদের পিতামহ ভীষ্ম ও অন্যান্য সভাসদকে বলো, যা করলে আমাদের পরস্পর সৌভ্রাত্র জন্মে ও দুর্যোধন প্রশান্ত হয়, সেই উপায়ই তুমি নির্ধারণ করবে।'

কৃষ্ণ যদি সে বিষয়ে উদ্যোগী হতেন হয়তো বা সেটা সম্ভব হতো। দুর্যোধন জন্মাবধি শুনে এসেছেন তাঁকে মেরে ফেলা হলো না কেন, সে নিষ্ঠুর, পাপপরায়ণ, ঐশ্বর্যমদমত্ত। পরিজনদের নিকট বিদুর তাঁকে একটি নরকের কীট বানিয়ে রেখেছেন। কখনো কারো কাছে ভালো ব্যবহার পাননি, কারো মুখে কটু বিশেষণ ব্যতীত কোনো স্বাভাবিক কথা শোনেননি, জন্ম থেকে শুধু জেনেছেন জন্মানো মাত্র তাঁকে মেরে না ফেলাটাই ঘোর অন্যায় হয়েছে। তথাপি যে দুর্যোধন তাঁর স্বাভাবিক চরিত্র নিয়ে বেড়ে উঠেছেন, তার চেয়ে বড়ো ঘটনা আর কী হতে পারে? একমাত্র কর্ণ ব্যতীত কোথাও যার কোনো শান্তি নেই, সান্ত্বনা নেই, আশ্রয় নেই, ভালোবাসা নেই, স্নেহমমতাপ্রীতি কিছুই নেই, তাকে তুষ্ট করতে কৃষ্ণর একটা নিমেষের অধিক ক্ষয় হতো না। কিন্তু তিনি তা করলেন না। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো।

সর্বমোট আঠারো দিনের যুদ্ধের নবম দিনে ভীষ্ম সর্বতোভদ্র নামে এক মহাব্যূহ রচনা করলেন। কৃপ, দ্রোণ, ভুরিশ্রবা, শল্য, ভগদত্ত, দুর্যোধন, ইত্যাদি এ ব্যূহের বিভিন্ন স্থানে রইলেন। সেদিন ভীষ্মের প্রচণ্ড বাণবর্ষণে পাণ্ডবসেনা বিধ্বস্ত হলো, সকলে পলায়ন করতে লাগলো। হস্তী ও অশ্বের মৃতদেহে, ভগ্ন রথ ও ধ্বজে রণস্থল ব্যাপ্ত হলো, সৈন্যরা হাহাকার করতে লাগলো।

কৃষ্ণ অর্জুনকে উশকে দিয়ে বললেন, 'তুমি না বিরাটনগরে সঞ্জয়কে বলেছিলে, ভীষ্ম দ্রোণ প্রমুখ কুরুসৈন্য সংহার করবে? ক্ষত্রধর্ম মনে রেখে এখন সেই বাক্য স্মরণ করো।' অর্জুন বিষণ্ন স্বরে বললেন, 'যাঁরা অবধ্য তাঁদের বধ করে নরকের পথ-স্বরূপ রাজ্যলাভের চেয়ে বনবাসের কষ্টভোগও অনেক ভালো। ঠিক আছে, তোমার কথাই রাখবো, ভীষ্মের নিকট রথ নিয়ে চলো। কুরুপিতামহকে নিপাতিত করবো।' তারপর দুপক্ষেই প্রবল যুদ্ধ হতে লাগলো, এপক্ষের ওপক্ষের বহু সৈন্য নিহত হলো। শেষে সূর্যাস্ত হলে যুদ্ধও শেষ হলো।

কিন্তু দশম দিনে ভীষ্ম নিপাতিত হলেন। নবম দিনের যুদ্ধের পরে পাণ্ডবরা কৃষ্ণসহ ভীষ্মের কাছে পুনরায় গিয়ে কী ভাবে তাঁকে বধ করবেন সেটা জেনে এলেন। প্রকৃত পক্ষে, পাণ্ডবদের জয়ার্থে ভীষ্ম স্বেচ্ছামৃত্যুই বরণ করেছিলেন। ভীষ্ম বলেছিলেন, 'আমি জীবিত থাকতে

তোমাদের জয় হবে না। আমি সুরাসুরেরও অবধ্য। কিন্তু আমি যদি অস্ত্র ত্যাগ করি তবে তোমরা আমাকে বধ করতে পারবে। কখনো শরণাপন্ন স্ত্রী, স্ত্রীনামধারী, বিকলেন্দ্রিয়, একপুত্রের পিতা, নিরস্ত্র, ভূপতিত, বর্ম ও ধ্বজবিহীন, ইত্যাদির সঙ্গে যুদ্ধ করতে আমার অবশ্য প্রবৃত্তি হয় না। তোমার সৈন্যদলে শিখণ্ডী আছেন। তিনি পূর্বে স্ত্রী ছিলেন তা তোমরা জানো। তাঁকে সম্মুখে রেখে অর্জুন আমাকে বধ করুক।' ভীষ্মের নিকট থেকে এই গুহ্য তথ্য জেনে দশমদিনে সেই শিখণ্ডীকেই সম্মুখে রেখে কৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করলেন। ভীষ্ম শিখণ্ডীর রথসেনাকে দগ্ধ করতে লাগলেন, কিন্তু তাঁর প্রতি শরনিক্ষেপ করলেন না। আর এদিকে ভীম নকুল সহদেব সাত্যকি এদেরও সব ধ্বংস করতে লাগলেন। যতোক্ষণ ভীষ্ম তাদের বিনষ্ট করলেন, শিখণ্ডীকে সম্মুখবর্তী করে, ভীষ্মকে পরাজিত করতে অক্ষম অর্জুনকে কৃষ্ণ পুনঃপুন অন্যায়ভাবে শরনিক্ষেপ করতে অনুপ্রাণিত করতে লাগলেন। যুদ্ধের কোনো রীতি না মেনে শিখণ্ডীর পিছনে প্রচ্ছন্ন থেকে অর্জুনও কৃষ্ণের পরামর্শে অনবরত শরনিক্ষেপ করতে লাগলেন। শিখণ্ডী শরদ্বারা ভীষ্মের বক্ষঃস্থলে আঘাত করলে ভীষ্ম বললেন, 'হে শিখণ্ডী! তুমি আমার প্রতি শরনিক্ষেপ করো বা না করো, আমি তোমার সঙ্গে কখনোই যুদ্ধ করবো না। বিধাতা তোমাকে শিখণ্ডিনীরূপে সৃষ্টি করেছিলেন, তুমি সেই শিখণ্ডিনীই আছো।'

ভীষ্মের কথা শুনে শিখণ্ডী বললেন, 'হে ভীষ্ম! তোমাকে আমি বিলক্ষণ জানি। তোমার দিব্যপ্রভা আমার অবিদিত নেই। তথাপি আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করবো। তুমি আমার প্রতি শরনিক্ষেপ করো বা না করো, তথাপি আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করবো। তুমি জীবিত থাকতে আমার কাছে ত্রাণ পাবে না।'

অর্জুন পিছন থেকে উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগলেন, 'আমি তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করবো, তুমি ভীষ্মকে অনবরত আক্রমণ করো, সংহার করো, আমি তোমার পশ্চাতেই আছি। আমি রক্ষা করবো তোমাকে। তুমি যথাসম্ভব শীঘ্র ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হও। তাঁকে বধ করো। যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণের মধ্যে এমন কেউ নেই যে ভীষ্মের সঙ্গে প্রতিযুদ্ধ করতে সমর্থ। ভীষ্মের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তুমি শরনিক্ষেপ করো।'

অর্জুনের বাক্য শ্রবণান্তর শিখণ্ডী নানাবিধ শরে তাঁকে আকীর্ণ করতে লাগলো, কিন্তু প্রতিবার ভীষ্ম তা উপেক্ষা করে প্রজ্বলিত দাবানলের মতো শূরগণকে দগ্ধ করতে লাগলেন। অর্জুনও শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে ভুরি ভুরি শরে তাঁকে আচ্ছাদিত করতে লাগলেন। ভুরি ভুরি শরে আকীর্ণ হয়েও তা অগ্রাহ্য করে, পাণ্ডবদের সৈন্যগণকে নিপাতিত করে, 'ভীষ্মরূপ অনল রথরূপ অগ্নিগৃহে অবস্থিত হয়ে চারুরূপ শিখায় শোভিত হলেন।' এক অপূর্ব শোভা প্রত্যক্ষ করলেন সকলে। কৃষ্ণের পরামর্শে তখন সমুদয় পাণ্ডব ও সঞ্জয়রা ভীষ্মকে পরিবেষ্টন করে ফেললেন ও পিছন থেকে মারণাস্ত্র প্রয়োগ করে তাঁকে বধ করতে চেষ্টা করলেন। কিছুকাল

মধ্যে সেই অজস্র নিক্ষিপ্ত শর ভীষ্মের শরীরে প্রবিষ্ট হলো, তত্রাচ তিনি পাণ্ডবদের সহস্র সৈন্য ধ্বংস করতে লাগলেন। শিখণ্ডীও যেমন শত সহস্র শরনিক্ষেপে তাঁকে বিচলিত করতে সক্ষম হলো না, তেমনি লুকিয়ে পিছনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে অর্জুনও কোনোরকমেই তাঁকে ব্যাহত করতে পারলো না। ভীষ্ম স্থির করেছিলেন শিখণ্ডীর সঙ্গে কখনোই যুদ্ধ করবেন না, অর্জুনকেও প্রাণে মারবেন না।

যুধিষ্ঠির অস্থির হয়ে গেলেন। মৃত্যুর উপায় জেনে এসেও কি তবে শেষরক্ষা হলো না? শেষ পর্যন্ত অবশ্য শিখণ্ডীর পিছনে লুকিয়ে অনবরত বাণবিদ্ধ করতে করতে অর্জুন একসময় ভীষ্মকে ধরাতলে নিপাতিত করলেন। প্রতিযোদ্ধার সম্মান পেলেন না, শুধু অন্যায়ের উপর দাঁড়িয়ে শেষ করলেন তাঁর কর্ম। যুধিষ্ঠির আশ্বস্ত হলেন। অর্জুন এতো শর নিক্ষেপ করেছিলেন ভীষ্মের শরীরে যে দুই আঙুল পরিমাণ স্থানও অবশিষ্ট ছিলো না। অর্জুনকে কিন্তু তিনি একটি প্রতিশরও নিক্ষেপ করেননি। না করে রথ থেকে পড়ে গেলেন। কাপুরুষের মতো অন্যায় যুদ্ধের আশ্রয় না নিলে পাণ্ডবরা যে জিততে পারতেন না, তার প্রথম নজির ভীষ্মের পতন। অবশ্য মহাভারতে কৃষ্ণ-অর্জুন-শিখণ্ডী কেউ-ই ভীষ্মকে মারবার জন্যে দায়ী নন, কারণ 'ইচ্ছা-মৃত্যু' ব্যতীত তাঁকে পাতন করা অসম্ভব ছিলো। তবু, যুদ্ধের একটা নিয়মবন্ধন ছিলো। সেই নিয়মকেও কৃষ্ণের পরামর্শে অতিক্রম করা হলো। আর নিষ্ঠুরতার তো কোনো তুলনাই নেই।

ভীষ্মের পতন কুরুপাণ্ডব সকলের নিকটই অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনা। এঁরা সবাই তাঁর শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন, দ্রোণাচার্যকে তিনিই তাঁদের অস্ত্রশিক্ষায় শিক্ষিত করবার জন্য সসম্মানে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা যাতে সেই শিক্ষায় বড়ো হয়ে ওঠেন, বীরত্বে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হন, তাঁদের প্রশংসা যেন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে, এটাই ছিলো তাঁর ঐকান্তিক প্রার্থনা। সকলের চক্ষুই সজল হয়ে উঠলো। সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে অর্জুনের শরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ভীষ্ম পূর্বদিকে মাথা রেখে রথ থেকে পতিত হলেন। হায় হায় করে উঠেছিলো সবাই। ভীষ্ম বললেন, 'ভূতলে পতিত থেকেই আমি উত্তরায়ণের প্রতীক্ষায় প্রাণ ধারণ করবো।'

বলাই বাহুল্য, কৌরবগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলেন। কৃপ দুর্যোধন প্রভৃতি রোদন করতে লাগলেন, যুদ্ধে আর তাঁদের মন গেলো না। ওদিকে, এইরকম দুর্জয় অন্যায়ভাবে কাপুরুষের মতো প্রতিযোদ্ধাহীন যুদ্ধ করে লজ্জিত না হয়ে পাণ্ডবগণ সিংহনাদ করতে লাগলেন। দুঃশাসনের মুখে ভীষ্মের পতনসংবাদ শুনে দ্রোণ মূর্ছিত হলেন। সংজ্ঞালাভ করে সৈন্যদের যুদ্ধ থেকে বিরত করলেন।

১০

রাজার ধর্ম ত্যাগ করে কর্ণ ভীষ্মের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলেন। পাণ্ডব সৈন্যগণ মধ্যে তখন সহস্র তূর্য বাজতে লাগলো, ভীম মহা আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন। যখন রাত একটু গভীর হলো, সকলে নিজ নিজ শিবিরে ফিরে গেলেন, তখন কর্ণ কিঞ্চিৎ ভীতভাবে ভীষ্মের কাছে এলেন এবং তাঁর চরণে মাথা রেখে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'কুরুশ্রেষ্ঠ, আমি রাধেয় কর্ণ। কোনো অপরাধ না করেও আমি আপনার বিরাগভাজন।'

চক্ষু উন্মীলিত করতে কষ্ট হচ্ছিলো ভীষ্মের। সবলে উন্মীলিত করে দেখলেন কেউ নেই। রক্ষীদেরও তিনি সরিয়ে দিলেন। তারপর এক হস্তে কর্ণকে পিতার ন্যায় আলিঙ্গন করে সস্নেহে বললেন, 'আমি জানি তুমি কুন্তীপুত্র, সূর্য তোমার পিতা। সত্য বলছি, তোমার প্রতি আমার কোনো বিদ্বেষ নেই। তুমি না এলেই আমি দুঃখ পেতাম। আমি তোমার দুর্জয় বীরত্ব, বেদনিষ্ঠা ও দানের বিষয়েও জ্ঞাত আছি।' আরো কিছু কথার পরে কর্ণ ভীষ্মকে অভিবাদন করে, সরোদনে রথে উঠে দুর্যোধনের কাছে চলে গেলেন।

ভীষ্ম কর্ণকে কোনো কটূক্তি করাতে কর্ণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, ভীষ্মের পতন না হলে তিনি যুদ্ধ করবেন না। দুর্যোধনের কাছে গিয়ে সকলকে প্রবোধ দিয়ে বললেন, 'মহাত্মা ভীষ্ম তোমাদের যেমন রক্ষা করতেন, আমিও তোমাদের সেভাবেই রক্ষা করবো। আমি পাণ্ডবদের যমালয়ে পাঠিয়ে পরম যশস্বী হবো। অথবা শত্রুহস্তে নিহত হয়ে ভূতলে শয়ন করবো।'

পরদিন রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে পুনরায় কর্ণ রথারোহণে ভীষ্মের কাছে এলেন। অশ্রুসিক্ত নয়নে কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, 'ভরতশ্রেষ্ঠ, আমি কর্ণ। আপনি আমাকে শুভবাক্য বলুন। কুরুবীরদের বিপদসাগরে ফেলে আপনি পিতৃলোকে যাচ্ছেন, ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্র যেমন মৃগনিধন করে, পাণ্ডবগণ সেইরূপ এখন কৌরবগণকে বিনাশ করবে। আপনি অনুমতি দিলে আমি প্রচণ্ড বিক্রমশালী অর্জুনকে অস্ত্রের বলে বধ করতে পারবো।'

ভীষ্ম বললেন, 'কর্ণ! সমুদ্র যেমন নদীগণের, ভাস্কর যেমন সকল তেজের, সাধুগণ যেমন সত্যের, উর্বরা ভূমি যেমন বীজের, মেঘ যেমন জীবগণের, তুমিও তেমন বান্ধবগণের আশ্রয় হও। আমি প্রসন্নচিত্তে বলছি, তুমি শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করো, কৌরবগণকে উপদেশ দাও, দুর্যোধনের জয়বিধান করো। দুর্যোধনের ন্যায় তুমিও আমার পৌত্রতুল্য। তুমি তাঁদের রক্ষা করো।'

ভীষ্মকে প্রণাম করে কর্ণ রণস্থলের দিকে চলে গেলেন। তারপর, কুরুরা কর্ণের পরামর্শে

সর্বসম্মতিক্রমে দ্রোণাচার্যকে সেনাপতি করলেন। দ্রোণ সকল যোদ্ধার শিক্ষক, মাননীয় এবং শ্রেষ্ঠ অস্ত্রধর। তাঁর তুল্য আর কে আছে? ভীষ্ম যুদ্ধ থেকে বিরত না হওয়া পর্যন্ত যে কর্ণ যুদ্ধ করবেন না সেটা কৃষ্ণ জানতেন। যখন যুধিষ্ঠির ভীষ্ম, দ্রোণ কৃপাচার্য ইত্যাদি অবধ্য যোদ্ধাদের কাছে গিয়ে ভক্তি গদ গদ ভাবে চরণবন্দনা করে কথা প্রসঙ্গে তাঁদের মৃত্যুর গুহ্য খবর সংগ্রহ করে এবং শল্যকেও সম্মান দেখিয়ে, প্রদক্ষিণ করে বলে এলেন তিনি যেন তাঁর পূর্বেকার বর ভুলে না গিয়ে যুদ্ধকালে সূতপুত্রের তেজ নষ্ট করেন, ততোক্ষণে কৃষ্ণ কর্ণের নিকট গেলেন। বললেন, 'হে কর্ণ। যতোদিন ভীষ্ম যুদ্ধ করবেন, সেই সময়টা তুমি আমাদের পক্ষে থাকো।' কর্ণ বললেন, 'কেশব! আমি দুর্যোধনের অপ্রিয় কার্য করবো না। জেনে রাখো আমি তাঁর হিতৈষী, তাঁর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়েছি।' কর্ণের সততা এবং কৃষ্ণের সততার অভাব, একে অপরের সম্পূর্ণ বিপরীত।

কর্ণকে পাণ্ডব দলে নিয়ে আসার জন্য কৃষ্ণ যে কতো ধরনের অন্যায় চেষ্টা করেছেন তা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। অতি ক্রূর উপায়ে ভীষ্মকে যে ভাবে অর্জুন কৃষ্ণের পরামর্শে অতিশয় কাপুরুষের মতো পাতিত করলেন সেটাও যুদ্ধের দশম দিনে প্রত্যক্ষ করলাম। এই যুদ্ধে পাণ্ডবদের দিকে থেকে কোনো ধর্ম ছিলো না, বীরত্ব ছিলো না, যোদ্ধাধার গৌরবও ছিলো না। নিয়ম কানুনের বালাই তো ছিলোই না। যা ছিলো তার নাম শঠতা আর তুলনারহিত চক্রান্ত ও হৃদয়হীনতা। এবং এই হৃদয়হীনতা যে কতো দূর যেতে পারে তার চরম উদাহরণ দ্রোণের মৃত্যু। রণস্থলে প্রবেশ করে যুদ্ধ না করা, অন্তরালে থেকে যুদ্ধ করা, আর সমর পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করা এটাই যাদববংশের তথা কৃষ্ণের ধর্ম। অর্জুন প্রকৃতই একজন মহাবীরের সম্মানে ভূষিত হবার মতো যোগ্যতা রাখেন। যুধিষ্ঠিরের মতো রাজ্যলোভী নন, ভীমের মতো ধৈর্যহীন নন, স্বীয় স্বার্থে অনৃতভাষণেও তিনি সম্মত নন। কিন্তু কৃষ্ণের চক্রান্তে যা যা তিনি করেছেন তাতে তিনি নিশ্চিতভাবেই কলঙ্কিত এবং নিন্দার্হ। তাঁর বীরত্বের সম্মান তিনি অধার্মিক কর্মে নিম্নগামী করেছেন। সেনাপতি হয়ে দ্রোণ অবিশ্রান্তভাবে কেবলমাত্র পাণ্ডবসৈন্যই নয়, বড় বড় যোদ্ধা, রাজা মহারাজাকে বিনষ্ট করতে লাগলেন এবং কুন্তীপুত্রগণকে নিপীড়িত ও ভয়ার্ত করতে লাগলেন; তাতে একথা স্পষ্টই অনুমিত হলো পাণ্ডবদের জয়াশা একা তিনিই সমূলে উচ্ছিন্ন করবেন। তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণ অর্জুনকে পরামর্শ দিলেন, 'ধর্ম পরিত্যাগ করো। নচেৎ দ্রোণ কারোকে আজ প্রাণ নিয়ে ফিরতে দেবেন না।'

পাঠকদের অবশ্যই মনে আছে যুধিষ্ঠির দ্রোণের মৃত্যুর গুহ্য তথ্যও সংগ্রহ করে এনেছিলেন। সেই পথেই কৌশল করে পা ফেলতে কৃষ্ণ উপদেশ দিলেন। কৃষ্ণের অন্তরে কোনো বিবেকবোধ ছিলো না, ষড়যন্ত্র ব্যতীত তিনি জরাসন্ধকেও জয় করতে পারেননি, শিশুপালকেও নিধন করতে পারেননি। এই যুদ্ধেও তিনি অর্জুনকে দিয়ে সেভাবেই জয়ের পথ পরিষ্কার

করতে চাইলেন। বললেন, ‘শোনো, যা বোধ হচ্ছে, দ্রোণ আজ সকলকেই বিনাশ করবেন। তুমি বলো তাঁর পুত্র সংগ্রামে নিহত হয়েছে।’

কৃষ্ণ অনৃতবাক্য উচ্চারণেও যেমন বিমুখ নন, তেমনি যে কোনো হীনকর্ম করতেও দ্বিধাহীন। কৃষ্ণের যাদুবলে মোহচ্ছন্ন অর্জুন কিন্তু এই মিথ্যা উক্তিতে কোনো রকমেই সম্মত হলেন না। দ্রোণ বলেছিলেন, হাতে ধনুর্বাণ থাকলে তিনি দেবগণেরও অজেয়। কিন্তু যদি অস্ত্র ত্যাগ করেন, তবে মানুষও তাঁকে বধ করতে পারে। দ্রোণ অতিশয় পুত্রবৎসল, তার মৃত্যুসংবাদ শুনলে শোকে বিহ্বল হয়ে অবশ্যই তিনি অস্ত্রত্যাগ করবেন, আর তখনি তাঁকে নিহত করা যাবে।

অর্জুনকে সম্মত করা গেলো না, কিন্তু ‘সত্যবাদী’ যুধিষ্ঠির সম্মত হলেন। মালবরাজ ইন্দ্রবর্মার অশ্বত্থামা নামে একটি হাতি ছিলো। ভীম তাকে গদাঘাতে সংহার করে দ্রোণের কাছে গিয়ে বললেন, ‘অশ্বত্থামা হত হয়েছেন।’ ভীমসেনের কাছে অশ্বত্থামা হাত হয়েছেন শুনে তিনি বিমনা হলেন, কিন্তু বিশ্বাস হলো না। তখন তিনি একান্ত ব্যথিত হৃদয়ে যুধিষ্ঠিরকে স্বীয় পুত্র নিহত হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। প্রচারের দক্ষতায় তিনি চিরদিন শুনে এসেছেন যুধিষ্ঠির সত্যবাদী। তাঁর মনে হলো যুধিষ্ঠির ত্রিলোকের ঐশ্বর্যলাভ হলেও কদাচ মিথ্যাবাক্য উচ্চারণ করবেন না। সেজন্যই আর কারোকে জিজ্ঞাসা না করে যুধিষ্ঠিরকেই জিজ্ঞাসা করলেন। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, ‘দ্রোণাচার্য রোষবশ হয়ে আর দেড়দিন যুদ্ধ করলেই আপনার সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হবে। শান্তনুর সিংহাসনে কোনোদিন আর বসবার সুযোগ হবে না। আপনি মিথ্যা বলে ত্রাণ করুন।’

প্রথমে ভীম বলেছিলেন, ‘হে ব্রাহ্মণ! অশ্বত্থামা বিনষ্ট হয়েছেন। তবে আর কেন আপনি যুদ্ধ করছেন?’ যুধিষ্ঠির রাজ্যের লোভে মিথ্যে কথাটাই বললেন। ‘অশ্বত্থামা হত’ এই বাক্য দুটি খুব জোরে বললেন। তারপর অস্ফুটে বললেন, ‘ইতি কুঞ্জর।’ সেটা শোনা গেলো না।

দ্রোণ যখন যুধিষ্ঠিরের কথা বিশ্বাস করে পুত্রশোকে অত্যধিক কাতর হয়ে অশ্বত্থামার নাম উচ্চারণ পুর্বক উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করে উঠলেন, এবং রথোপরি সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র সন্নিবেশিত করে অস্ত্রত্যাগী হয়ে বিচেতন হলেন, যুধিষ্ঠির বলতে লাগলেন, ‘শীঘ্র তোমরা দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হও, এই সুযোগ।’

যুধিষ্ঠিরের আদেশে ধৃষ্টদ্যুম্ন তখন ঐ রকম বিচেতন অবস্থাতেই তাঁকে রথ থেকে নিপাতিত করলেন, কেশাকর্ষণ করে অসিদণ্ড দিয়ে মস্তক ছেদন করলেন। তারপর গুরুর প্রকাণ্ড মস্তক নিয়ে উল্লাসে মেতে উঠে তরবারি বিঘূর্ণিত করে সিংহনাদ করলেন। যুধিষ্ঠির এবং ভীম আনন্দে আত্মহারা হলেন। অচেতন অবস্থায় গুরুহত্যার এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে অর্জুন

ক্ষুব্ধ হলেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে তিরস্কার করে বলে উঠলেন, 'হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য সৌহার্দ্যবশত ও ধর্মানুসারে আমাদের পিতার তুল্য ছিলেন। তিনি আপনাকে শিষ্য ও সত্যপরায়ণ বলে জানতেন। বিশ্বাস করতেন আপনি তাঁকে কখনো মিথ্যা বলবেন না। গুরু কেবল আপনার বাক্য শ্রবণেই ন্যস্তশস্ত্র হয়ে ভগ্ননৌকার ন্যায় আপনার সম্মুখেই বিহ্বলতাবশত গতচেতন হলেন, আর আপনি রাজ্যলালসায় শিষ্য হয়েও সেই পুত্রশোকসন্তপ্ত গুরুকে এমন নৃশংসভাবে হত্যা করে হৃষ্টচিত্ত হচ্ছেন? আমি বারবার আপনাকে মিথ্যাকথা বলতে নিষেধ করেছিলোম, তুচ্ছ রাজ্যলোভে তথাপি আপনি লঘুচিত্ত ও অনার্যের মতো স্বধর্ম পরিত্যাগ করে নিত্যোপকারী যোগারূঢ় বৃদ্ধ আচার্যের প্রাণ সংহার করলেন? ধিক্! জীবনে আর প্রয়োজন কী? মরণই শ্রেয়। এই বয়সে কতোদিন আর রাজত্ব ভোগ করবেন?'

লক্ষণীয়, অর্জুন যতোবার যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার করছেন, ততোবার তাকে রাজ্যলোলুপ বলছেন। প্রকৃতপক্ষে দ্রোণাচার্যকে যেভাবে বধ করা হয়েছে, এবং তাঁর কাটা মুণ্ডু নিয়ে যে রকম বীভৎস উল্লাসে যুধিষ্ঠির ভীম নৃত্য করেছেন, সেই দৃশ্য দেখা যে-কোনো সুস্থ মানুষের পক্ষেই অসহ্য। যুদ্ধক্ষেত্রে তার প্রমাণও পাওয়া গেছে। প্রত্যেকেই এই অপকর্মের নিন্দা করেছে, ধিক্কার দিয়েছে। কৈশোরকাল থেকে দ্রোণাচার্য এঁদের গুরু। এঁদের তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন, ভালোবাসতেন এবং অর্জুনের প্রতি পক্ষপাত তাঁর অনিরুদ্ধ ছিলো। যুধিষ্ঠির যদি ক্ষত্রিয়ের মতো ন্যায়যুদ্ধে জয়ী হতেন, বীরের মতো সংহার করতেন, তা হলে উল্লসিত হবার কারণ ঘটতে পারতো। তা তিনি করেননি। মিথ্যে কথা বলে একটা অচৈতন্য মানুষের গলা কেটেছেন, আর তা নিয়ে লজ্জা নেই, দুঃখ নেই, আনন্দে নৃত্য করছেন। কয়েকদিন পূর্বে ভীষ্মকেও ঠিক একইভাবে শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে পিছন থেকে অনবরত বাণবিদ্ধ করেছেন অর্জুন। সম্মুখে দাঁড়িয়ে শিখণ্ডীও সমানে বাণ বর্ষণ করে গেছেন এবং জেনেছেন তিনি তাঁকে যতো বাণেই বিদ্ধ করুন না কেন, ভীষ্ম তাকে মারবেন না। অর্জুনকে মারবেন না। স্বধর্মে নিরত থেকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাঁরা জেতেননি। স্বধর্মে নিরত ছিলেন বলে দুর্যোধন হেরেছেন। মহাভারতে ধর্মের কোনো জয় নেই, ন্যায়ের কোনো স্থান নেই, সত্যের কোনো দাম নেই, বিবেকের কোনো দংশন নেই।

কৃষ্ণের কুটিল পরামর্শে হীনকর্ম এখানেই শেষ নয়, আরো আছে, যা আরো বীভৎস। পাঠকদের মনে থাকতে পারে চতুর্দশ দিনের যুদ্ধে অর্জুনের প্রতিজ্ঞা ছিলো সূর্যাস্তের পূর্বেই তিনি জয়দ্রথকে বধ করবেন। তা তিনি পেরে ওঠেননি। যখন সূর্য অস্ত গেলো এবং জয়দ্রথ যখন যুদ্ধ শেষ জেনে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে আকাশের দিকে তাকালেন, এই সময় কৃষ্ণ বললেন, 'ছলনা ভিন্ন জয়দ্রথকে বধ করা যাবে না, এই সুযোগ, জয়দ্রথকে তুমি বধ করো।' অর্জুন জয়দ্রথের প্রতি ধাবিত হলেন এবং কৃষ্ণের পরামর্শে তার শিরশ্ছেদ করলেন। শুধু তাই নয়,

কৃষ্ণ বললেন, 'এইবার এই কাটা মুণ্ড জয়দ্রথের বৃদ্ধ পিতা বৃদ্ধক্ষত্রের ক্রোড়ে ফ্যালো।' অর্জুন তাই করলেন। বৃদ্ধক্ষত্র তখন সন্ধ্যাবন্দনা করছিলেন, সহসা কৃষ্ণকেশ ও কুণ্ডলে শোভিত জয়দ্রথের ছিন্নমুণ্ড তাঁর ক্রোড়ে পতিত হতেই তিনি সচমকে অতি দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন, পুত্রের ছিন্নমস্তক দর্শনে তাঁরও মৃত্যু ঘটলো।

আরো আছে। কৃষ্ণের পরামর্শে অর্জুন পিছন থেকে সাত্যকির সঙ্গে যুদ্ধরত ভূরিশ্রবার দক্ষিণ হস্ত কেটে ফেললেন। কেননা সাত্যকি ভূরিশ্রবার কাছে হেরে যাচ্ছিলেন। যুদ্ধের মধ্যে নিয়ম বহির্ভূত এই অপকর্ম দেখে ভূরিশ্রবা অত্যধিক ক্ষুব্ধ হলেন। বললেন, 'অর্জুন, তুমি অত্যন্ত গর্হিত ও নৃশংস কর্ম করলে। আমি অন্যের সঙ্গে যুদ্ধে রত ছিলাম, সেই সময়ে তুমি এই কাজ করলে? যুদ্ধের এই শিক্ষা তোমাকে কে দিয়েছে? অন্ধক বংশের লোকজন সবাই ব্রাত্য, নিন্দার্হ কর্ম করাই তাদের স্বভাব। আমি জানি সেই বংশজাত কৃষ্ণের আদেশেই তুমি এই অন্যায় কর্মে প্রভাবিত হয়েছো। তার কথা তুমি শুনলে কেন? তোমার নিজের ধর্মবোধ কি তোমাকে বিরত করতে পারলো না?' এই বলে তিনি প্রায়োপবেশনে বসলেন এবং যোগস্থ হলেন মৃত্যুর জন্য।

দ্রোণের মৃত্যুর পর দুর্যোধন কর্ণকেই আনুষ্ঠানিকভাবে সেনাপতিত্বে বরণ করেছিলেন। কিন্তু ভীষ্মের যুদ্ধবিরতির পর থেকেই কর্ণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছিলেন। কৃষ্ণের প্রথম থেকেই এই লোকটিকে ভয়। তিনি বুঝেছিলেন কর্ণ আর অর্জুনের সম্মুখ যুদ্ধ হলে অর্জুন কখনোই জিততে পারবেন না। পাঠকরা জানেন, সে জন্য নানা কৌশলে কর্ণকে নিজেদের দলে এনে ফেলার অনেক চেষ্টাই তিনি করেছিলেন। কিন্তু সেই মনোরথ তাঁর পূর্ণ হয়নি। তারপরে কর্ণের স্বার্থপর মাতা কুন্তীও গিয়েছিলেন সেই অভিপ্রায় নিয়ে। তা-ও তাঁকে টলানো যায়নি। শুধু বলেছিলেন, 'অর্জুন ব্যতীত আর কারোকে আমি প্রাণে মারবো না। আমি অর্জুনের সঙ্গেই যুদ্ধ করতে চাই। তার ফলে হয়তো আমার মৃত্যু ঘটবে অথবা তাঁর। আপনার পঞ্চপুত্র পঞ্চপুত্রই থাকবে।'

ভীমের সঙ্গে যখন তাঁর যুদ্ধ হচ্ছিলো, তখন কর্ণ ভীমকে নিদারুণ ব্যাকুল ও বারবার অভিভূত করতে লাগলেন। কিন্তু সহসা কুন্তীর বাক্য স্মরণ করে ভীমসেনের প্রাণসংহার করতে পারলেন না। বললেন, 'ওহে তূবরক! তুমি মূঢ়! রণস্থল তোমার উপযুক্ত স্থান নয়। যে স্থানে বহুবিধ ভক্ষ্য, ভোজ্য ও পানীয় আছে, তুমি সেই স্থানেরই যোগ্য।' এই ধরনের সব উপহাস করে ভীম তরুণ বয়সে যে সকল অপ্রিয় কার্যের অনুষ্ঠান করেছিলেন, সে কথাও তাঁর কর্ণগোচর করতে লাগলেন। তারপর ধনুষ্কোটি দ্বারা স্পর্শ করে হাসতে হাসতে বললেন, 'আমার সদৃশ ব্যক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলে এইরূপ বা সেইরূপ অবস্থাও ঘটে। অতএব যেখানে কৃষ্ণ ও অর্জুন বিদ্যমান আছেন, তুমি সেখানেই যাও। তাঁরা তোমাকে রক্ষা করবেন।'

কর্ণ কেবলমাত্র ভীমকেই যে প্রাণে মারলেন না তাই নয়। যুধিষ্ঠিরও একবার এগিয়ে এসেছিলেন তাঁর অপটু বীরত্ব নিয়ে। তাঁকেও কর্ণ প্রাণে মারলেন না। কোনো লোভই যেমন

তাঁকে বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করাতে সমর্থ হলো না, তেমনি কুন্তীর নিকট কথা দিয়েছিলেন বলে ভীমকে পরাজিত করেও প্রাণে মারলেন না, যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করেও প্রাণে মারলেন না। কুবুদ্ধিতে কৃষ্ণ যতো পটু, সৎবুদ্ধিতে কর্ণ ততোই মহান। অবশ্য কুরুপক্ষে এমন কেউ নেই, যিনি যুদ্ধ করতে এসে যুদ্ধ না করে, যুদ্ধের নিয়ম ভেঙে, মিথ্যাচারের সাহায্যে শত্রু বধ করে, নিজেকে নীচাশয়ের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। ভীষ্ম দ্রোণ জয়দ্রথের মতো সব মহারথীকে কৃষ্ণ যেভাবে হত্যা করিয়েছেন অর্জুনকে দিয়ে, তার চাইতে অধিক কাপুরুষোচিত নীচকর্মসিদ্ধির কলঙ্ক আর কারো নামেই নেই।

কর্ণ যুদ্ধে নেমেই পাণ্ডবদের একেবারে উথালপাথাল করে তুলেছিলেন। পাণ্ডব সৈন্যরা ভয়ার্ত হয়ে পালাতে লাগলো। অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, ‘কর্ণের ভার্গবাস্ত্রের শক্তি দ্যাখো, আমি কোনো রকমেই এই অস্ত্র নিবারণ করতে পারবো না। কিন্তু কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ না করে পালাতেও পারবো না।’

কৃষ্ণ বললেন, ‘রাজা যুধিষ্ঠির কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। প্রথমে তাঁর কাছেই তোমার যাওয়া উচিত। এখন সেখানে চলো তো, তারপর ফিরে এসে যা হয় হবে।’

আসলে একথা বললেন অর্জুনকে বাঁচাবার জন্যই। আপাতত কর্ণকে যুদ্ধে নিযুক্ত রেখে ক্লান্ত করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো। সেজন্যই এই অজুহাতে অর্জুনকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তিনি সরিয়ে নিলেন।

কর্ণের দ্বারা প্রকৃতই যুধিষ্ঠির কিঞ্চিৎ ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলেন। কর্ণ তাঁকে মারেননি, কিন্তু উপহাস করতেও ছাড়েননি। কর্ণ উপহাস করে তাঁর পিঠে হাত রেখে বলেছিলেন, ‘হে পাণ্ডুনন্দন! তুমি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেও ক্ষত্রিয় ধর্ম পালন না করে প্রাণভয়ে সমর পরিত্যাগ করে পলায়ন করছো কেন? আমার মনে হয় তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম অবগত নও। যুদ্ধ করা তোমার কর্ম নয়। এখন সংগ্রাম ইচ্ছা পরিত্যাগ করো, বীরপুরুষদের কাছে আর যেও না, কোনো অপ্রিয় কথাও বোলো না।’

রণক্ষেত্র থেকে মহাত্মা যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ পালিয়ে বাঁচলেন।

অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, ‘ঐ দ্যাখো, সূতনন্দন কালান্তক যমের মতো ক্রুদ্ধ হয়ে রণস্থলে নিদারুণ কার্য সম্পাদন করে বারংবার আমার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করছে। এখন কর্ণকে পরিত্যাগ করে পলায়ন করা আমার নিতান্ত অকর্তব্য।’

কৃষ্ণ রণস্থল থেকে অর্জুনকে সরিয়ে নিতে নিতে বললেন, ‘হে পার্থ! রাজা যুধিষ্ঠির কর্ণবাণে নিতান্ত নিপীড়িত হয়েছেন। তুমি সর্বাগ্রে তাঁকে দর্শন ও আশ্বাস প্রদান করে পরে কর্ণকে নিপীড়িত করবে।’

এর মধ্যে অর্জুন ভীমকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে মহাত্মন! এখন ধর্মরাজ কোথায়?'

ভীম বললেন, 'ভ্রাতঃ! ধর্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির সূতপুত্রের শরনিকরে সন্তপ্ত হয়ে এখান থেকে চলে গেছেন। তিনি জীবিত আছেন কিনা সন্দেহ।'

তখন অর্জুন ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে তিনি সূতপুত্রের শরনিকরে গাঢ়তর বিদ্ধ হয়ে শিবিরমধ্যে প্রবেশ করেছেন। পুর্বে তিনি দ্রোণাচার্যের নিশিত শরে বিদ্ধ হয়েও বিজয়লাভ প্রত্যাশায় সংগ্রামস্থল ছেড়ে যাননি। আজ যখন তাঁকে সংগ্রামস্থলে দেখছি না, তখন কর্ণের সঙ্গে সংগ্রামে নিশ্চয়ই তাঁর প্রাণসংশয় উপস্থিত হয়েছে। অতএব চলো, অবিলম্বে তাঁর কাছে যাই।'

অন্য কোনো কারণে নয়, যে কুন্তীকে তিনি আদৌ শ্রদ্ধা করেন না, তাঁর কাছে দেওয়া বাক্য রক্ষার্থেই অবধারিত জয়কে উপেক্ষা করে, ভীম ও যুধিষ্ঠিরকে ছেড়ে দিয়েছিলেন কর্ণ। তাঁর মহত্ত্বের কোনো তুলনা নেই। বাক্ পৃথিবীর আদি সত্য। সেই সত্যরক্ষাই কর্ণের চরিত্রের মহত্তম বস্তু, তাঁর ধর্ম। এই প্রসঙ্গে দুর্যোধনকেও কৃতিত্ব দেওয়া আবশ্যক। কারণ যুদ্ধটা রাজার আদেশে এবং আদর্শেই চলে। কৌরবপক্ষে অসৎ রণনীতি অনুসরণের দৃষ্টান্ত বিরল। দুর্যোধনসহ প্রতিটি অবধ্য বীরকে কৃষ্ণের প্ররোচনায় পাণ্ডবেরা অন্যায় যুদ্ধে হত্যা করেছে।

কৃষ্ণ ভীমকে সংশপ্তকগণকে সংহার করতে বলে বেগগামী অশ্বগণকে সঞ্চালন করে অতি দ্রুত অর্জুনকে নিয়ে রাজা যুধিষ্ঠিরের কাছে গেলেন। দেখলেন তিনি একাকী শায়িত। এবং ভালোই আছেন। তাঁদের দেখে যুধিষ্ঠির আহ্লাদিত হয়ে অভিনন্দন করলেন। বললেন, 'হে কৃষ্ণ! হে ধনঞ্জয়! তোমাদের দেখে অতিশয় প্রীতিলাভ হচ্ছে। তোমরা অক্ষত শরীরে কর্ণকে নিহত করেছো। মহাবীর সূতপুত্র সমরাঙ্গনে আশীবিষ সদৃশ ও সমস্ত শস্ত্রপারদর্শী কৌরবগণের বর্ম। ঐ বীর পরশুরামের নিকট দুর্জয় অস্ত্রপ্রাপ্ত হয়েছে। কর্ণ সতত কৌরবগণের রক্ষক হয়ে শত্রুদের মর্দন করছে এবং সর্বদাই দুর্যোধনের হিতসাধনে তৎপর। তোমরা ভাগ্যক্রমে সেই অনলের মতো তেজস্বী, বাতাসের মতো বেগশালী, আমার মিত্রগণের অন্তকস্বরূপ মহাবীরকে বিনষ্ট করে আমার কাছে এসেছো। সে সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্ন নকুল সহদেব শিখণ্ডী ও পাঞ্চালগণকে পরাজিত করে, তাদের সমক্ষেই আমার রথধ্বজ ছিন্ন করে, অশ্বগণকে নিহত করে, আমাকে পরাজিত করে, সমরাঙ্গনে আমাকে অনুসরণ করে অনেক পরুষবাক্য প্রয়োগ করেছে। কর্ণকৃত অপমান আমার নিতান্ত অসহ্য বোধ হচ্ছে। আমি এই লোকটির ভয়ে তেরো বৎসর নিদ্রিত হতে পারিনি, সুখী হতে পারিনি। আজ অবশ্য সে আমাকে মারেনি, কিন্তু পরাজিত করে উপহাস করেছে। কী ভাবে তোমরা তাকে মারলে সে কথা আমাকে অবগত করাও। কী ভাবে সূতনন্দনের মস্তকচ্ছেদ করলে?'

যখন শুনলেন কর্ণকে নিপাত না করে অর্জুন তাঁকে দেখতে এসেছেন, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। বললেন, ‘আমি রাজ্যলাভে একান্ত লোলুপ। হে ধনঞ্জয়! বীজ যেমন মেঘের উপর নির্ভর করে, তদ্রূপ আমরা কেবল রাজ্যলাভের আশায় তোমার উপরই নির্ভর করেছিলাম। দুর্যোধনের উন্নতি বিষয়ে আমি অণুমাত্র প্রত্যাশা করিনি, এবং তুমি যে সূতপুত্রকে দেখে ভীত হবে আমার মনে কখনও এরকম বিশ্বাস হয়নি। বিশেষ বাসুদেব তোমার সারথি হয়েছেন, তথাচ তুমি সূতপুত্রের ভয়ে ভীত হয়ে রণস্থল থেকে প্রত্যাগমন করলে। এখন তুমি বাসুদেবকে গাণ্ডীব শরাসন প্রদান করো। তুমি সমর পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করা অপেক্ষা পঞ্চম মাসে গর্ভস্রাবে বিনষ্ট হলে না কেন? হে দুরাত্মা! এখন তোমার গাণ্ডীবে ধিক্! বাহুবীর্যে ও অসংখ্য শরনিকরেও ধিক্!’

এভাবে অন্যায় তিরস্কারে অর্জুন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে অসিগ্রহণ করলেন। কৃষ্ণ অতি সত্বর বাধা দিলেন। অর্জুন যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টিপাত করে ক্রুদ্ধ সর্পের মতো নিশ্বাস ত্যাগ করে বললেন।‘‘তুমি অন্যকে গাণ্ডীব সমর্পণ করো’’ এই কথা যিনি আমাকে বলবেন, আমি তাঁর মস্তকচ্ছেদন করবো, এই আমার গুপ্ত প্রতিজ্ঞা। হে রাজা! তুমি রণস্থল থেকে একক্রোশ অন্তরে অবস্থান করছো, আর তিরস্কার করছো আমাকে। তোমার তো সে অধিকার নেই-ই, বললে বলতে পারেন ভীম। ঐ মহাবল একাকী দুর্যোধনের চতুরঙ্গ বল প্রমথিত করে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ নিষাদ মাগধ এবং অন্যান্য শত্রুগণের প্রাণসংহার করেছেন। শিখণ্ডী ভীষ্মের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হলে আমিই তাকে রক্ষা করেছিলোম, নচেৎ দ্রুপদতনয় কদাচ তাঁকে সংহার করতে পারতো না। আমি স্ত্রী পুত্র শরীর ও জীবন পর্যন্ত পণ করে তোমার হিতার্থে যত্নবান থাকি, তথাপি তুমি আমাকে বাক্যবাণে নিপীড়িত করছো। আমি তোমার জন্য মহারথগণকে নিহত করেছি, আর তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে দ্রৌপদীর শয্যায় শয়ন করে আমার অবমাননায় প্রবৃত্ত হয়েছো। তুমি নিতান্ত নিষ্ঠুর। তোমার নিকট কখনো কোনোদিন সুখী হতে পারিনি। তুমি অক্ষক্রীড়ায় আসক্ত হয়ে, স্বয়ং ঘোরতর অধর্মানুষ্ঠান করে, এখন আমাদের প্রভাবে শত্রুদের পরাজিত করতে অভিলাষ করছো। আমি তোমার রাজ্যলোভে বিন্দুমাত্র সন্তুষ্ট নই। তোমার অক্ষক্রীড়া বিষয়ে সহদেব অনেক দোষ কীর্তন করেছিলো, বুঝিয়েছিলো। তুমি কি সে কথা শুনেছো? আজ আমরা কার পাপে এই দুঃখের সাগরে নিপতিত? তোমার অপরাধেই আজ এই যুদ্ধ, এতো মনুষ্যের ছিন্নগাত্র ভূমিতলে পতিত। কৌরব বংশ আজ কার জন্য নির্মূল হতে চলেছে? তোমার জন্য। তোমার দোষেই প্রাচ্য-প্রতীচ্য-উদীচ্য-দাক্ষিণাত্যগণ নিহত। হে রাজন! তুমি দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়েছিলে, তোমার জন্যই আমাদের রাজ্যনাশ ও অসহ্য দুঃখ উপস্থিত হয়েছে।’

রোষবশে অর্জুনের মনের কথা এতোদিনে উচ্চারিত হলো। এই মানুষটির জন্যই তাঁর প্রথম

প্রণয় বিনষ্ট হয়েছে। বারো বছর বনবাস করতে হয়েছে। দ্রৌপদীকে তিনি কখন পেলেন? দুঃখ কি ছিলো না সেজন্য? ছিলো। তখনকার দিনে জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে কনিষ্ঠভ্রাতাদের অন্ধভক্তি করারই নিয়ম ছিলো। কিন্তু এই মুহূর্তে সমস্ত বেদনাই বেরিয়ে এসেছে মন থেকে। অর্জুন কিছুতেই তাঁর ক্রোধ সামলাতে পারছিলেন না।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য কৃষ্ণের মধ্যস্থতায় সবই আবার ঠিকঠাক হয়ে গেলো এবং পুনরায় সংগ্রামস্থলে উপস্থিত হলেন অর্জুন, এবং কর্ণ-বিনাশে কৃতসংকল্প হলেন। কৃষ্ণ বললেন, 'হে অর্জুন! তুমি কিন্তু কর্ণকে অবজ্ঞা করো না। মহারথ সূতপুত্র মহাবল পরাক্রান্ত। সুশিক্ষিত কার্যকুশল বিচিত্র যোদ্ধা, এবং কীরূপ স্থানে, কী রকম কালে, যুদ্ধ কর্তব্য সে বিষয়ে অভিজ্ঞ। আমি সংক্ষেপে তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি, তুমি মন দিয়ে শোনো। ঐ বীর আমার মতে, হয়তো বা তোমাপেক্ষা সমধিক বলশালী হবে। অতএব খুব সতর্কভাবে তাঁকে সংহার করা কর্তব্য। কর্ণ তেজে হুতাশসঙ্কাশ, বেগে বায়ুসদৃশ, ক্রোধে অন্তকতুল্য। ঐ বিশালবাহুশালী বীরবরের দৈঘ্যও যেমন, সে রকম বক্ষঃস্থলও অতি বিস্তৃত। এবং সে নিতান্ত দুর্জয়, অভিমানী, প্রিয়দর্শন, যোদ্ধৃগণে সমলঙ্কৃত, মিত্রগণের অভয়প্রদ, পাণ্ডবগণের বিদ্বেষী ও ধার্তরাষ্ট্রদিগের হিতানুষ্ঠানে নিরত। তাকে বিনাশ করা অতি কঠিন। অদ্য যুদ্ধের সপ্তদশ দিন। যাবতীয় পাণ্ডব ও সমাগত অন্যান্য নৃপতিরা তোমাকে আশ্রয় করেই অবস্থান করছেন। কৌরব পক্ষে এখনো অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা, কর্ণ, মদ্ররাজ আর কৃপাচার্য এবং পাঁচজন মহারথী উপস্থিত আছেন।'

অর্জুন বললেন, 'তুমি যখন আমার সহায় তখন আমার জয়লাভ হবেই। এখন আমি সূতপুত্রকে অশঙ্কিতচিত্তে সমরাঙ্গনে সঞ্চারণ করতে নিরীক্ষণ করছি।'

এদিকে শল্য কর্ণকে বললেন, 'হে রাধেয়! তুমি যার অনুসন্ধান করছো, ঐ দ্যাখো, সে রোষারক্ত নয়নে মহাবেগে আমাদের দিকেই ধাবিত হচ্ছে। কৌরবগণ এই মহাসাগরে দ্বীপের মতো তোমার আশ্রয় গ্রহণ করেই অবস্থান করছেন। তুমি যে রকম ধৈর্যসহকারে বৈদেহ কাম্বোজ নগ্নজিৎ ও গান্ধারগণকে পরাজিত করেছো, সেই রকম ধৈর্য অবলম্বন করেই স্বীয় পুরুষকার প্রকাশ করে অর্জুন ও বাসুদেবের দিকে গমন করো।'

কর্ণ বললেন, 'হে মদ্ররাজ! তুমি এতোদিন আমাকে তোমার বাক্যশল্যেই বিদ্ধ করেছো। কিন্তু আজ তোমার ব্যবহারে আমার মন শান্ত হয়েছে। তুমি চিন্তা করো না। ধনঞ্জয় থেকে তোমার কিছু মাত্র ভয় নেই। আজ আমি কৃষ্ণ ও অর্জুনকে বধ না করে রণাঙ্গন ছাড়বো না। আমি জানি অর্জুনের মতো যোদ্ধা আর কেউ নয়। অর্জুন শরযুদ্ধে আর কৃষ্ণ চক্রযুদ্ধে অতিশয় নিপুণ। এখন আমি ব্যতিরেকে আর কে ওদের নিকট যুদ্ধার্থে অগ্রসর হবে?'

ইতিমধ্যে অর্জুন আরো অনেক কৌরব নিষ্পিষ্ট করলেন, কর্ণও অনেক পাণ্ডবসৈন্যকে নিহত

করলেন। ভীমের সঙ্গে দুঃশাসনের যুদ্ধ হচ্ছিলো। এই ভীমকে পরাজিত করেও কর্ণ প্রাণে মারেননি। যদি মারতেন, যুদ্ধ প্রায় সেখানেই সমাপ্ত হতো। সেই ভীম দুঃশাসনকে পরাজিত করে মেরে ফেললেন। তারপর তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করে ঈষদুষ্ণ রক্তপান করতে করতে বললেন, 'মাতৃদুগ্ধ ঘৃত মধু সুরা, সুবাসিত উৎকৃষ্ট জল, দধি দুগ্ধ এবং উত্তম ঘোল, প্রভৃতি সকল অমৃততুল্য সুস্বাদু যতো পানীয় আছে, আজ এই রক্ত আমার সর্বাপেক্ষা সুস্বাদু বোধ হচ্ছে।' ঐ সময়ে যে সকল বীর সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা ভয়ে আর্তনাদ করে বলতে লাগলেন, 'এ ব্যক্তি মনুষ্য নয়, নিশ্চয়ই রাক্ষস।'

কর্ণ হয়তো তখন মনে মনে ভেবেছিলেন কুন্তীর মতো গর্ভধারিণীর গর্ভে জন্মধারণ করে তাঁর সমস্তটা জীবন শুধু অপমানে অসম্মানে ওলোটপালোটই হয়েছে। তবে কুন্তী নামের সেই মহিলার কাছে তিনি কেন এই কথা দিলেন, 'আপনার পঞ্চপুত্র পঞ্চপুত্রই থাকবে?' আর আমরা ভাবি, কথা দিলেও রক্ষা করবার কী প্রয়োজন ছিলো? যাঁদের সঙ্গে তিনি আজ যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ, তাঁরা তো একের পর এক মহারথীকে কেবলমাত্র শঠতার দ্বারাই হত্যা করেছেন। যুধিষ্ঠিরকে বা কেন তিনি মারলেন না? তাঁর মিথ্যাবাক্যই তো তাঁদের পিতৃতুল্য গুরু দ্রোণাচার্যকে পুত্রশোকে বিচেতন করলো, আর সেই বিচেতন অবস্থাতেই যুদ্ধের কোনো নিয়ম পালন না করে ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁর মুণ্ডচ্ছেদন করলো। আর তা নিয়ে বীভৎস উল্লাস! যুদ্ধ শেষ হবার পরে অসতর্ক জয়দ্রথের মস্তক ছিন্ন করা হলো। এদের সঙ্গে তিনি কোন মঞ্চে দাঁড়িয়ে ন্যায়যুদ্ধ করবেন? এখানে যুদ্ধ কোথায়? এটা তো যুদ্ধ নয়। কেন ধর্মযুদ্ধের নামে এতোগুলো প্রাণ বিনষ্ট হলো? তার চেয়ে যে ভাবে জরাসন্ধকে নিহত করেছে, সে ভাবে ছদ্মবেশে লুকিয়ে যে কোনোদিন যে কোনো মহারথীকে পিঠে ছুরি মেরেই তো পালিয়ে আসতে পারতো পাণ্ডবরা। যে মহিলাকে তিনি শ্রদ্ধা করেন না, তাঁর সঙ্গে বাক্য-বিনিময় না করলেই ভালো হতো। সত্যি বলতে, কুন্তীর কাছে দেওয়া এই অর্থহীন প্রতিশ্রুতির কাছে কর্ণ দায়বদ্ধ না থাকলে পাণ্ডবদের পক্ষে কখনোই যুদ্ধ জয় সম্ভব হতো না। যুধিষ্ঠিরের মৃত্যু অবধারিত ছিলো।

যুধিষ্ঠির কি রাজা হবার যোগ্য? যিনি রাজা তিনিই যদি যুদ্ধস্থল থেকে পালিয়ে যান, তবে তাঁকে কী ভাবে রাজা বলা যায়? অন্যদিকে দুর্যোধন সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত, অর্থাৎ যতোক্ষণ যুদ্ধ চলে, একবারের জন্য বিশ্রাম নেন না, শিবিরে গিয়ে আশ্রয় নেন না। নিজ দলের একটি মানুষকেও তিনি ছেড়ে চলে আসেন না। কে জানে আজ কর্ণের ভাগ্যে কী আছে। তাঁকেও যে আর সব মহারথীদের মতো অর্জুনকে দিয়ে কৃষ্ণ সুযোগমতো খুন করাবেন না, তা-ও কি কেউ বলতে পারে?

পরের দিন রজনী প্রভাত হলে কর্ণ দুর্যোধনকে বললেন, 'আমি ধনঞ্জয় অপেক্ষা যে যে অংশে হীন সেগুলো তোমাকে জানানো কর্তব্য। অর্জুনের সারথি বাসুদেব, কাঞ্চনভূষণ রথ অগ্নিদত্ত ও

অচ্ছেদ্য। অশ্বসকল অতি বেগশালী এবং ধ্বজা বিস্ময়কর। হে কুরুরাজ! তুমি দুঃসহবীর্য মদ্ররাজকে আমার সারথি হতে দাও। তোমার নিশ্চয়ই জয়লাভ হবে। শকট সমুদয় আমার যুদ্ধাস্ত্র বহন করুক এবং উৎকৃষ্ট অশ্ব-সংযোজিত রথসকল আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করুক। এ রকম হলে আমি অর্জুন অপেক্ষা সমধিক হবো। শল্য অপেক্ষা ভুজবীর্যসম্পন্ন আর কেউ নেই। আর আমার তুল্য অস্ত্রযুদ্ধে পারঙ্গমও আর কেউ নেই। অতএব শল্য সারথি হলে আমার রথ অর্জুনের রথ থেকেও উৎকৃষ্ট হবে। আমি নিঃসন্দেহে অর্জুনকে পরাজিত করবো।'

দুর্যোধন বললেন, 'হে রাধেয়! তুমি যা বললে আমি সেই অনুষ্ঠানই করবো।'

তা অবশ্য করলেন। যদিও শল্য প্রথমে খুবই আপত্তি করেছিলেন। ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন, 'আমার মতো একজন অদ্বিতীয় যোদ্ধা শেষে সূতপুত্রের সারথি হবে?' দুর্যোধন বিনীত বচনে তাঁকে তুষ্ট করে বললেন, 'হে মহারাজা! আমি কর্ণকে সূতকুলোৎপন্ন বলে মনে করি না। আমার মতে উনি ক্ষত্রিয়কুলপ্রসূত দেবকুমার এবং মহদগোত্র সম্পন্ন। উনি কখনোই সূতকুলসম্ভব নন। তদ্ব্যতীত, আপনি তো জানেন, ভগবান ব্রহ্মাও রুদ্রদেবের সারথ্য স্বীকার করেছিলেন। ফলত, রথী অপেক্ষা সমধিক বলশালী ব্যক্তিকে সারথি করা কর্তব্য। হে মাতুল! আপনি অস্ত্রবিদগণের অগ্রগণ্য, সর্বশাস্ত্রবিশারদ কর্ণকে অবজ্ঞা করবেন না। যাঁর ভীষণ জ্যা নির্ঘোষ শব্দ পাণ্ডব সৈন্যের শ্রবণে প্রবিষ্ট হলে তারা দশদিকে পলায়ন করে, মায়াবী রাক্ষস ঘটোৎকচ আপনারই চোখের সম্মুখে রাত্রিকালে যাঁর মায়াপ্রভাবে নিহত হয়েছে, মহাবীর অর্জুন নিতান্ত ভীত হয়ে এতোদিন যাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রবৃত্ত হননি, যে মহারথ মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদরকে কার্মুক দ্বারা সঞ্চালিত করে বার বার মূঢ় ঔদরিক বলে ভর্ৎসনা করেছেন, যিনি নকুল সহদেব যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করে কী জানি কী গূঢ় কারণবশত বিনাশ করেননি, পাণ্ডবরা কী করে সেই মহাবীর কর্ণকে পরাজয় করতে সমর্থ হবেন? আর আপনি সারথি হিশাবে বাসুদেব অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট।'

এইসব নানা বাক্যে দুর্যোধন শল্যকে সন্তুষ্ট করে কর্ণের সারথি করলেন। যুদ্ধে নেমেই কর্ণ পাণ্ডবদের ভীতি উৎপাদন করেছিলেন। এখন আরো দুর্জয় হলেন। পাণ্ডবপক্ষের বহু শত্রুবিনাশ করে, শরাসন হাতে যেন নৃত্য করেই পরিভ্রমণ করতে লাগলেন সমরাঙ্গনে।

শল্যরাজ বললেন, 'কর্ণ, তুমি প্রকৃতই একজন অস্ত্রবিশারদ, যুদ্ধদুর্মদ ও অন্তকের ন্যায় অসহ্য। তুমি অনায়াসে সমরাঙ্গনে শত্রুগণকে পরাজিত করতে সমর্থ হবে।' শল্যরাজ-মুখনিঃসৃত এই সব বাক্য শ্রবণ করে কর্ণ আনন্দিত হলেন, তাঁর মনে হলো, ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্যের পরে তিনিই পাণ্ডবগণকে পরাজিত করবেন। তাঁর মনে আশা সঞ্জাত হলো।

দুর্যোধন বললেন, 'আমি তোমার বাক্যানুসারে পিতামহ ও দ্রোণাচার্যকে অতিশয় বীর বলে গণ্য

করতাম। কিন্তু ভীষ্ম পিতামহ বলেই দশদিন পাণ্ডুতনয়দের রক্ষা করেছিলেন। দ্রোণাচার্যও শিষ্য বলেই তাঁদের মারতে পারেননি। হে কর্ণ! এখন তোমার মতো পরাক্রান্ত যোদ্ধা আর কারোকেও নয়নগোচর হয় না। আমি তোমার বলবীর্য ও আমার সৌহার্দ্যের বিষয় সম্যক অবগত আছি। তুমিই পূর্বাপর আমার হিতসাধন করেছো। কৌরবদের সেনাপতি হয়ে, সৈন্যগণকে রক্ষা করে, দৈত্যনিসূদন মহেন্দ্রের মতো শত্রুনিপাতনে নিযুক্ত হও।'

কর্ণ বললেন। 'হে কুরুরাজ! আমি বরাবর তোমাকে বলেছি, পাণ্ডবগণকে তাদের পুত্রগণ ও জনার্দনের সঙ্গে পরাজিত করবো। তুমি প্রশান্তচিত্ত হয়ে পাণ্ডবগণকে পরাজিত বলে স্থির করো।'

কর্ণের কথা শুনে দুর্যোধন পরম পরিতুষ্ট হলেন। তাঁর মনে পুনরায় জয়ের আশা সঞ্জাত হলো। অনন্তর যুদ্ধ যেভাবে তুমুলরূপ ধারণ করলো, কে যে কাকে মারছে তা-ও প্রায় অননুধাবনীয় হয়ে উঠলো।

অবশেষে কর্ণ ও অর্জুন মুখোমুখি হলেন। কর্ণকে অতি উদ্বেল সমুদ্রের মতো গর্জন করে আসতে দেখে কৃষ্ণ বললেন, 'বন্ধু, আজ যাঁর সঙ্গে তোমার যুদ্ধ করতে হবে, ঐ দ্যাখো তিনি আসছেন। তুমি স্থির হও। সূতনন্দন দুর্যোধনের হিতচিকীর্ষায় শরজাল বর্ষণ করে সমাগত হচ্ছেন। মদ্ররাজ তাঁর রথে অবস্থিত থেকে অশ্বসঞ্চালন করছেন। কর্ণের ধনুকের শব্দে যুদ্ধের অন্য সব শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। সূতপুত্রকে নিরীক্ষণ করে দ্যাখো পাঞ্চালরা কীভাবে পলায়ন করছে। তুমি ভিন্ন আর কেউ কর্ণের বাণ সহ্য করতে সমর্থ নয়।'

অর্জুন বললেন, 'হে সখে! তুমি রথ সঞ্চালন করো। অর্জুন কর্ণকে সমরে নিপাতিত না করে কখনো প্রতিনিবৃত্ত হবে না।' একথা শুনে অর্জুনের মতো এমন একজন যোদ্ধার প্রতি পুনরায় পাঠকদের বিশ্বাস ফিরে আসে। মনে হয় এবার অর্জুন যা করবেন নিজে করবেন। দুজন প্রায় সমযোদ্ধা মুখোমুখি হচ্ছেন, এবারই বোঝা যাবে কার কতো পারদর্শিতা। এতোক্ষণ তো পাণ্ডবপক্ষীয় এই মহাযোদ্ধাটিকে আমরা যুদ্ধ করতেই দেখলাম না। যে সব মহারথীরা লোকান্তরিত হলেন, তাঁদের সঙ্গে তো পাণ্ডবগণ যুদ্ধ করেননি, গুপ্ত ঘাতক হয়ে অতি অসৎভাবে হত্যা করেছেন। অন্তত একবারের জন্যও তাঁরা এমন কিছু করুন, যা থেকে মনে করা যায় তাঁরাও যুদ্ধ করতে জানেন। অন্তত অর্জুন।

অর্জুন স্পর্ধা করেই বললেন, 'হয় আমি আজ আমার বাণে কর্ণকে নিহত করবো নচেৎ, কর্ণের বাণে ক্ষতবিক্ষত হয়ে নিহত হবো। তুমি তাড়াতাড়ি অশ্বচালনা করো।'

সেই সময়টাতে কর্ণ পুত্রের মৃত্যুসংবাদে সন্তপ্ত হয়ে অশ্রুবারি পরিত্যাগ করছিলেন। ইত্যবসরে অর্জুনকে সমাগত দেখে শোক ভুলে রোষাবিষ্ট হয়ে তাঁকে যুদ্ধ করতে আহ্বান করলেন।

অন্যান্য যোদ্ধারা এই দুই বীরকে মুখোমুখি দেখে সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন। কৌরবগণ কর্ণকে উত্তেজিত করার জন্য বাদিত্রধ্বনি ও শঙ্খ বাজাতে লাগলেন, পাণ্ডবরা তূর্য ও শঙ্খের শব্দে অর্জুনকে উত্তেজিত করতে লাগলেন।

যুদ্ধের বর্ণনা দিয়ে লাভ নেই। কে কতো অস্ত্রের দ্বারা কতোবার কাকে বিদ্ধ করেছিলেন সেই বর্ণনায় গিয়েও কাজ নেই। তবে সেই বর্ণনায় এটা স্পষ্ট ছিলো যে কর্ণ হেরে যাবেন না, জয়ী হয়ে কৌরবদের রক্ষা করতে পারবেন। কিন্তু নিয়তিক্রমে তাঁর রথের একটা চাকা সহসা মাটিতে বসে গলো। কর্ণ বললেন, 'হে পার্থ! তুমি মুহূর্তকাল যুদ্ধে নিবৃত্ত হও, আমি চাকাটা উদ্ধার করছি। দৈবক্রমে আমার দক্ষিণচক্র পৃথিবীতে প্রোথিত হয়েছে। এ সময়ে তুমি কাপুরুষোচিত দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ করো। তুমি রণপণ্ডিত বলে বিখ্যাত, এখন অসাধু কার্য করা তোমার উচিত নয়। আমি এখন ভূতলগত, অসহায়, আর তুমি রথের উপর বসে আছো। যে পর্যন্ত চাকাটা উদ্ধার করতে না পারি, তাবৎ আমাকে বিনাশ করা তোমার উচিত নয়। তুমি মুহূর্তকাল আমাকে ক্ষমা করো। অন্তত সেই পৌরুষটুকু তোমার আছে বলেই বিশ্বাস করি।'

এখানে ছোট্টো একটি উপকথা বলা হয়েছে। সেটির উল্লেখ এখানে অবান্তর হবে না। যদিও উপকথা, তথাপি তার দ্বারাই একটা মানুষের চরিত্রগত ছবি ফুটে ওঠে। ইতিমধ্যেই আমরা দেখেছি কর্ণ ভীমকে ও যুধিষ্ঠিরকে পরাস্ত করেও প্রাণে মারলেন না শুধু তাঁর কামুক গর্ভধারিণী, যিনি নিজের সুনাম রক্ষার্থে কুমারীকালের এই সন্তানকে প্রসব করে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, যিনি কখনো কোনো দুঃখ বেদনা অপমান অসম্মান থেকে কোনোদিনই এই সন্তানকে চিনতে পেরেও উদ্ধার করতে এগিয়ে আসেননি, অথচ লজ্জাহীনভাবে এসেছিলেন স্বীয় স্বার্থ রক্ষা করতে, সেই মহিলার নিকট দেওয়া কথা লঙ্ঘন করতে পারেননি বলেই যুদ্ধে যোগ দিয়েই মহাবীর কর্ণ, মহানুভব কর্ণ, কোনো প্রলোভনের অনধীন কর্ণ, অগ্নিগোলকের মতো সমরাঙ্গনে ছিটকে পড়েই শত্রুমর্দনে সকলকে ত্রাসিত করেছিলেন। সেই ত্রাসে ত্রাসিত হয়ে অতি শঠ কৃষ্ণ অর্জুনকে সমরাঙ্গন থেকে সরিয়ে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর যেদিন মুখোমুখি হলেন দুজনে, অতি প্রিয়দর্শন দুটি ভ্রাতা, যখন যুদ্ধ প্রায় তুঙ্গে, এই সময়ে বেগে পাতালতল থেকে উত্তীর্ণ হয়ে, অন্তরীক্ষ থেকে কর্ণ এবং অর্জুনের সংগ্রাম সন্দর্শন করে, বৈরনির্যাতনের এটাই সর্বাপেক্ষা যোগ্য সময় বিবেচনায় সর্প অশ্বসেন কর্ণের এক তূণীরশায়ী শরমধ্যে প্রবেশ করলো।

কর্ণ কিছুই জানতে পারলেন না। কিন্তু কৃষ্ণ জানতে পেরে তাঁর রথ চার আঙুল নিচে নামিয়ে দিলেন। এটি কর্ণের অব্যর্থ শর। সাপ না ঢুকলে অনায়াসে অর্জুনের মস্তকচ্ছেদ করতে পারতেন। কিন্তু তা হলো না। শল্য বলেছিলেন, 'তুমি এই শরটি নিক্ষেপ করো না। এটা কিন্তু অর্জুনের গ্রীবাচ্ছেদনে সমর্থ হবে না। অতএব, যদ্দ্বারা অর্জুনের মস্তকচ্ছেদন করা যায়, সে

রকম একটি শর সন্ধান করো।'

ক্ষত্রিয়জনোচিত অহংকারে কর্ণ শল্যের কথা শুনলেন না। বললেন, 'হে মহাবাহো! এক শর হাতে নিলে আর সেটা আমি পরিত্যাগ করি না। আমার সদৃশ ব্যক্তিরা কখনো কূটযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় না।'

সুতরাং অব্যর্থ শরটি বিফল হলো। সেই ভীষণ শর হুতাশন ও সূর্যের মতো অন্তরীক্ষে উত্তীর্ণ হয়ে অগ্নিকাণ্ড ঘটালো। কিন্তু অর্জুনের মস্তক ছেদনে সমর্থ হলো না। তাঁর সুবর্ণখচিত মণিহীরক সমলঙ্কৃত নাগাস্ত্র কেবল অর্জুনের দিব্য কিরীট মহাবেগে চূর্ণ করলো। পূর্বে পুরন্দর অসুরসংহার কালে ঐ কিরীট দিয়েছিলেন। বিপক্ষেরা সেটা দেখলে ভয় পেতো। সাপ সূতপুত্রের শরে প্রবিষ্ট হয়ে সেই কিরীট চূর্ণ করলো।

কর্ণ এতোক্ষণে সেই অশ্বসেন নামের সাপকে দেখলেন। সে বললো, 'অর্জুন আমার মাতাকে বধ করেছিলেন, আমি আজ তার প্রতিশোধ নেবো। তখন তুমি না জেনে প্রয়োগ করেছিলে, সেজন্যই অর্জুনের মস্তক ছেদন করতে পারোনি। এখন তো আমাকে দেখলে, এবার প্রয়োগ করো, তাহলে আমি অবশ্যই তাকে সংহার করবো। যদি স্বয়ং দেবরাজও ওর রক্ষক হন, তথাপি আমি ওকে যমরাজার রাজধানীতে প্রেরণ করবো।'

তখন কর্ণ বললেন, 'হে নাগ! কর্ণ কখনো অন্যের বলবীর্য অবলম্বন করে সমরবিজয়ী হয় না, এবং একশত অর্জুনকে বধ করতে হলেও এক শর দুবার সন্ধান করে না।'

এরই নাম ক্ষত্রিয়। এরই নাম যোদ্ধা। এই সমরে অর্জুন ভীম বা যুধিষ্ঠির যে সব অসৎ উপায়ে বড় বড় যোদ্ধাদের বধ করেছেন সবই কৃষ্ণের দুর্বদ্ধিতে। নচেৎ অর্জুনের মতো একজন যোদ্ধা একবারের জন্যও কোনো ছলনা ব্যতীত যুদ্ধ জয় করতে পারলেন না কেন? যেমন বিদুরের দুষ্ট প্ররোচনায় যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলিপ্সা যুধিষ্ঠিরকে নষ্ট করেছে, এখন কৃষ্ণের দুষ্ট প্ররোচনায় অর্জুন তার ব্যক্তিত্বের বিনাশ ঘটিয়েছেন। এবং সেই দুষ্টবুদ্ধির পরবশ হয়েই কর্ণ যে সময়ে নিচু হয়ে তাঁর রথের চাকাটা মাটি থেকে তুলতে চেষ্টা করছিলেন, এবং অস্ত্রহীন অবস্থায় ছিলেন, সেই সময়ে কৃষ্ণ যেই বললেন, 'হে পার্থ! কর্ণ রথে আরোহণ না করতেই তুমি অতি দ্রুত ওর মস্তক ছেদন করো,' অর্জুন অতীব কাপুরুষের মতো তা-ই করলেন। এখানেও অর্জুন সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন না।

অর্জুনের মতো যোদ্ধা বিরল। দুঃখ হয়, কৃষ্ণ তাঁকে যুদ্ধ করতেই দিলেন না। কেবল কতোগুলো মানুষকে অন্যায় যুদ্ধে অথবা পিছন থেকে লুকিয়ে খুন করালেন। কর্ণ যখন নিরস্ত্র, যখন রথ থেকে নেমে নিচে বসে যাওয়া চাকাটা তুলছিলেন, অনুরোধ করছিলেন, 'একটুখানি সময় আমাকে ক্ষমা করো, যেন যুদ্ধের নিয়ম ভেঙে আমাকে নিরস্ত্র অবস্থায় রথে না ওঠা পর্যন্ত

নিহত করো না,' কৃষ্ণ বুঝলেন, এই একমাত্র সুযোগ, বললেন, 'এক্ষুনি মারো ওকে, কোনোরকমেই যেন রথে উঠে না বসে।' আর মহাবীর অর্জুন তাই করলেন। এতোদিন ধরে এতো সব বড় বড় যোদ্ধার কাছে কতো যত্নে কতো ধরনের যুদ্ধ শিখলেন, মহাদেবের বরপ্রাপ্ত হলেন, সবই বিফলে গেলো। কর্ণ এবং অর্জুনের যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করার মতোই একটা দৃশ্য ছিলো। অনেকেই এই দুটি বড় মাপের যোদ্ধার যুদ্ধ দেখতে কৌতূহলী ছিলেন। কৃষ্ণ সেখানেও হস্তক্ষেপ করলেন। কিন্তু অর্জুন? মহাভারতের তিনটি সর্বোৎকৃষ্ট যোদ্ধা এবং সর্বাঙ্গসুন্দর পুরষ ভীষ্ম, কর্ণ, অর্জুন। সেই অর্জুন নিজেকে কেন এমনভাবে মুছে দিলেন? তাঁর তো কোনো রাজ্যলোভ ছিলো না। জ্যেষ্ঠের আদেশে কাজ করার নিয়ম, তাই করে যাচ্ছেন। প্রকৃতিগতভাবে তিনি শুভবুদ্ধিধারী ছিলেন বলেই মনে হয়। কিন্তু কৃষ্ণের নীতিহীনতার কাছে মন্ত্রমুগ্ধের মতো নতিস্বীকার করে গেলেন তিনি।

১১

দুর্যোধনের হৃদয় আর প্রবোধ মানলো না। কর্ণ তো কেবলমাত্র বন্ধু ছিলেন না। ছিলেন আশ্রয়, অবলম্বন, পিতামাতাভ্রাতাবন্ধুস্বজন, সব। সব কিছুর উৎস। সব কিছুর সমন্বয়। তাঁর দুই গাল জলে ভেসে গেলো। তারপরেই সমস্ত দুঃখ এবং ক্রোধ উত্তাল হয়ে উঠলো। সারথিকে বললেন, 'হে সূত! আমি আজ অর্জুনকে সংহার করবো। অর্জুন আজ আমাকে কিছুতেই অতিক্রম করতে সমর্থ হবে না।'

দুর্যোধন সমাগত শত্রুগণের প্রতি বেগে ধাবমান হলেন। যে কর্ণ পৃথিবীর ঈশ্বর হতেও রাজি হননি দুর্যোধনের হিতাভিলাষে, সেই কর্ণকে ওরা এভাবে নিধন করলো? এর নাম যুদ্ধ! যুদ্ধ করলে অর্জুন কি কর্ণের কাছে জয়ী হতে পারতেন? পিছন থেকে ছুরি মেরে খুন করতে তাদের বিবেকে কি এক ফোঁটাও দ্বিধা উদ্রিত হলো না? লজ্জা কুণ্ঠা ধর্ম কিছুই কি নেই তাদের মধ্যে? তারা কি মানুষ? মনুষ্য পদবাচ্য কোনো জীবই কি এটা করতে পারে? দুর্যোধন 'হা কর্ণ!' বলে রোদন করতে করতে উন্মাদের মতো প্রচণ্ড বেগে যাকে কাছে পেলেন তাকেই শরনিকরে বিদ্ধ করতে করতে আহ্বান করতে লাগলেন যোদ্ধাদের।

মদ্রাধিপতি শল্য শেষে কোনোরকমে নিবৃত্ত করলেন তাঁকে। বললেন, 'হে রাজন! তোমার অদ্ভুত পৌরুষ দেখে আমি অভিভূত। তুমি একা একা এই অসংখ্য শত্রু সৈন্যকে কী ভাবে নিপাতিত করছো। কিন্তু আমাদের সৈন্যরা এখন চতুর্দিকে পলায়মান। কর্ণের মৃত্যুতে তারা সকলেই ভীত, ব্যথিত। ক্ষত্রিয়ধর্ম যারা পালন করে না, যুদ্ধক্ষেত্রে যারা অন্যায় হত্যা করে, তাদের সঙ্গে একজন ক্ষত্রিয় যোদ্ধা ধর্মযুদ্ধ কী ভাবে পালন করবে? তুমি শান্ত হও। সূতপুত্রের নিধনে সকল সৈন্যই বিষাদগ্রস্ত, বিপন্ন এবং পরিশ্রান্ত। আজকের মতো সকলকে ছুটি দাও। তুমিও শিবিরে চলো।' শোকাকুলচিত্ত মদ্রাধিপতি এই সব বলে চুপ করলেন। তখন দুর্যোধন বাষ্পাকুল নয়নে যুদ্ধ শেষ করে সৈন্যদের ছুটি দিয়ে শিবিরে গেলেন।

সকলেই কর্ণের কথা বলতে বলতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত জেগে কাটিয়ে দিয়ে অবশেষে নিদ্রিত হলেন। কিন্তু দুর্যোধনের নিদ্রা এলো না। গভীর যামিনী গত হয়ে কখন আকাশ রক্তবর্ণ হলো, তবু তাঁর দুই গাল জলেই ভরে রইলো। হৃদয় কেবলই হাহাকার করতে লাগলো একমাত্র বন্ধু কর্ণের জন্য।

কৃপাচার্য বলেছিলেন, 'হে রাজন! তুমি এবার ওদের সঙ্গে সন্ধি করো। আমার মনে হয় কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য লঙ্ঘন করতে সমর্থ হবেন না। হে মহারাজ! আমি দীনতা বা প্রাণরক্ষার নিমিত্ত

একথা বলছি না। একথা তোমার হিতকর বলেই বলছি।'

দুর্যোধন বললেন, 'হে আচার্য! আপনি পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে প্রাণপণে যুদ্ধ করেছেন, এখনো বন্ধুজনোচিত বাক্যই বলছেন, কিন্তু আমি কীরূপে এ কাজ করতে পারি! আমি আপনার বাক্য শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নিয়েও বলছি, পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করা উচিত নয়, যুদ্ধ করাই শ্রেয়। দেখুন, আমি বহুবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মণগণকে প্রভূত দক্ষিণাদান, বেদাধ্যয়ন ও বিপক্ষগণের শীর্ষস্থানীয়রূপে অবস্থান করেছি। আমি যা চেয়েছি সবই পেয়েছি। আমার ভৃত্যগণ অতি সুখে প্রতিপালিত হয়েছে। আমি দুঃখীদের দুঃখ দূর করেছি, স্বরাজ্য প্রতিপালন, ভোগ্যদ্রব্য উপভোগ এবং ধর্মঅর্থকামের সেবা করেছি। ক্ষত্রিয়ধর্ম ও পিতৃঋণ থেকেও আমার মুক্তিলাভ হয়েছে। এই পৃথিবীতে কিছুতেই সুখ নেই। কেবল কীর্তিলাভ করাই লোকের কর্তব্য। আমি ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়গণ গৃহমধ্যে রোগভোগ করে মরতে চায় না। যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুই আমার কাম্য। তদ্ব্যতীত, আমার জন্য নিহত পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, মহাবীর জয়দ্রথ এবং কর্ণ, যে আমার কথা ভেবে পৃথিবীর ঐশ্বর্য ও কৃষ্ণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাঁদের কথা আমি কী করে ভুলতে পারি? কতো অবনীপাল আমার জন্য যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের নিকটও আমি বহুরূপে ঋণী। সেই কৃতজ্ঞতার শোধ কি আমি নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে তাঁদের দিতে পারি? যুদ্ধক্ষেত্রে আমার প্রাণ দিয়েই আমি ক্ষত্রিয়ধর্ম পালন করে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হতে চাই।'

কুরুরাজ দুর্যোধনের একথা শুনে অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ সাধু সাধু বলে প্রশংসা করতে লাগলেন। তখন পরাজিত হয়েছেন বলে কারো মনের মধ্যে কোনো কষ্ট রইলো না। বিক্রম প্রকাশে উদ্বুদ্ধ হয়ে সবাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। যুদ্ধার্থে নরপতিগণও স্ব স্ব মত প্রকাশ করলেন। আচার্যপুত্র অশ্বত্থামা প্রাণত্যাগে উদ্যত নগরপালদের ইঙ্গিত অবগত হয়ে রাজা দুর্যোধনের নবোদিত সূর্যতুল্য সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শুনুন, পণ্ডিতেরা স্বামীভক্তি, দেশকালাদি সম্পত্তি, রণপটুতা ও নীতি এই কয়েকটিকে যুদ্ধের সাধন বলে নির্দেশ করেছেন। আমাদের যে সব দেবতুল্য লোকপ্রবীর মহারথগণ নীতিজ্ঞ, রণদক্ষ, প্রভুপরায়ণ, ও নিয়ত যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁরা কেউ যুদ্ধের দ্বারা পরাজিত হননি। পাণ্ডবরা তাঁদের পিছন থেকে লুকিয়ে হত্যা করেছেন। তা বলে জয়ের আশা ত্যাগ করা উচিত নয়। সুনীতি প্রয়োগ করলে দৈবকেও অনুকূল করা যায়। এখন আপনি বিশ্রাম করুন। আপনি শান্ত হোন।'

অতি প্রত্যূষে পুনরায় আবার সকলে একত্রিত হলেন। দুর্যোধনকে সম্ভাষণ করে বললেন, 'হে মহারাজ! আপনি একজন সেনাপতি নিযুক্ত করুন, আমরা সেই সেনাপতির নিকট রক্ষিত হয়ে সম্মুখ সমরে সমুদয় শত্রুকে পরাজিত করবো।' তখন রাজা দুর্যোধন নিজের রথে বসেই অশ্বত্থামার কাছে গেলেন।

অশ্বত্থামার রূপের কোনো তুলনা ছিলো না। তিনি বায়ুর মতো বলবেগশালী এবং তেজে

দিবাকর ও বুদ্ধিতে শুক্রাচার্য। দুর্যোধন সেই দ্রোণপুত্রের নিকট গিয়ে বললেন, 'হে গুরুপুত্র! আজ আপনিই অগতির গতি। আপনিই বলুন কাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করবো।' অশ্বত্থামা দুর্যোধনের বাক্য শুনে তখনি বললেন, 'হে মহারাজ! মদ্রাধিপতি শল্য বলবীর্যে শ্রী ও যশ প্রভৃতি অশেষ গুণসম্পন্ন এবং সৎকুলসম্ভূত। ঐ মহাবীরকেই আপনি আমাদের সেনাপতির পদে অভিষিক্ত করুন। ঐ মহাত্মা নিজের ভাগিনেয়দের ছেড়ে আমাদের নিকট উপস্থিত হয়েছেন, তাঁর মিত্রতার তুলনা নেই।'

তখন দুর্যোধন রথ থেকে নেমে ভীষ্মসদৃশ মহাবীর মদ্রাধিপতিকে বললেন, 'হে মিত্রবৎসল, আপনি আমাদের বন্ধু। অসময়েই মানুষ জানতে পারেন কে বন্ধু আর কে নয়। অতএব আপনি আমাদের সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হোন।'

শল্য বললেন, 'হে কুরুরাজ, তুমি আমাকে যা বলবে, আমি তাই করবো। আমার রাজ্য মনপ্রাণ যা কিছু আছে সবই তোমার।'

দুর্যোধন বললেন, 'হে মাতুল! আমি আপনাকে সেনাপতিপদে বরণ করছি। আপনি আমাদের রক্ষায় প্রবৃত্ত হোন।'

শল্যরাজ বললেন, 'হে মহারাজ! আমি যা বলছি তুমি তা অবিহিত হয়ে শোনো। ধনঞ্জয় আর বাসুদেবকে শ্রেষ্ঠ মনে করো না। সমস্ত পৃথিবী উদ্যত হলেও, আমি ক্রোধাবিষ্ট হলে অনায়াসেই তাদের জয় করতে পারি। এখন আমি তোমার সেনাপতি হয়ে বিপক্ষগণের নিতান্ত দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা এবং সমস্ত পাণ্ডবদের পরাজিত করবো সন্দেহ নেই।'

বস্তুতই মদ্রাধিপতি শল্য একজন প্রকৃত যোদ্ধা। অবশ্য কুরুকুলে কুরুরাজ দুর্যোধন তো আছেনই, তাঁর জন্য যাঁরা প্রাণ দিয়েছিলেন তাঁরা কেউ এমন যোদ্ধা ছিলেন না, যাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করে পাণ্ডবপক্ষের কেউ জয়ী হতে পারেন। পারেনওনি। কৃষ্ণের মিথ্যাচারেই অর্জুনের মতো যোদ্ধা একবারের জন্যও রণক্ষেত্রে তাঁর পারদর্শিতার প্রমাণ রাখার অবকাশ পেলেন না। ভীষ্ম দ্রোণ জয়দ্রথ ভূরিশ্রবা কর্ণ কারো সঙ্গে তাঁকে যুদ্ধ করতে দেননি বাসুদেব। প্রত্যেককে যুদ্ধ ছাড়াই পিছন থেকে অতর্কিতে অথবা অসৎপন্থায় নিহত করিয়েছেন। যুদ্ধের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর এই অন্যায় কর্ম অব্যাহত ছিলো।

কর্ণ অর্থিগণের কল্পবৃক্ষ স্বরূপ ছিলেন। যাচকদের কখনোই প্রত্যাখ্যান করতেন না। সাধু ব্যক্তিরা তাঁকে সৎপুরুষ বলে অতীব শ্রদ্ধা করতেন। কর্ণ কৃষ্ণেরও বন্ধু ছিলেন। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও কৃষ্ণ তাঁকে ধর্মচ্যুত করতে পারেননি। দুর্যোধনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে ফাটল ধরাতে পারেনি। এই সততা কুরুপক্ষের সকলের মধ্যেই বর্তমান ছিলো। দুর্যোধন নিজে একজন বিশেষ মানুষই ছিলেন। তাঁর পক্ষের রাজাগণ এবং সৈন্যগণ তাঁর প্রতি সেজন্যই এতো একনিষ্ঠ

ছিলো। তিনি যুধিষ্ঠিরের মতো যুদ্ধের মধ্যে আরামশয্যায় শুয়ে বসে দিন কাটাননি। অবিশ্রান্ত যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থেকেছেন। পিতৃবৎসল, মিত্রবৎসল, প্রজাবৎসল—এসব গুণ তাঁর মধ্যে প্রভূত পরিমাণে ছিলো। একটি মিথ্যাবাক্যও তিনি উচ্চারণ করেছেন এমন ঘোষণা বিদুরও করতে পারেননি।

যেদিন কর্ণ অন্যায়যুদ্ধে অসহায় অবস্থায় নিহত হলেন, সেই সময়ে যুধিষ্ঠির তাঁর সুবর্ণময় উত্তম শয্যায় শুয়ে আলস্য যাপন করছিলেন। সহর্ষে অর্জুন ও কৃষ্ণ প্রবেশ করলেন। তাঁদের মুখ দেখেই যুধিষ্ঠির বুঝতে পারলেন কর্ণকে তাঁরা নিহত করতে পেরেছেন। তাঁর মুখে উত্তেজনার ভাব ফুটে উঠলো। তিনি গাত্রোত্থান করলেন। শুভসংবাদ অবগত হলেন। কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে তিনি কর্ণের মৃতদেহ দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে সমরক্ষেত্রে এসে দাঁড়ালেন। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, 'এর কথা ভেবে আমি ভয়ে তেরো বৎসর ভালো করে ঘুমোতে পারিনি। আজ সুখে নিদ্রা যাবো।'

কর্ণের মৃত্যুর পরে পাণ্ডবরা নিজেদের নিরাপদ বোধ করছিলেন। তার পরেও শল্য যে যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে একেবারে উথালপাথাল করে তুলবেন সেটা ভাবেননি। পাঞ্চাল আর সোমক আর পাণ্ডবেরা সেই সৈন্যনিপাতনে কৃতান্ততুল্য মদ্ররাজের পরাক্রম দেখে অধীর হয়ে উঠলো। সাত্যকি ভীম নকুল সহদেব অসাধারণ বলসম্পন্ন মদ্রাধিপতিকে সহসা যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধে উদ্যত দেখে অতি তৎপরতার সঙ্গে তাঁকে পরিবেষ্টন করে মহাবেগসম্পন্ন শর দ্বারা মদ্রাধিপতি শল্যকে নিপীড়িত করতে লাগলেন। শল্য সে সব অগ্রাহ্য করে যুধিষ্ঠিরের দিকেই ধাবিত হলেন। সমরাঙ্গন মৃতের স্তূপে পরিণত হলো। এই যুদ্ধে কৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন না, তাই যুদ্ধটা যুদ্ধের মতোই হলো। যুধিষ্ঠির-পরিবেষ্টিত যোদ্ধাদের বাণে বিদ্ধ হতে হতে এক সময়ে যুধিষ্ঠিরের একটি বাণে তিনি বিনষ্ট হলেন। শল্য যুধিষ্ঠিরের দিকেই তাঁর একান্ত মনোযোগ নিবিষ্ট করেছিলেন। দেখতে পেয়েই অর্জুন ভীম নকুল সহদেব সাত্যকি ধৃষ্ট্যদ্যুম্ন শিখণ্ডী দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র পাঞ্চাল ও সোমকদল তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছিলেন। তাদের সকলের সাহায্যে শেষ পর্যন্ত যুধিষ্ঠির তাঁর জীবনের প্রথম কীর্তি স্থাপন করতে পারলেন। মহাভারত নামের গ্রন্থটিতে যুধিষ্ঠিরের এই একমাত্র বীরত্বের কাহিনী মোটা দাগে অঙ্কিত হলো। মহারাজা শল্য যে তাঁর দ্বারাই বিনষ্ট হয়েছেন, তা যেন অন্য কোনো পরিবেষ্টনকারীর নামে না যায় সেটাই বারে বারে উল্লিখিত হলো।

সেই সময়ে দুর্যোধনের দুর্জয় যুদ্ধ সন্দর্শন করে শত্রুপক্ষ ভীত হলেন। অরাতিগণ কোনোক্রমেই দুর্যোধনকে নিবারিত করতে সমর্থ হলো না। অসংখ্য সৈন্য নিহত হলো। শল্যকে মারতে পেরে তখন অন্যদিকে আনন্দ কোলাহল শুরু হলো, কুরুসৈন্যরা পলায়মান হলো। মহারাজা দুর্যোধন সমস্ত সৈন্যগণকে পালাতে দেখে একাই যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করে

সরোষ নয়নে প্রত্যেকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র এবং পাণ্ডব পাঞ্চাল কৈকেয় সোমক ও সঞ্জয়গণকে নিবারিত করে মন্ত্রপূত যজ্ঞীয় পাবকের মতো বিচরণ করতে লাগলেন। শত্রুরা ঐ ভয়ঙ্কর রোষপূর্ণ মহাবীরের সম্মুখীন হতে সমর্থ হলো না।

একসময়ে দুর্যোধন রণাঙ্গন ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর ক্ষত বিক্ষত দেহ থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিলো, দুই চোখ অশ্রুপ্লাবনে সিক্ত, শোকাকুল হৃদয়ে তিনি হ্রদের দিকে গিয়ে, সেখানে প্রবেশ করে, মায়ার দ্বারা তার জল স্তম্ভিত করে রাখলেন। জল স্তম্ভিত করা বিষয়ে শল্যপর্বে লেখা আছে 'জলের উচ্ছ্বাস কম্পনাদি সর্বপ্রকার গতিরোধ।' আধুনিক যুরোপীয় সাবমেরিনে লোকসকল জলমধ্যে যেমন অনায়াসে শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া নির্বাহ করে থাকে এই জলস্তম্ভন তারই সূক্ষ্ম আদর্শ।

দুর্যোধন হ্রদের মধ্যে প্রবেশ করলে, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্মা এই তিন মহাবীর ক্ষতবিক্ষত দেহে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে সেই প্রদেশের কাছাকাছি এসে সঞ্জয়কে দেখতে পেলেন। বললেন, 'নিতান্ত ভাগ্যগুণেই তোমাকে দেখতে পেলাম। আমাদের রাজা দুর্যোধন জীবিত আছে কিনা তা কি তোমরা জানো?'

সঞ্জয় বললেন, 'আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিলো। আমাকে এ কথাই বললেন যে তিনি হ্রদের জলে বিশ্রাম করতে যাচ্ছেন।' সঞ্জয় তাঁদের হ্রদটিও দেখিয়ে দিলেন। অশ্বত্থামা বেদনার্দ্র সুরে বললেন, 'হায়! রাজা নিশ্চয়ই জানতেন না আমরা জীবিত আছি। কী কষ্ট! আমরা তাঁর সঙ্গে মিলে অনায়াসেই যুদ্ধে অরাতি দমন করতে পারতাম।'

দ্রুতপদে তাঁরা রাজা দুর্যোধনের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হলেন। অতি মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'মহারাজ, তুমি হ্রদ থেকে উঠে এসো, আমাদের সমভিব্যহারে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। হয় পাণ্ডুনন্দনকে নিহত করে পৃথিবী ভোগ করো, নচেৎ নিজে নিহত হয়ে সুরলোক প্রাপ্ত হও। হে দুর্যোধন! তুমি একাই পাণ্ডবসৈন্য সমুদয়কে প্রায় বিনাশ করেছো, যারা অবশিষ্ট আছে তারাও তোমার শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। আমরা তোমাকে রক্ষা করবো, পাণ্ডবরা তোমার বেগ সহ্য করতে পারবে বলে মনে হয় না।'

অশ্বত্থামা বললেন, 'হে বীর! কাল প্রভাতে আমি যদি শত্রুদের বিনাশ করতে না পারি তবে যেন আমার দানধ্যান যাগযজ্ঞ সব বিফল হয়। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি যদি ওরা যুদ্ধ কাকে বলে সেই জ্ঞান মনে রেখে অবতীর্ণ হয়, তবে আমি বলছি পাঞ্চালগণকে শেষ না করে কবচ পরিত্যাগ করবো না। তুমি কিছু ভেবো না, শান্ত মনে বিশ্রাম করো। শঠতা না করলে অবশ্যই আমাদের জয় হবে।'

কিন্তু এখানেও বিধি বাম হলো।

কয়েকটি ব্যাধ, যারা ভীমের জন্যে মাংস সরবরাহ করতো, যাদের কাছে যুধিষ্ঠির কিছু পূর্বেই দুর্যোধনকে তারা দেখেছে কিনা জিজ্ঞেস করেছিলেন, তারা আড়াল থেকে এই সব আলোচনা শুনে ফেললো। ব্যাপারটা বুঝে পরস্পরের দিকে অর্থপূর্ণভাবে তাকালো।

সকলেই সকলের মনের বাসনা জ্ঞাত হয়ে অস্ফুটে বললো, 'ইতিপূর্বে যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের কথা আমাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন। মনে হয় রাজা দুর্যোধন নিশ্চয়ই এই হ্রদের কোথাও অবস্থান করছেন। চলো, আমরা গিয়ে এই বৃত্তান্ত প্রকাশ করি। তা হলে তাদের নিকট আমরা বিপুল অর্থ প্রাপ্ত হবো। তবে আর আমাদের প্রতিদিন এই রকম শুষ্ক মাংস বহন করতে হবে না।' এই বলে তাড়াতাড়ি তারা পাণ্ডবদের শিবিরের দিকে রওনা হলো।

তাদের কাছে দুর্যোধনের খবর শুনে পাণ্ডবভ্রাতারা ও কৃষ্ণ তখুনি রথারোহণে সাগরতুল্য দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে এসে উপস্থিত হলেন। শঙ্খনাদ, রথের শব্দ এবং সৈন্যদের কোলাহলে নিঝুম হ্রদের তীর কম্পিত হয়ে উঠলো।

কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্মা দুর্যোধনকে অস্ফুটে বললেন, 'রাজা! পাণ্ডবরা আসছে, আমাদের এবার যাবার অনুমতি দাও, আমরা চলে যাই।'

দুর্যোধন বললেন, 'তারা এই স্থানে এলো কেন? কেউ তাদের কোনো খোঁজ দিয়েছে?

তাঁরা বললেন, 'তা বোধহয় নয়। যাই হোক, আমরা সরে যাই, নচেৎ বুঝে যাবে।' এ বলে অতিশয় বিষণ্ণমনে চলে গেলেন তাঁরা। কিন্তু শিবিরে গেলেন না। কিছু দূরেই একটি বৃক্ষের তলায় গিয়ে বসলেন।

যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সবাই এসেছে। কৃষ্ণ অর্জুন ভীম নকুল সহদেব ধৃষ্ট্যদ্যুম্ন শিখণ্ডী সাত্যকি দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র সবাই দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে সমুপস্থিত হলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, 'কৃষ্ণ! ঐ দ্যাখো, দুর্যোধন মায়াবলে জলস্তম্ভ করে হ্রদের মধ্যে অবস্থান করছেন। আমি ঐ মায়াবীকে কদাচ জীবিতাবস্থায় পরিত্যাগ করবো না। যদি স্বয়ং ইন্দ্র ওর সহযোগিতা করেন, তবুও লোকে একে সংগ্রামে নিহত দর্শন করবে।'

যুধিষ্ঠির জলমধ্যস্থিত মহাবল পরাক্রান্ত দুর্যোধনকে বললেন, 'তুমি সমস্ত ক্ষত্রিয় বিনষ্ট করে এখন নিজের জীবন রক্ষার্থে জলাশয়ে প্রবেশ করেছো। এই মুহূর্তে জল থেকে উঠে এসো। আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো। তোমার দর্পের তো কোনো সীমা ছিলো না, এখন সেই দর্প তোমার কোথায় গেলো? সভামধ্যে সকলেই তোমাকে বীরপুরুষ বলে থাকে, এখন তারাই বা কোথায় গেলো? নির্লজ্জ! এখন তুমি প্রাণভয়ে জলের মধ্যে লুকিয়ে আছো। ভেবো না এই সলিলমধ্যে লুকিয়ে থাকলে তুমি নিস্তার পাবে। তুমি কুরুবংশে জন্মগ্রহণ করেছো, যুদ্ধে ভীত হয়ে সলিলমধ্যে পলায়ন, এটা তোমার নিতান্ত অন্যায়। সমরে পরাঙ্মুখ হয়ে অবস্থান করা

ক্ষত্রিয়ধর্ম নয় (যুধিষ্ঠির সর্বদাই যা করেছেন)। হে দুরাত্মা! তুমি লোকসম্মুখে আপনাকে যে বীর বলে পরিচয় প্রদান করো তা নিতান্ত নিরর্থক। বীরপুরুষেরা প্রাণান্তেও শত্রুসন্দর্শনে পলায়ন করেন না। তুমি এখন জল থেকে উত্থিত হয়ে যুদ্ধ করো। তুমি মোহবশত কর্ণ এবং শকুনিকে আশ্রয়পূর্বক আপনাকে অমর জ্ঞান করে যে পাপাচরণ করেছো এখন তার ফল ভোগ করো। তোমার ন্যায় বীরপুরুষেরা কখনোই সমর পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করে না। তুমি আর কীসের আশায় জলাশয়ে শায়িত আছো? ওঠো, গাত্রোত্থান করো, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আমাদের পরাজিত করে এই পৃথিবী ভোগ করো।'

দুর্যোধন জলের মধ্যে থেকেই বললেন, 'প্রাণীমাত্রেরই অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু আমি প্রাণভয়ে পলায়ন করিনি। সংগ্রামে আমার রথ ও তূণীর দুই-ই বিনষ্ট হয়েছে। সৈন্য সামন্ত পৃষ্ঠপোষক নিহত হয়েছে। আমি অতিরিক্ত পরিশ্রান্ত হয়েই সলিলমধ্যে প্রবেশ করে বিশ্রামের চেষ্টা করছি। প্রাণভয়ে বা বিষাদযুক্ত হয়ে এখানে লুকোতে আসিনি। অনুচরগণের সঙ্গে তুমিও কিয়ৎকাল বিশ্রাম নাও। আমি অবিলম্বেই সলিল থেকে সমুত্থিত হয়ে সংগ্রাম করবো।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'আমাদের কোনো বিশ্রামের প্রয়োজন নেই। তুমি অবিলম্বে হ্রদের মধ্য থেকে উত্থিত হয়ে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আমাদের হাতে নিহত হয়ে বীরলোক প্রাপ্ত হও।'

দুর্যোধন বললেন, 'আমি যাদের জন্য রাজ্যলাভের অভিলাষ করেছিলাম, আমার সেই সমস্ত ভ্রাতা পরলোক গমন করেছে। পৃথিবীও রত্নহীন, ক্ষত্রিয় বলেও আর কিছু নেই। এই অবনীকে ভোগ করতে আর আমার কোনো স্পৃহা নেই। হে যুধিষ্ঠির! আমি এখনো পাণ্ডবগণকে ভগ্নোৎসাহ করে তোমাকে পরাজিত করতে পারি। কিন্তু পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কর্ণকে হারিয়ে আমার মনে আর যুদ্ধের কোনো স্পৃহা নেই। তুমিই এখন সকলকে নিয়ে এই পৃথিবী ভোগ করো। আমার জীবনধারণেরও কোনো ইচ্ছা নেই। আমি মৃগচর্ম পরিধান করে বনে গমন করবো। ভোগে আর বিন্দুমাত্র স্পৃহা অনুভব করছি না।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'আর পরিতাপ করে কী হবে? তোমার আর্তপ্রলাপে আমার মনে অণুমাত্র দয়ার সঞ্চার হচ্ছে না। তুমি পৃথিবী দান করলে আমি নেবো কেন? আর এখন তুমি পৃথিবী দান করবার কে? এখন তোমার এই রাজ্য বলপূর্বক গ্রহণ বা দান করবার ক্ষমতাই কি আছে? দুর্যোধন, তুমি রাজ্য দানে অভিলাষী হলেও, আমি তোমার প্রাণ রক্ষা করবো না। এখন তোমার জীবন আমার অধীন। আমি ইচ্ছে করলে তোমার প্রাণ রক্ষা করতে পারি, কিন্তু তুমি আত্মপরিত্রাণে কখনোই সমর্থ হবে না। এখন তুমি জল থেকে উত্থিত হয়ে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও।'

এবার জল আলোড়িত করে উঠে এলেন দুর্যোধন। যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হয়ে বললেন, 'তোমাদের

রথ ও বাহন, বন্ধুবান্ধব সবই আছে। কিন্তু আমি একা এবং বিরথ, অত্যন্ত পরিশ্রান্ত। এখন তোমরা অনেকে রথারূঢ় হয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমাকে চারদিক থেকে বেষ্টন করে আছো, সুতরাং আমি কী করে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো? অতএব, তোমরা একে একে আমার সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। তোমাদের কারোকে দেখেই আমার মনে কোনো ভয়ের সঞ্চার হচ্ছে না। আমি একা তোমাদের সকলকে নিবারণ করবো। হে যুধিষ্ঠির! আমি তোমাকে তোমার ভ্রাতৃগণের সঙ্গে নিপাতিত করে বাহ্লীক ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ, শল্য, ভূরিশ্রবা শকুনি এবং আমার ভ্রাতাগণ পুত্রগণ ও বন্ধুবান্ধব সকলের ঋণ পরিশোধ করবো।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'তোমার অভীষ্ট আয়ুধ গ্রহণ করে আমাদের মধ্যে যে কোনো বীরের সঙ্গে সমাগত হয়ে যুদ্ধ করো। আমরা সকলে রণস্থলে অবস্থানপূর্বক যুদ্ধব্যাপার নিরীক্ষণ করবো। এখন আমি বলছি, তুমি আমাদের মধ্যে একজনকে বিনাশ করতে পারলে, সমুদয় রাজ্য তোমার হবে।'

দুর্যোধন বললেন, 'যদি আমাকে একজনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়, তা হলে আমি তোমাদের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা বলশালী তার সঙ্গেই যুদ্ধ করবো। তুমি আমাকে যে কোনো আয়ুধ গ্রহণ করতে বলেছো, আমি এই গদা মনোনীত করলাম। এখন তোমাদের মধ্যে যিনি আমার বলবীর্য সহ্য করতে সমর্থ, তিনিই আসুন।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'তুমি যে কোনো ব্যক্তির সঙ্গে গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।'

দুর্যোধন তাঁর সুদৃঢ় ভীষণ লৌহময় গদা কাঁধে নিয়ে প্রচণ্ড মার্তণ্ডের ন্যায় সমাগত হলেন। বললেন, 'হে পাণ্ডবগণ! আমি অচিরাৎ তোমাদের যমালয়ে প্রেরণ করবো।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'এখন তুমি কবচ পরিধান, কেশকলাপ বন্ধন ও যে কোনো দ্রব্যের অভাব থাকে, সে সব গ্রহণ করো। আমি এখনো বলছি, তুমি পাণ্ডবদিগের যার সঙ্গে অভিরুচি হয়, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। হয় তাকে বিনাশ করে রাজ্যপদ লাভ করো, না হয় তার হস্তে নিহত হয়ে স্বর্গসুখ অনুভব করো।'

দুর্যোধন সুবর্ণময় বর্ম ও কনকমণ্ডিত বিচিত্র শিরস্ত্রাণ গ্রহণ করে গদা সমুদ্যত করে পাণ্ডবদের বললেন, 'হে বীরগণ, এখন তোমরা কে আসবে এসো। আমি ক্রমে ক্রমে সকলকেই বিনাশ করে বৈরানল নির্বাণ করবো।'

যখন দুর্যোধন এভাবে তর্জনগর্জন করছিলেন, কৃষ্ণ পরম ক্রোধান্বিত হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'আপনি কোন সাহসে বলছেন যে আমাদের মধ্যে যাকে খুশি তাকে বেছে নাও? আপনি দুর্যোধনের সঙ্গে পারবেন লড়তে? সে যদি এখন আপনাকে চায়? আপনি কেন, অর্জুন নকুল সহদেব কেউ কি পারবে? তখন? তখন আপনার কী হবে ভেবে দেখেছেন? গদাযুদ্ধে দুর্যোধন

অতিশয় পারদর্শী, ভীমসেনও পারবেন কিনা সন্দেহ। পূর্বে দ্যূতক্রীড়া করে যে সর্বনাশ করেছিলেন, আবার তাই হবে। দুর্যোধন গদাযুদ্ধে কৃতী, যদি তিনি ভীমসেনকে চান, তবু রক্ষা। ভীমসেন পরাক্রমশালী, ভাগ্যবলে ভীমসেনকে নির্বাচন করলে তবু কিছু আশা করা যায়। নচেৎ, সেই পাশাক্রীড়াই পুনরায় শুরু হবে বলে ধরে নিন। যেখানে ভীমসেন পারবে কিনা সন্দেহ, আপনি এই প্রতিজ্ঞা করে বসলেন, আমাদের মধ্যে যার সঙ্গে খুশি তার সঙ্গেই এই গদাযুদ্ধে অবতীর্ণ হও।'

কৃষ্ণের কথা শুনে ভীম বললেন, 'যদুনন্দন! তুমি বিষণ্ণ হয়ো না। আমি নিশ্চয়ই দুর্যোধনকে বিনাশ করবো।'

একথা শুনে কৃষ্ণ আশ্বস্ত হয়ে বললেন, 'হে বীর! যুধিষ্ঠির তোমার বাহুবলেই আজ অরাতিবিহীন হয়ে রাজলক্ষ্মী লাভ করতে চলেছেন। এখন তুমি দুর্যোধনকেও নিপাতিত করে, বিষ্ণু যেমন দেবরাজকে স্বর্গরাজ্য প্রদান করেছিলেন তুমিও ধর্মরাজকে সেইরূপ পৃথিবী প্রদান করো।'

ভীমসেনকে তারপর সবাই খুব প্রশংসা করতে লাগলেন।

ভীমসেন বললেন, 'ঐ পুরুষাধম কখনোই আমাকে পরাজিত করতে পারবে না। আজ গদার আঘাতে ঐ পাপাত্মার প্রাণসংহার পূর্বক দুর্যোধনের প্রতি হৃদয়নিহিত ক্রোধানল নিক্ষেপ করবো।' এই বলে ভীম গদা উত্তোলন করে দাঁড়ালেন।

দুর্যোধনও উত্তম মাতঙ্গ যেমন মত্ত মাতঙ্গ প্রতি ধাবমান হয়, সেভাবে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হলেন। নির্ভয়শরীরে অসংকোচিতচিত্তে সমরক্ষেত্র অবলোকন করতে লাগলেন। তারপর বললেন, 'বাগাড়ম্বর করবার প্রয়োজন নেই। অবিলম্বে আমার সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। আমি সিক্ত দেহ তাতেই শুষ্ক করে নেবো। শোনো, ন্যায়ানুসারে গদাযুদ্ধে সুররাজ পুরন্দরও আমাকে পরাজিত করতে সক্ষম নন। কিন্তু বাসুদেবের পরামর্শে অন্যায়যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ো না। সেটা ব্রাত্যের ধর্ম হতে পারে, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নয়।'

বীরদ্বয়ের ভীষণ গদাযুদ্ধ আরম্ভ হলে পাণ্ডবগণ সকলেই উপবেশন করলেন। ঐ সময়ে বলরামও শিষ্যদ্বয়ের সংগ্রাম বৃত্তান্ত অবগত হয়ে সেখানে এলেন। তাঁকে দেখে সকলেই খুব প্রীত হলেন। তিনি তাঁর শিষ্যদ্বয়ের যুদ্ধ দেখতে বসলেন। বলরাম কৃষ্ণকে বলেছিলেন, 'তুমি কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করো,' কিন্তু কৃষ্ণ সেকথা না শুনে পাণ্ডবপক্ষে গেলেন। তখন বলরাম রোষপরবশ হয়ে, কারো পক্ষ অবলম্বন না করে, তীর্থযাত্রায় নির্গত হয়েছিলেন। প্রত্যাবর্তনের পথে শিষ্যদ্বয়ের গদাযুদ্ধের সংবাদ পেয়ে এখানে এসেছেন। সকলেই তাঁকে যার যার সম্পর্ক অনুযায়ী আলিঙ্গন অভিবাদন নমস্কার পূর্বক স্বাগত ও কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। রাজা দুর্যোধন আর ভীমও এসে অতিপ্রীতমনে নমস্কার পূর্বক স্বাগত ও কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা

করলেন। অনন্তর, তিনিও অতি প্রীতমনে গদাযুদ্ধ নিরীক্ষণ করবার জন্য উপবেশিত হলেন।

ভীম চিৎকার করে দুর্যোধনকে নানা বাক্যশল্যে বিদ্ধ করছিলেন। দুর্যোধন বললেন, 'কেন বৃথা বাগজাল বিস্তার করছো, অদ্য অবশ্যই তোমার যুদ্ধ করার ঔৎসুক্য অপনোদন করবো। দুর্যোধন সামান্য ব্যক্তির মতো তৎসদৃশ লোকের কথায় ভীত হবার পাত্র নয়। আমার বহুদিনের বাসনা তোমার সঙ্গে গদাযুদ্ধ করবো। আজ দৈব অনুকূল। এখন বৃথা বাক্য ব্যয় না করে অচিরাৎ কার্যে সেটা পরিণত করো।' বলেই মহাবেগে ভীমের দিকে ধাবমান হলেন।

অনন্তর পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণপূর্বক জিগীষাপরবশ হয়ে তুমুল যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়ে রণস্থলে ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত করলেন। গদা নিষ্পেষণে হুতাশনস্ফুলিঙ্গ বিদ্যুতের মতো চমকাতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে দুজনে শ্রমকাতর হয়ে মুহূর্তকাল বিশ্রাম করে, পুনরায় যুদ্ধ শুরু করলেন। সেই বীরদ্বয়ের যুদ্ধ দেখে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হলেন এবং কার যে জয়লাভ হবে স্থির করতে পারলেন না। দুই যোদ্ধাই দুজনকে বিবিধ কৌশল দেখিয়ে সময় সুযোগমতো আঘাত করতে লাগলেন।

একসময়ে অর্জুন দুই যোদ্ধার এই ঘোরতর যুদ্ধ দেখতে দেখতে কৌতূহলবশত কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এঁরা সমানেই যুদ্ধ করছেন। তোমার মতে এঁদের মধ্যে কে অপেক্ষাকৃত যুদ্ধকুশল এবং কারই বা কোন গুণ অধিক বলো তো।'

কৃষ্ণ বললেন, 'এঁরা দুজনেই সমান উপদেশ পেয়েছেন। তবে ভীমসেন বলবান বটে কিন্তু দুর্যোধন ভীমসেন অপেক্ষা অনেক বেশি শিক্ষিত এবং যুদ্ধনৈপুণ্যে অনেক বেশি পটুত্ব অর্জন করেছেন। ভীমসেন ন্যায়যুদ্ধে কখনোই দুর্যোধনকে পরাজিত করতে পারবেন না। অন্যায় যুদ্ধ করেই দুর্যোধনকে বিনষ্ট করতে হবে। যদি ভীমসেন দুর্যোধনের সঙ্গে ন্যায়যুদ্ধ করেন, তবে রাজা যুধিষ্ঠির মহাসংকটে নিপতিত হবেন। পুনরায় ধর্মরাজের অপরাধেই আমাদের মহৎ ভয় উপস্থিত হয়েছে। ভীষ্ম প্রভৃতি মহাবীরগণ নিহত হওয়াতেই আমরা জয়লাভ করেছিলাম। এখন আবার ধর্মরাজের জন্যই ঘোর বিপদ উপস্থিত। তবু ভালো দুর্যোধন তাঁকেই যুদ্ধে আহ্বান করেননি।' বীরগণ অবশ্য তা কখনো করেনও না। তদ্ব্যতীত, দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের মতো শুয়ে বসে অন্যদের বিক্রমে যুদ্ধ করেননি। তাঁর রাজত্বও তিনি তাঁর একার যোগ্যতাতেই অতি সুশৃঙ্খলভাবে চালিয়েছেন।

কৃষ্ণের কথা শুনে অর্জুন ভয় পেলেন। বললেন, 'তা হলে কী হবে?'

কৃষ্ণ বললেন, 'অন্যায় যুদ্ধেই জয়ী হতে হবে।'

অর্থাৎ এই পর্যন্ত যা করে এসেছেন, যে পরামর্শ দিয়ে এসেছেন, পুনরায় সে কার্যই করলেন তিনি। যুদ্ধের চরম মুহূর্তে অর্জুন ইঙ্গিতে তখন ভীমকে নিজের ঊরুদেশটা দেখিয়ে দিলেন।

অর্থাৎ মনে করিয়ে দিলেন তিনি দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

বৃকোদর তদ্দর্শনে তাঁর অভিপ্রায় অবগত হয়ে গদাহস্তে বিবিধ গতি প্রদর্শন পূর্বক পরিভ্রমণ করে দুর্যোধনকে চমৎকৃত করতে লাগলেন। আরো কিছুক্ষণ অবিরাম যুদ্ধ করে সংগ্রামে উভয়েই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে, দুজনেই পুনরায় ক্রুদ্ধচিত্তে গদা গ্রহণ পূর্বক সংগ্রাম শুরু করলেন। পরস্পর পরস্পরের আঘাতে শোণিতাক্ত কলেবর হয়ে আরো দুর্জয় হয়ে উঠলেন। একসময়ে ভীম মিথ্যা দৌর্বল্য দেখিয়ে, দুর্যোধনকে ঈষৎ গর্বিত করে, তাঁর প্রতি ধাবমান হতে প্রলোভিত করলেন। দুর্যোধন যেইমাত্র তাঁর সম্মুখীন হলেন তৎক্ষণাৎ ভীম অতি বেগে গদা নিক্ষেপ করলেন। দুর্যোধনও তৎক্ষণাৎ সেই স্থল হতে বহুদূরে অপসৃত হলেন। সুতরাং ভীমের এই সুযোগটা ব্যর্থ হলো। দুর্যোধন তখন স্বীয় গাদঘাতে ভীমকে এতো জোরে আঘাত করলেন যে বৃকোদর প্রায় মূর্ছাগত হলেন। এ অবস্থায় ভীমকে অবস্থিত দেখে দুর্যোধন আর তাঁকে প্রহার করতে পারলেন না। মানবিক ধর্ম প্রযুক্ত হয়ে ভীমকে সুস্থ হবার অবকাশ দিলেন। তিনি কুরুকুলের রাজা দুর্যোধন! বীর্যপ্রয়োগেও তাঁরা নিয়ম কানুনের অধীন। কৃষ্ণের মিথ্যাচারে সমাচ্ছন্ন পাণ্ডবদের প্রবঞ্চনা তিনি জানেন না। যেই মুহূর্তে দুর্যোধন একটু স্থির হলেন, তৎক্ষণাৎ ভীম দুর্যোধনের প্রতি মহাবেগে ধাবিত হলেন। ভীমকে রোষান্বিত চিত্তে আগমন করতে দেখে, তাঁর গদাঘাতের প্রহার ব্যর্থ করবার জন্য দুর্যোধন ঊর্ধ্বে উঠবার চেষ্টা করলেন, এবং লম্ফ দিয়ে যেই মাটি ছাড়লেন, তৎক্ষণাৎ বৃকোদর তাঁদের চিরাচরিত মিথ্যা কৌশলে, যুদ্ধের নিয়ম ভেঙে, তাঁর বজ্রতুল্য ভীষণ গদা দুর্যোধনের দিকে মহাবেগে নিক্ষেপ করে তাঁর জানুদ্বয় ভঙ্গ করে ভূতলে নিপাতিত করলেন। তারপর তাঁর মস্তক পা দিয়ে মাড়িয়ে দিলেন।

এই অন্যায় যুদ্ধ দেখে বলরাম অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হলেন। হাত তুলে ভীষণ আর্তনাদ পরিত্যাগ ও ভীমসেনকে বারংবার ধিক্কার দিয়ে বললেন, ‘ধর্মযুদ্ধে নাভির অধঃস্থলে গদাঘাত করা নিতান্ত অন্যায় হয়েছে। গদাযুদ্ধে ভীম যেরকম কুকার্যের অনুষ্ঠান করলো, এরকম আর কখনো দৃষ্টিগোচর হয়নি। নাভির নিচে কদাচ গদাঘাত করবে না, এটা শাস্ত্রের নিয়ম ও স্থির সিদ্ধান্ত। কিন্তু মহামূর্খ বৃকোদর শাস্ত্রসম্মত ব্যবহার অতিক্রম করে স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়েছে।’ বলতে বলতে ক্রোধে একান্ত অধীর হয়ে লাঙল উদ্যত করে মহাবেগে ভীমের দিকে ধাবমান হলেন। অনেক কষ্টে বাসুদেব তাঁকে শান্ত করলেন।

হলধর বললেন, ‘সাধু লোকেরাই ধর্মের অনুষ্ঠান করে থাকেন, কিন্তু সেই ধর্ম, অর্থ ও কাম দ্বারা নষ্ট হয়। অতএব, যে ব্যক্তি ধর্ম অর্থ ও কামের প্রতি সমদৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে কালযাপন করতে পারে, সে-ই যথার্থ সুখভোগে সমর্থ হয়। হে হৃষিকেশ! এখন তুমি যতো চেষ্টাই করো না কেন, ভীম যে অধর্মাচরণ করেছে, তা আমার মন থেকে কখনোই দূর করতে সমর্থ হবে

না। ভীম ধর্মপরায়ণ দুর্যোধনকে অধর্মানুসারে বিনষ্ট করেছে, এই কূট যোদ্ধাকে আমি কখনোই ক্ষমা করতে পারবো না। আর ন্যায়যুদ্ধ করার জন্য দুর্যোধন শাশ্বত স্বর্গ লাভ করবেন।' এই বলে নিতান্ত অসন্তুষ্ট চিত্তে তিনি চলে গেলেন সেখান থেকে।

অতঃপর কৃষ্ণ যখন দুর্যোধনের বিরুদ্ধে অনেক কটুবাক্য প্রয়োগ করছিলেন, তখন দুর্যোধন কৃষ্ণের মুখে ঐ ধরনের বাক্য শুনে হাতে ভর দিয়ে উঠে বসলেন। বললেন, 'হে কংসদাসতনয়! অর্জুন তোমারই নির্দেশে ভীমকে আমার উরুভঙ্গ করতে ইঙ্গিত করেছিলো। হে নির্লজ্জ! প্রতিদিন তোমার কূট উপায় দ্বারাই যুদ্ধে প্রবৃত্ত সহস্র সহস্র নৃপতি নিহত হয়েছেন। তুমি শিখণ্ডীকে অগ্রসর করে পিতামহকে নিপাতিত করেছো। যুধিষ্ঠির তোমারই প্ররোচনায় মিথ্যা বলে আচার্যকে অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়েছিলো আর সেই অবসরে দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন তোমারই সমক্ষে আচার্যকে নিহত করেছে। কর্ণ অর্জুনের বিনাশার্থ বহুদিন অতি যত্ন করে যে শক্তি রেখেছিলেন, তুমি তোমার কৌটিল্যের দ্বারা সেই শক্তি ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করিয়ে ব্যর্থ করেছো। সাত্যকি তোমারই প্ররোচনায় ছিন্নহস্ত প্রায়োপবিষ্ট ভূরিশ্রবাকে নিহত করেছে। মহাবীর কর্ণ অর্জুন বধে সমুদ্যত হলে তুমি নিজে তার সর্পবাণ ব্যর্থ করেছো। কিন্তু তোমার প্রতিজ্ঞা ছিলো তুমি যুদ্ধ করবে না। তদ্ব্যতীত, একজনের সঙ্গে দুজনের যুদ্ধও অধর্ম। তারপর কী-ভাবে তাকে মারলে! রথ থেকে নেমে সে মাটিতে বসে যাওয়া রথের চাকাটা যখন তুলছিলো এবং বলেছিলো আমি এখুনি চাকাটা তুলে রথে উঠছি, তোমরা যেন আমাকে সেই নিরস্ত্র অবস্থায় মেরে অধর্ম করো না, সেটা ধর্মের বা যুদ্ধের রীতি নয়, তুমি তক্ষুনি অর্জুনকে বললে, ওকে রথে ওঠার সময় দিয়ো না, এই অবস্থাতেই নিহত করো। তোমার কি লজ্জাও হয় না। অনার্য। আজ তুমি আমাকে কীভাবে ভীমকে দিয়ে অন্যায় আঘাতে নিপাতিত করালে।'

এসব শুনতে শুনতে পাণ্ডবগণ ও অন্যরা নিজেদের অধর্মাচরণ স্মরণ করে বিষণ্ণ হলেন। কৃষ্ণ বললেন, 'হে পাণ্ডবগণ! রাজা দুর্যোধন অসাধারণ সমরবিশারদ এবং ক্ষিপ্রহস্ত। তোমরা কোনোভাবেই তাঁকে ধর্মযুদ্ধে পরাজিত করতে সমর্থ হতে না। তোমাদের হিতের জন্যই আমি এই উপায় উদ্ভাবন করেছি। আর যে সব মহারথীকে কৌশলে নিহত করা হয়েছে, ধর্মযুদ্ধ করলে কি তোমরা কখনো তাঁদের জয় করতে পারতে? সেজন্যই ছলের প্রয়োজনে ছিলো।'

অতঃপর আস্তে আস্তে সকলেই সেখান থেকে চলে গেলেন।

তাঁরা চলে গেলে সঞ্জয় এলেন। তাঁকে দেখে দুর্যোধন বললেন, 'হে সঞ্জয়! আমার পিতামাতা যুদ্ধধর্ম বিলক্ষণ অবগত আছেন। তুমি তাঁদের বলো, আমি বিবিধ যাগযজ্ঞানুষ্ঠান, ভৃত্য প্রতিপালন, ধর্মানুসারে সসাগরাবসুন্ধরা শাসন, যাচকদিগকে অর্থদান, অধ্যয়ন ও মিত্রগণের প্রিয়কার্য সাধন করেছি। সৌভাগ্যবশত, স্বধর্মনিরত ক্ষত্রিয়গণ যেরূপ মৃত্যু অভিলাষ করে, আমি সেভাবেই মৃত্যুর সাক্ষাৎ পেয়েছি। হে সঞ্জয়! তুমি আমার বাক্যানুসারে অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা

ও কৃপাচার্যকে বলবে, ''পাণ্ডবেরা নিয়ম ব্যতিক্রম ও সতত অধর্মানুষ্ঠান করে থাকে, অতএব তোমরা যেন তাদের বিশ্বাস করো না'।''

এদিকে হতাবশিষ্ট অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা দূতদিগের কাছে জানতে পারলেন দুর্যোধনের উরুভঙ্গ হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে অতি দ্রুতগামী রথে চলে এলেন সেখানে। দুর্যোধনের অবস্থা দেখে বাষ্পাকুল নয়নে বাকশূন্য হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তাঁদের অতি প্রিয় রাজা আজ রুধিরাক্ত কলেবরে সহসা নিপতিত সূর্যমণ্ডলের ন্যায়, পরিশুষ্ক সাগরের ন্যায়, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় ভূতলে শায়িত। শোকে দুঃখে তাঁরা অভিভূত হলেন।

দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ক্রন্দনরত কণ্ঠে বললেন, 'হায়, তুমি পৃথিবী শাসন করতে, আজ তুমি এই নির্জন অরণ্যে এভাবে অবস্থান করছো? কৃতান্তের গতি দুর্জ্ঞেয়। হে মহারাজ! তোমার এ অবস্থা আমি সহ্য করতে পারছি না। তুমি সর্বলোকের মাননীয়, সকলের প্রিয় ইন্দ্র তুল্য বিভবশালী হয়েও এই অবস্থা প্রাপ্ত হলে।'

অশ্বত্থামার কথা শুনে দুর্যোধন দুই হাতে চোখের জল মুছে বললেন, 'হে বীরগণ! তোমরা তো জানো, কালক্রমে সর্বভূতেরই বিনাশ হয়। ভাগ্যক্রমে, আমি কোনো বিপদেই সমরে পরাঙ্মুখ হইনি; পাপাত্মারা ছলপূর্বক আমার এই অবস্থা ঘটিয়েছে। এই ভালো হলো, এখন আমি সমরক্ষেত্রে জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে নিহত হলাম। আর আজ যে তোমাদের এই ভীষণ জনক্ষয়ের মধ্য থেকে বিমুক্ত দেখছি সেটা আমার পরম সৌভাগ্য!' দুর্যোধনের চোখের জলে কথা থেমে গেল।

ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে অশ্বত্থামা দুর্যোধনের হাতে হাত রেখে বললেন, 'হে মহারাজ! নীচাশয় পাণ্ডবগণ একমাত্র তোমাকেই তো এই নৃশংস ব্যবহারের দ্বারা আহত করেনি, আমার পিতাকেও তো নিধন করেছে। তা-ও আমি ভুলিনি, ভুলবো না। কিন্তু আজ তোমার জন্য যে কষ্ট আমার হৃদয়কে মথিত করছে, এমন কখনো হয়নি। আমি শপথ করছি, যে কোনো প্রকারেই হোক, বাসুদেব সমক্ষেই সমস্ত পাঞ্চালগণকে শমনসদনে প্রেরণ করবো। তুমি অনুজ্ঞা দাও।'

দুর্যোধন প্রীত হয়ে তখনি কৃপাচার্যকে বললেন, 'আচার্য! সমস্ত নিয়মকানুন মান্য করে আমার সমক্ষেই এখন অশ্বত্থামাকে সেনাপতিপদে বরণ করুন।'

মহাবীর কৃপাচার্য সেই আদেশ শিরোধার্য করে অশ্বত্থামাকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করলেন, অতঃপর দুর্যোধনকে আলিঙ্গনপূর্বক সবাই বিদায় নিলেন।

সেখান থেকে চলে গিয়ে তাঁরা শিবিরের অনতিদূরে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করতে লাগলেন, রজনী গভীর হয়ে এলে কৃতবর্মা এবং কৃপাচার্য নিদ্রিত হলেন, কিন্তু

অশ্বত্থামা বসে রইলেন। তিনি কোনোক্রমেই নিদ্রাচ্ছন্ন হতে পারলেন না। দুর্যোধনকে মেরে পাণ্ডবরা দুর্যোধনদের সমস্ত শিবিরের অধিকার দখল করেছিলেন। অশ্বত্থামা কৃতবর্মা এবং কৃপাচার্যকে জাগরিত করে বললেন, 'আমি এই সব কূটযুদ্ধের প্রতিশোধ নেবো। আমার পিতৃহন্তাকে, ধৃষ্টদ্যুম্নকে প্রথম হত্যা করে সমস্ত পাঞ্চাল এবং পাণ্ডবদের নিহত করবো। নীচাশয় ভীমসেন মহাবল পরাক্রান্ত অদ্বিতীয় বীর কুরুরাজকে অন্যায় ভাবে আহত করে মস্তকে পদার্পণপূর্বক যে নিষ্ঠুরকার্যের অনুষ্ঠান করেছে, সেটা ভুলে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অন্যায়ের শাস্তি আমি অন্যায় ভাবেই দেবো। কীভাবে বিনাশ করেছে! হা কর্ণ! তোমাকেই বা কীভাবে বাণবিদ্ধ করলো।'

প্রকৃত অর্থে পাণ্ডবরা একজন মহারথীর সঙ্গেও সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হননি। আজ অশ্বত্থামা দুর্যোধনের কাছে প্রতিজ্ঞা করে এসেছেন, পাণ্ডবগণকে তিনি অবশ্যই বিনাশ করবেন। যে ভাবেই হোক, এখন ওরা বিজয়ী, অস্ত্রশস্ত্র ও উৎসাহশক্তিসম্পন্ন। তাদের সম্মুখ যুদ্ধে কোনোভাবেই বিনাশ করা সম্ভব নয়। ওরা কখনোই ধর্মানুসারে সংগ্রাম করেনি। কৃষ্ণের কুবুদ্ধিতে অন্যায় ব্যতীত একটি বড় যোদ্ধাকেও ধর্মসঙ্গতভাবে বিনাশ করতে সক্ষম হয়নি। সেই ক্ষমতা তাদের ছিলো না। নীচাশয় পাণ্ডবগণ পদে পদে শঠতা পরিপূর্ণ অতি কুৎসিত কার্যে অনুষ্ঠান করেছে। শ্রান্ত ক্লান্ত শস্ত্রদীর্ণ জলসিক্ত দুর্যোধনকে যেভাবে মিথ্যা আক্রমণে আহত করে, বিজয় গর্বে তার শিবির লুঠ করে, পাণ্ডবেরা সুখে নিদ্রা যাচ্ছে, সেই সুখ কেড়ে নেবার জন্য উত্তাল হয়ে উঠলেন অশ্বত্থামা।

অশ্বত্থামাকে কৃপাচার্য বললেন, 'আমি সম্পূর্ণ অবগত আছি তুমি অতিশয় উত্তেজিত। কিন্তু বৎস, আমার ব্যক্য তুমি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করো। দৈব ও পুরুষকার অপেক্ষা কিছুই বলবান নয়। ঐ উভয়ের একত্র সমাবেশ না হলে সিদ্ধিলাভ হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। পর্জন্য পর্বতোপরি সলিল বর্ষণ করে ফল উৎপাদনে সমর্থ হয় না। কিন্তু কৃষ্টক্ষেত্রে বারিবর্ষণ করলে প্রচুর ফল উৎপন্ন হয়। মনুষ্যের সমস্ত কার্যই দৈব ও পুরুষকারের সংযোগ সাপেক্ষ।'

কৃপাচার্য তাঁকে উৎসাহ দিলেন না, বিরত করতে অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু অশ্বত্থামাকে কোনোক্রমেই শান্ত করা গেলো না। তাঁর মন তখন শোকানলে দগ্ধ হচ্ছিলো। বিষম দুঃখপ্রভাবে স্থির থাকতে পারছিলেন না। যা তিনি স্থির করেছেন, মনে হলো সেটা করতে পারলেই তাঁর শোক শান্ত হবে। সুতরাং, তাঁর সংকল্প তিনি ত্যাগ করতে অসমর্থ হলেন। সেই মুহূর্তেই স্বীয় পিতা এবং রাজা দুর্যোধনের জন্য তাঁর প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি প্রজ্বলিত হয়ে উঠলো। আজ পাণ্ডবরা জয়লাভে প্রফুল্ল হয়ে নিশ্চয়ই কবচ পরিত্যাগ করে শান্তিতে নিদ্রাগত হয়েছে। আজই সুযোগ। পাণ্ডবগণ কী করলো? শঠতা, প্রবঞ্চনা এবং সুযোগের দ্বারাই লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটালো। তা সত্ত্বেও তাঁরা যদি নিন্দনীয় না হন, তাঁরও হবার কথা নয়।

পিতৃহন্তাকে নিধন না করা পর্যন্ত মুহূর্তকালও জীবিত থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে না। রাজা দুর্যোধন নিতান্ত অন্যায়ভাবে ভগ্নোরু হয়ে কীভাবে পড়ে আছেন সমরাঙ্গনে। সেই বেদনাতেও বার বার দুই চক্ষু জলে ভরে যাচ্ছে।

কৃপাচার্য ও কৃতবর্মার কোনো প্রবোধবাক্যই তাঁর ক্রোধ উপশমিত করতে পারলো না। অশ্বত্থামা চলে গেলেন শিবিরের নিকট। তারপরে অনেক অলৌকিক ঘটনার ব্যাখ্যা আছে। সেই অপ্রাকৃত ব্যাখ্যায় যাবার দরকার নেই। মোট কথা, ঈশ্বরের পদে নিজেকে সমর্পিত করে, অশ্বত্থামা শিবিরে প্রবেশ করলেন। কৃতবর্মা ও কৃপাচার্য দ্বারদেশে অবস্থান করতে লাগলেন। তাঁদের দেখে দ্রোণপুত্র খুব আহ্লাদিত হলেন, তাঁর মন অনেক সবল হলো। আনন্দিত চিত্তে বললেন, 'হে বীরদ্বয়! আপনারা যত্ন করলে সবই সম্ভব। আমি এখন কৃতান্তের মতো শিবির মধ্যে প্রবেশ করি।'

শিবির মধ্যে প্রবেশ করে নিঃশব্দ পায়ে ধৃষ্টদ্যুম্নের শয়নাগারে উপস্থিত হলেন। ঐ সময়ে সমরপরিশ্রান্ত পাঞ্চালগণ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন। অশ্বত্থামা দ্রুপদপুত্রের শয়নগৃহে প্রবেশ করে তাকে অকুতোভয়ে নিদ্রায় মগ্ন দেখে প্রচণ্ড জোরে পদাঘাতে জাগরিত করলেন। দুই হাতে তার চুল ধরে মাটিতে নামিয়ে নিষ্পেষিত করতে লাগলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন নিদ্রার ঘোর ও ভয়ে তার প্রতিবিধানের কোনো চেষ্টাই করতে পারছিলেন না। অশ্বত্থামা তাঁর দুপায়ের পাতায় সমস্ত শক্তি সংহত করে ধৃষ্টদ্যুম্নের বক্ষঃস্থল ও কণ্ঠদেশ আক্রমণ করে পশুর মতো নিধন করতে সমুত্থিত হলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন দুহাতের নখর প্রহারে তাঁকে ক্ষতবিক্ষত করতে করতে রুদ্ধস্বরে বললেন, 'আচার্যপুত্র! তুমি আমাকে অস্ত্রপ্রহারে সংহার করো। তাহলে আমি তোমার প্রসাদে পবিত্রলোকে গমন করতে পারবো।' অশ্বত্থামা দ্রুপদতনয়ের এই অব্যক্ত বাক্য শ্রবণ করে বললেন, 'কুলাঙ্গার! আচার্যকে তুমি কী ভাবে সংহার করেছো তা কি তোমার স্মরণে নেই? আচার্য-হন্তা হয়ে এখন তুমি কোনো লোকেই স্থান পাবে না অতএব তোমার উপর আমি কোনো অস্ত্রই নিক্ষেপ করবো না।' এই বলে সিংহ যেমন মদমত্ত মাতঙ্গের মর্মপীড়া করে সেভাবে পদাঘাতে পদাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্নের মর্মপীড়া করতে লাগলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্নের চিৎকারে সবাই জেগে উঠলো। কিছু বুঝতে না বুঝতেই অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নকে শেষ করে রথে উঠে বসলেন।

ধৃষ্টদ্যুম্নের গৃহ থেকে বহির্গত হতেই শিবিরের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা জাগরিত হয়ে অশ্বত্থামাকে পরিবেষ্টন করলেন। দ্রোণপুত্র তাদের রুদ্রাস্ত্র দিয়ে নিপাতিত করে অনতিদূরে নিদ্রিত উত্তমৌজাকে দেখে তাকেও পদদ্বয়ের শক্তিতে কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থল আক্রমণ করে শমনসদনে পাঠালেন। মোটকথা, অশ্বত্থামা শিবিরে নিদ্রামগ্ন মহা মহা যোদ্ধৃগণকে নিধন করে, রুধিরাক্ত দেহে, কালান্তকের চেহারা নিয়ে, সাক্ষাৎ যমের মতো দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ও শিখণ্ডীসহ আরো

অনেক মহারথকে নিধন করে, পাণ্ডবশিবির প্রায় শূন্য করে অপসৃত হলেন। দ্রোণপুত্রের রক্তমাখা ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে কেউ ভাবলে ভূত, কেউ ভাবলো রাক্ষস। কেউ যুদ্ধ করতে চেষ্টা করে বিফল হলো, কেউ পালিয়ে গেলো। কিন্তু কেউ তাঁকে চিনতে পারলো না। কিছু করতেও পারলো না। কৃতবর্মা ও কৃপাচার্যও দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে থেকে বহু পলায়ন-তৎপর রক্ষীকে নিধন করলেন। তারপর তাঁরাই শিবিরের তিন স্থানে অগ্নিপ্রদান করলেন। অগ্নি প্রজ্বলিত হওয়াতে শিবির আলোকময় হয়ে উঠলো। সেই আলোতে অশ্বত্থামা তরবারি হাতে নিয়ে বিচরণ করতে লাগলেন এবং যারা তাঁর দিকে আসছিলো আর যারা ভয়ে পলায়ন করছিলো সকলকেই বিনাশ করলেন।

দ্রোণপুত্র এইভাবে অর্ধরাত্রির মধ্যেই পাণ্ডবদিগের সমুদয় সৈন্য শমনসদনে প্রেরণ করলেন। কুরুক্ষেত্রের মতো সেখানেও মৃতদেহের স্তূপ জমে উঠলো। শিবিরের সব ঘুমন্ত মানুষ পুনরায় চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হলেন। অশ্ব গজ প্রভৃতি সেইসঙ্গে মৃত্যুর স্তূপে পরিণত হয়ে একটা ভীষণ আকৃতি নিলো। অতঃপর কৃতবর্মা, কৃপাচার্য ও অশ্বত্থামা তিনজন আনন্দে করতালি প্রদানপূর্বক হর্ষধ্বনি করতে আরম্ভ করলেন। আনন্দের আতিশয্যে তিনজনেই তিনজনকে আলিঙ্গন করে অতি দ্রুত কুরুরাজ দুর্যোধনের নিকটে এলেন।

এসে দেখলেন তখনো তিনি জীবিত আছেন, কিন্তু দেহের দুর্জয় যন্ত্রণায় প্রায় সংজ্ঞাহীন। এই অবস্থা দেখে তিনজনেই অতি শোকাকুল হয়ে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করে তাঁকে স্পর্শ করলেন। দুর্যোধন অতি কষ্টে চক্ষু উন্মীলিত করে তাকালেন তাঁদের দিকে। কুরুরাজকে তাকাতে দেখে তাঁরা দুর্বিষহ দুঃখে অশ্রুসম্বরণ করতে পারলেন না। নিজেদের হস্তদ্বারা দুর্যোধনের মুখ থেকে রক্তধারা মুছিয়ে দিলেন। অশ্বত্থামা কুরুরাজকে সম্বোধন করে বিলাপ ও পরিতাপ করে বললেন, 'হে মহারাজ! তোমাকে সবাই ধনুর্ধরাগ্রগণ্য বলে নির্দেশ করতো। বলরাম তোমার গুরু ও যুদ্ধে সর্বাগ্রগণ্য। দুরাত্মা ভীম কীভাবে তোমার এমন দশা ঘটালো? সেই পাপাত্মা ছলপূর্বক তোমাকে ধরাশায়ী করেছে। ধর্মযুদ্ধে আহ্বান করে যারা এই ধরনের কূটযুদ্ধে পরাস্ত করে তাদের নরকে ঠাঁই হয়। তদুপরি, সে তোমার মস্তকে পা রেখেছে, আর যুধিষ্ঠির বসে বসে তা দেখেছেন। যুধিষ্ঠিরকে ধিক্কার দেবার ভাষা নেই। হে মহারাজ! তুমি কখনো অন্যায় যুদ্ধ করোনি, তুমি সর্বদা সৎ থেকেছো, মহর্ষিগণ ক্ষত্রিয়দের যা প্রশস্ত গতি বলে কীর্তন করেছেন, তুমি সেই গতিই লাভ করবে। কৃষ্ণ ও অর্জুনকে ধিক্। এরা আবার নিজেদের ধার্মিক বলে প্রচার করে।' দ্রোণপুত্র এইসব বলে পরিতাপ করতে লাগলেন। তাঁরা তাঁদের এমন প্রিয় রাজাকে নিজেদের শক্তি দিয়ে রক্ষা করতে পারলেন না বিধেয় রোদন করতে লাগলেন। অবশেষে বললেন, 'হে রাজন! আপনার শ্রুতিসুখকর কিছু সংবাদ জ্ঞাপন করি। দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্রসহ ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং অবশিষ্ট সকলকেই আমরা পশুর ন্যায়

সংহার ও পাণ্ডবগণের সমুদয় বাহন, সৈন্য ও পুত্রগণকে বিনাশ করে এর প্রতিশোধ নিয়েছি।'

দুর্যোধন দ্রোণপুত্রের এই সমাচার শুনে প্রীত হয়ে বললেন, 'পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ এবং কর্ণ যা পারেননি, তোমরা তা পেরেছো।' দুই বাহু বাড়িয়ে দিলেন তিনজনের দিকে, গভীরভাবে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, 'তোমাদের মঙ্গল হোক। পুনরায় স্বর্গে দেখা হবে।' এই বলে প্রাণত্যাগ করলেন।

দুর্যোধনের মৃত্যুতে নায়িকা সত্যবতীর সমস্ত সংকল্প পূর্ণ হলো। আর এক ফোঁটা রক্তও রইলো না যা তাঁর নিজের রক্ত নয়। যাঁরা রইলেন তাঁদের একজন সত্যবতীর অবৈধ পুত্র অনার্য কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অবৈধ পুত্র বিদুর, আর বিদুরের অবৈধ পুত্র যুধিষ্ঠির। যে যুধিষ্ঠিরকে শান্তনুর সিংহাসন অধিকার করাবার বাসনায় তাঁর পিতা বিদুর এবং পিতামহ দ্বৈপায়নের এতো কাণ্ড, সেই যুধিষ্ঠির ঠিকই সেখানে অধিরূঢ় হলেন। কিন্তু কাকে শাসন করবেন, প্রজা কোথায়?

কর্ণকে যখন কৃষ্ণ বলেছিলেন, 'তুমি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের সেবা করেছো, ধর্মশাস্ত্রের সূক্ষ্ম তত্ত্ব সকল শিখেছো, তুমি ধর্মানুসারে পাণ্ডুরই পুত্র। অতএব তুমি রাজা হও। তোমার পিতৃপক্ষীয় পাণ্ডবগণ এবং মাতৃপক্ষীয় বৃষ্ণিগণ, দুই পক্ষকেই তোমার সহায় বলে জেনো। তুমি আজ আমার সঙ্গে চলো, পাণ্ডবরা জানুক যে তুমি যুধিষ্ঠিরের অগ্রজ। তোমার পাঁচ ভ্রাতা, এবং দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র, এবং অভিমুন্য, তোমার চরণ ধারণ করবেন। দ্রৌপদীও ষষ্ঠকালে তোমার সঙ্গে মিলিত হবেন। আমরা তোমাকে পৃথিবীর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করবো। কুন্তীপুত্র, তুমি ভ্রাতৃগণে বেষ্টিত হয়ে রাজ্যশাসন করো। পাণ্ডব ভ্রাতাদের সঙ্গে তোমার সৌহার্দ্য হোক।' কর্ণ জবাব দিয়েছিলেন, 'গোবিন্দ! সমস্ত পৃথিবী এবং রাশি রাশি সুবর্ণ পেলেও আমি আমার পুরোনো সম্বন্ধ কক্ষনো অস্বীকার করতে পারি না।' তারপর আরো অন্যান্য কথার শেষে বলেছিলেন, 'আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি, তুমি যেন এক রক্তাক্ত পৃথিবীকে হাতে ধরে নিক্ষেপ করছো আর সেই অগ্নিস্তূপের উপর উঠে দাঁড়িয়ে যুধিষ্ঠির সুবর্ণপাত্রে ঘৃত পায়স ভক্ষণ করছেন।'

সেই স্বপ্নই শেষ পর্যন্ত সফল হলো।

কিন্তু পার্থিব লীলা সাঙ্গ হবার পর যুধিষ্ঠির স্বর্গে গিয়ে দেখলেন দুর্যোধন সেখানে অতি সম্মানের সঙ্গে উপবিষ্ট। তাঁর পরমতম আত্মীয়গণ তখন নরকে। তাঁকেও কিছুকালের জন্য নরকবাস করতে হয়েছিলো। আসলে স্বর্গ কোথায় কেউ জানে না। কোথায় নরক তা-ও কেউ জানে না। স্বর্গ-নরকের ধারণা এবং অস্তিত্ব মানুষের মনেই। মানুষের মনই তার অব্যর্থ বিচারে দুর্যোধনদের শাশ্বত স্বর্গবাসের গরিমাদান করে পাণ্ডবদের নরকদর্শন করিয়েছিলো।